প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৬৮

প্রকাশক
বি. রায়
দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে
কোলাজ
২ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

'নাইট ইন লিসবন' সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য ঃ

"শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী" (ডালাস্ নিউজ্)।

"অতি উচ্চাঙ্গের এ্যাডভেঞ্চার······সহনশীলতা এবং মানবতার আলেখ্য" (বোস্টন হেরাল্ড)।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নাজিবাদের জালে জড়িয়ে পড়া এক মরীয়া প্রেমিক দম্পতির অতি সুন্দর কাহিনী।" এ কাহিনীতে বর্ণিত আধুনিক যুগের ত্রাস এবং বর্ব্বরতা পাঠককে স্তব্ধ করে······রেমার্কের শ্রেষ্ঠ অবদান" (ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার)।

বরেণ্য সাহিত্যিক এরিখ্ মারিয়া রেমার্ক (বর্তমানে প্রয়াত) এই শতকের দ্বিতীয় দশকে 'অল কোয়াএট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' লিখে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁর 'থ্রি কমরেডস', 'দ্য রোড ব্যাক'-ও বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। রেমার্কের মোট এগারোটি উপন্যাসের অন্যতম 'নাইট ইন লিসবন' কোন এক বিদেশী সংবাদপত্রের মতে তাঁর "শ্রেষ্ঠ অবদান"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নাজিবাদের নাগপাশে ধরাপড়া ইউরোপের কেন্দ্র থেকে পলায়মান এক মরীয়া, প্রেমিক, রাজনৈতিক শরণার্থী দম্পতির জীবন নিয়ে রচিত উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠাভরা, সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'নাইট ইন লিসবন'। অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ আর অননুকরণীয় বর্ণনাকৌশলের বিরল সমাবেশে সমৃদ্ধ বিশ্ব-সাহিত্যের এই অনুপরতনটি একাদিক্রমে পাঁচ মাস নুয়াইয়র্ক টাইমসের পুস্তক তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

প্রথম

জাহাজটির দিকে তাকিয়েছিলাম। সর্ব্বাঙ্গে কর্কশ আলোর রোশ্‌নি মেখে নদীর মোহানায় নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। লিসবন শহরে তখন এক সপ্তাহের বেশী হয়ে গেলেও, ঐ রকম বেপরোয়া আলোকসজ্জাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, কারণ আমি ইউরোপের যে অংশের মানুষ সেখানকার রাত কয়লাখনির গহ্বরের চেয়ে কালো। লণ্ঠনের আলোকে সেখানে প্লেগ মহামারী থেকে কম ভয় করে না। অথচ, সে জায়গাটা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ।

জাহাজটি যাত্রীবাহী। মাল ভর্ত্তি হচ্ছিল তাতে। খবর পেয়েছিলাম, পরশু সন্ধ্যায় ছাড়বে। জাহাজের আলোতে দেখছিলাম মাছ, মাংস, তরিতরকারী, রুটি, ডিবাভর্ত্তি ফলমূল ইত্যাদির ঝুড়ি ক্রেনে করে খোলের ভিতর নামান হচ্ছে। ঠিকাদাররা ব্যাগ হাতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলাফেরা করছে। ও যেন ওল্ড টেস্টামেণ্টে বর্ণিত প্লাবনের শেষে আর্ক। ১৯৪২ সালের সেই মাসগুলিতে যে জাহাজ ইউরোপ থেকে যাত্রা করত সেটিই আশার তরী বলে গণ্য হত। তখন মনে হত, ইউরোপ জুড়ে প্লাবনের জল প্রতিদিন ধীরে ধীরে বাড়ছে, আর অপর পারে আমেরিকা,—আশার সুউচ্চ মিনার আরারাট পর্ব্বত। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া অনেক দিনই ডুবে গিয়েছিল। পোল্যাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া যায় যায়। আমস্টারডাম, ব্রাসেলস্, কোপেনহ্যাগেন, অসলো এবং প্যারী সেই প্লাবনে তলিয়েছিল। ইতালির শহরগুলি থেকে পচনের দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করেছিল। স্পেনেও জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। দেশত্যাগী বাস্তুহারা মানুষগুলির কাছে সুবিচার, স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা, জীবন এবং জীবিকার থেকে মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। পর্ত্তুগালের উপকূল ছিল তাদের আশার দ্বার। আমেরিকার দ্বার। সেই আমেরিকা পৌঁছতে না পারলে, কপালে লেখা ছিল: বিভিন্ন দূতাবাস, থানা এবং সরকারী দপ্তর (যারা ভিসা দিতে সর্ব্বদাই অস্বীকার করত, এমন কি অল্পমেয়াদী বসবাসের অনুমতিও দিত না), আটকশিবির ইত্যাদির জঙ্গলে ঘুরপাক খেয়ে প্রাণ হারানো। যুদ্ধের সময় যা স্বাভাবিক, মানুষের ব্যক্তিসত্তা অন্তর্হিত হয়েছিল। একটিমাত্র জিনিষের দাম ছিল তখন,—একটি কার্য্যকরী পাসপোর্ট।

সেদিন সন্ধ্যায় এস্তোরিল ক্যাসিনোতে জুয়া খেলতে গিয়েছিলাম। গায়ে তখনো একটি ভাল স্যুট ছিল। ক্যাসিনোর মালিক ভিতরে ঢুকতে দিল। ভাগ্যকে ব্ল্যাকমেল করার শেষ প্রচেষ্টা। আমাদের পর্ত্তুগালে বসবাসের অনুমতি কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আমার আর রুথের ভিসা ছিল না। আমরা ফ্রান্সে থাকতে পর্ত্তুগাল থেকে যে জাহাজগুলির নিউইয়র্ক যাত্রা করার কথা, তাদের একটি তালিকা তৈরী করেছিলাম। এইটিই তালিকার শেষ জাহাজ। কিন্তু ওর সব বার্থ বেশ কয়েক মাস

আগে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। আমাদের আমেরিকান ভিসা ছিল না, আর ভাড়ার টাকাও তিনশ' ডলার কম ছিল। এই ঘাটতি পূরণের শেষ চেষ্টায় নেমেছিলাম লিসবনে বিদেশীর কাছে খোলা একটিমাত্র রাস্তায়,—জুয়া খেলে। উদ্ভট চিন্তা মনে হতে পারে। কারণ, জুয়া জিতলেও, দৈবযোগ ছাড়া জাহাজের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিপদে এবং হতাশায় মানুষ দৈবে বিশ্বাসী হয়। ঐ শেষ অবলম্বন।

শেষ সম্বল ছাপান্ন ডলার সেদিন জুয়ায় হেরেছিলাম।

তখন রাত অনেক হয়েছে। নদীতীর প্রায় জনশূন্য। দেখলাম, কাছেই একজন মানুষ রয়েছে। প্রথমে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে ক'বার পায়চারি করল, তারপর থেমে, আমার মত জাহাজটির দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবলাম, আমার মত একজন রিফিউজি। কিছুক্ষণ আর ওর দিকে তাকালাম না। হঠাৎ মনে হল, ও আমাকে লক্ষ্য করছে। রিফিউজির পুলিশের ভয় কখনো যায় না। ঘুমের মধ্যেও না। যেন একটুও ভয় পাইনি, এমন ভান করে ধীরে ধীরে জাহাজঘাটা ছেড়ে যেতে উদ্যত হলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরে পিছনে পদধ্বনি শুনতে পেলাম। গতি দ্রুততর না করে এগিয়ে চললাম, মনে চিন্তা,—গ্রেফতার হলে কি করে রুথকে খবর পাঠাব। জাহাজঘাটার প্রান্তে গোলাপী রঙের বাড়িগুলি প্রজাপতির মত ঘুমাচ্ছিল। অন্ততঃ অতদূরে পৌঁছতে পারলে অলিগলির জঙ্গলে সটকে পড়া যেত।

এতক্ষণে লোকটি পাশে এসে গেছে। ও আমার থেকে খর্ব্বকায়।

"আপনি জার্ম্মান?" ও জার্ম্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল।

মাথা নেড়ে জানালাম, না। চলা অব্যাহত রাখলাম।

"অস্ট্রিয়ান?"

উত্তর দিলাম না। গোলাপী রঙের বাড়িগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। জানতাম, পর্তুগীজ পুলিশের অনেকে ভাল জার্ম্মান বলে।

"আমি পুলিশ নই," সে বলল।

বিশ্বাস করলাম না। ও অবশ্য সাদা পোষাকে ছিল। কিন্তু ইউরোপের অন্যত্র সাদা পোষাকপরা পুলিশ আমাকে অন্ততঃ দু'বার গ্রেফতার করেছিল। একমাত্র ভরসা কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যা প্যারীবাসী প্রাগের এক অঙ্কের মাষ্টার আমাকে করে দিয়েছিল। দুঃখ এই যে, সুনিপুণ পরীক্ষায় এগুলির মধ্যে ফাঁকি ধরা পড়ত।

"লক্ষ্য করলাম, আপনি জাহাজটির দিকে তাকিয়েছিলেন" লোকটি বলল, "তাই ভাবছিলাম··"

এবার ভাল করে দেখলাম। লোকটিকে পুলিশ মনে হয় না। ফ্রান্সের বোর্ডোতে যে সাদা পোষাকপরা পুলিশটি আমাকে গ্রেফতার করেছিল, তাকে দেখেও মনে হয়েছিল সন্ত ল্যাজারাস সবে কবর থেকে উঠে এসেছেন। ওর মত নির্দয় পুলিশ কখনো দেখিনি। একটি দয়ালু জেল ওয়ার্ডেন কয়েক ঘন্টা পর গোপনে ছেড়ে না দিলে, সে যাত্রা আমার সব শেষ হয়ে যেত।

"নিউ ইয়র্ক পালাতে চান ?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দিলাম না। আর বিশ গজ এগোতে পারলে কাজ হবে। এক ঘুষিতে ওকে ধরাশায়ী করে ছুট দেব।

"এই যে", লোকটি পকেট থেকে কিছু বার করে নিয়ে বলল, "দুটি টিকিট আছে, ঐ জাহাজের।"

টিকিট দুটি দেখলাম। অল্প আলোয় লেখা পড়তে পারলাম না। ততক্ষণে অনেকটা রাস্তা পার হয়ে গেছি। এখন নিরাপদে একটু থামা যায়।

"এ সবের অর্থ কী ?" পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম। ঐ ভাষায় মাত্র ক'টি কথাই শিখেছিলাম।

"আপনি টিকিট দুটি নিতে পারেন। আমার প্রয়োজন নেই" লোকটি বলল।

"আপনার দরকার নেই ! আপনার কথা বুঝলাম না।"

"আমার আর প্রয়োজন নেই।"

লোকটির দিকে ভাল করে তাকালাম। তবু বুঝতে পারলাম না। ওকে সত্যিই পুলিশ মনে হচ্ছিল না। আমাকে গ্রেফতার করতে হলে জাহাজের টিকিটের অবতারণার প্রয়োজন ছিল না। ও কাজের জন্য কোন বিশেষ ছলের দরকার নেই। কিন্তু টিকিট দুটি খাঁটি হলে ওর প্রয়োজন নেই কেন ? আমাকেই বা দিতে চাইছে কেন ? ভিতরে ভিতরে কাঁপতে শুরু করলাম।

"আমার ওগুলি কেনার সামর্থ্য নেই," জার্মানে উত্তর দিলাম, "ঐ টিকিট দুটির দাম অনেক। লিসবনে অনেক পয়সাওলা রিফিউজি আছে। যে দাম চাইবেন ওরা তাই দেবে। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।"

"আমি বেচতে চাই না।"

আবার টিকিট দুটি ভাল করে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ওগুলি কি খাঁটি ?"

উত্তর না দিয়ে ও টিকিট দুটি আমার হাতে তুলে দিল। আঙুলের মধ্যে কাগজগুলি মচ্ মচ্ করে উঠল। টিকিট দুটি খাঁটি, হাতে নেওয়ামাত্র মনে হল সর্ব্বনাশ থেকে মুক্তির পথে পা দিলাম। ওদের বলে পরদিন সকালে আমেরিকান ভিসার জন্য চেষ্টা করতে পারব। অন্ততঃ ওগুলি বিক্রি করে সেই পয়সায় আরও ছ'মাস চালাতে পারব। বললাম, "আমি বুঝতে পারছি না ··"

"আমি কাল সকালেই লিসবন ছেড়ে যাচ্ছি। আপনি টিকিট দুটি নিতে পারেন। দাম দিতে হবে না। শুধু একটি শর্ত··"

বাহু দুটি হতাশায় ঝুলে পড়ল। প্রথমেই বুঝেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা এত সুখকর যে আমার কপালে টেকবার নয়। জিজ্ঞেস করলাম, "কী শর্ত ?"

"আমি আজ রাতে একলা থাকতে চাই না।"

"আপনি কি চান, আমি আপনার সঙ্গে আজকের রাতটা কাটাই ?"

"হ্যাঁ, কাল ভোর হওয়া পর্যন্ত।"

"শুধু এই ?"
"এই মাত্র।"
"আরও কিছু ?"
"না।"

অবিশ্বাস ভরা চোখে লোকটির দিকে তাকালাম। জানতাম, আমাদের মত মানসিক অবস্থায় মানুষ পাগল হতে পারে। নিঃসঙ্গতা কখনো অসহ্য হয়ে ওঠে। গোটা পৃথিবী যখন একটি মানুষের কাছে শূন্য হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ অপরিচিত আর একজন মানুষ তাকে নির্ঘাত অপঘাত থেকে বাঁচাতে পারে এবং এক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করতে চাওয়া স্বাভাবিক। তার জন্য কোন পুরস্কার চাওয়া বা দেওয়া অকল্পনীয়। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

লোকটি কেবল মাথা নেড়ে বোঝাল তার কোন আস্তানা নেই। পরে বলল, "সেখানে যেতে চাই না। কোন বার কি এখনো খোলা আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে।"

প্যারীর রোজ্ কাফে জানতাম। দুই সপ্তাহ আমি আর রুথ ওখানে ঘুমিয়েছি। এক কাপ কফি কিনলে যতক্ষণ খুশি বসে থাকা যায়। রাত হলে মেঝেতে খবর কাগজ বিছিয়ে তোফা ঘুম। আমরা মেঝেতে ঘুমাতাম। টেবিলে ঘুমালে পড়বার ভয় থাকে।

উত্তর দিলাম, "তেমন কোন বার এখানে চিনি না।" এটা মিথ্যা। কিন্তু যে লোক বিনামূল্যে জাহাজের দুটি টিকিট দেয়, তাকে একঘর রিফিউজির মাঝে নিয়ে যাওয়া যায় কি ভাবে ? ওরা ত' টিকিট দুটির জন্য জান দিয়ে দেবে।

"আমি একটা জায়গা জানি। দেখা যাক, এখনো খোলা আছে কিনা।" লোকটি ট্যাক্সি ডাকল। ও ড্রাইভারকে বারের ঠিকানা বলল। মনে হচ্ছিল, রুথকে যদি জানাতে পারতাম, আজ রাতে ফিরব না। কিন্তু অন্ধকার, দুর্গন্ধময় ট্যাক্সিতে বসে আমার হিসাব হারিয়ে গেল। এক উদ্দাম আশা চেতনাকে গ্রাস করল। ভাবলাম, হয়ত যা অকল্পনীয়, তাই হতে চলেছে। হয়ত অবশেষে পরিত্রাণ পাব। লোকটিকে পলকের জন্যও কাছ ছাড়া করতে সাহস পেলাম না। ট্যাক্সি কয়েকটি রাস্তায় চক্কর খেয়ে ঢালু গলিপথ ধরল। রাস্তার দুই পাশে অগণিত খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে। লিসবনের এই অংশ আমার অজানা। যথারীতি, আমি লিসবনের গীর্জা এবং মিউজিয়মগুলি ভাল চিনতাম। ভগবান বা শিল্প, কোনটাকেই ভালবেসে নয়। গীর্জা বা মিউজিয়মে কেউ পাসপোর্ট / ভিসা দেখাতে বলে না,—সেই জন্য। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে আমি তখনো একজন মানুষ, ভুয়া পাসপোর্টধারী ব্যক্তিবিশেষ নই।

ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়ে গলিপথ ধরে চলতে থাকলাম। মাছ, রসুন, রাতে ফোটা ফুল, মরা সূর্য্য কিরণ এবং ঘুমের মিশ্র গন্ধ নাকে আসছিল। একটু একটু করে চাঁদ উঠছে। সেণ্ট জর্জ দুর্গ রাতের আঁধার থেকে গলা বাড়াচ্ছে। চাঁদের আলো তার পায়ে ঠিকরে পড়ছে। পিছন ফিরে বন্দরের দিকে তাকালাম। নদী বয়ে যাচ্ছে

সাগরের পারে, যার অপর পারে আমেরিকা। এ নদী মুক্তির ধারা। ঘুরে বললাম, "এখনো বলুন, আমাকে কোন ফাঁদে ফেলছেন না ত ?"

"নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমি টিকিট দুটির কথা বলছি।"

টিকিট দুটি জাহাজঘাটাতেই ও নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিল।

"বিশ্বাস করুন, আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই।" সামনে গাছঘেরা পার্কের প্রান্তে একটি বাড়ি দেখিয়ে ও বলল, "ঐ বারের কথাই বলছিলাম। এখনো খোলা আছে। ওখানে আমরা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করব না, কারণ ওদের প্রায় সব খদ্দেরই বিদেশী। ভাববে, কাল সকালে চলে যাব। লিসবনে শেষ রাতের স্মৃতি জাগরুক করতে বারে ঢুকেছি।"

বারটা মন্দ নয়। গভীর রাতের রেস্তোরাঁর মত ছোট্ট গাড়িবারান্দা আর একটু নাচের জায়গা—টুরিস্টদের পছন্দ মাফিক। একজন গীটার বাজাচ্ছে, একটি মেয়ে তালে তালে গাইছে। গাড়িবারান্দার অনেক টেবিলে বিদেশীরা বসে আছে। তাদের মধ্যে একটি ইভ্‌নিং ড্রেস পরা মহিলা আর সাদা ডিনার জ্যাকেট-পরা একজন পুরুষও আছেন। গাড়িবারান্দার প্রান্তে একটি টেবিলে বসলাম। সেখান থেকে লিসবনের অনেকটা দেখা যায়। নিষ্প্রভ চাঁদের আলোয় গীর্জা, রাস্তা, বন্দর, জাহাজঘাটা এবং আশার তরী সেই জাহাজটি দেখা যাচ্ছিল।

"আপনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন ?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

ওর দিকে তাকালাম। পরজন্মের মত উদ্ভট বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, "বিষয়টি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিগত কয়েক বছর ইহজন্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। আমেরিকা পৌঁছতে পারলে ও বিষয়ে ভাবব।" আমেরিকার কথা বললাম, টিকিট দুটির কথা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে।

"আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না," লোকটি বলল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেই মুহূর্তে সব কিছু শুনতে রাজী ছিলাম, কোন আলোচনার ধৈর্য্য ছিল না। দূরে জাহাজটি তখনো দেখা যাচ্ছিল। আমার ধৈর্য্যের ভাঁড়ারও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল।

লোকটি স্থাণুর মত বসে রইল খানিকক্ষণ, যেন চোখ চেয়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় গীটারবাদক বাজাতে বাজাতে আমাদের কাছে এল। বাজনায় ওর তন্দ্রা ভাঙ্গল। ও কথা শুরু করল, "আমার নাম শোয়ার্থস্‌। আসল নাম নয়। পাসপোর্টে লেখা নাম। এই নামেই অভ্যস্ত হয়েছি। আজ রাতও ঐ নামে চলবে।"

"আপনি কি দীর্ঘদিন ফ্রান্সে ছিলেন ?"

"যত দিন থাকতে দিয়েছিল।"

"বন্দী হিসাবে ?"

"যখন যুদ্ধ বাধল, তখন সকলের মত আমিও বন্দী হয়েছিলাম।"

লোকটি মাথা নাড়ল, "আমরাও। অতি আনন্দে ছিলাম", চোখ নীচু করে বলে চলল, "খুব সুখে ছিলাম। ভাবিনি, এত সুখে থাকতে পারব।"

আশ্চর্য্য হয়ে তাকালাম। লোকটিকে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা যায় না। শ্রান্ত মনে হয়। সে যে এভাবে কথা বলতে পারে, ভাবিনি। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ? ক্যাম্পে ?"

"না। তার আগে।"

"১৯৩৯ সালে ! ফ্রান্সে ?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের গ্রীষ্মে। এখনো বুঝতে পারি না কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল। অন্ততঃ একজনকে আমার সে কাহিনী বলতেই হবে। কিন্তু এখানে কাউকে চিনি না। কাউকে সে কাহিনী বললে, সে দিনগুলি জীবন্ত হয়ে ফিরে আসবে। ছবির মত পরিষ্কার আমার মনে গেঁথে যাবে। সে কাহিনী বলতেই হবে।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বুঝতে পারছেন ?"

"বুঝতে পারছি। আপনার কথা বোঝা কঠিন নয়, মিঃ শোয়ার্থস্।"

"বোঝা অসম্ভব," বিরাট জোর দিয়ে আমার কথা থামিয়ে দিল।

"ও একটি বিশ্রী কফিনের মধ্যে শুয়ে আছে ; একটি ঘরে যার সব জানালা বন্ধ। ও মারা গেছে। ও আর নেই। কেউ একথা বুঝতে পারে ? কেউ পারে না। আপনি, আমি, কেউ বুঝতে পারব না। যে বলে বুঝতে পারে, সে মিথ্যুক।"

উত্তর দিলাম না। এর আগে অনুরূপ অবস্থায় মানুষের সাহায্য পেয়েছি। যখন নিজের দেশ বলতে কিছু থাকে না, শোক সহ্য করা কঠিনতর হয়। অপরিচিত দেশ এবং পরিবেশে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ থাকে না। সুইজারল্যাণ্ডে থাকাকালীন আমার নিজের এই অবস্থা হয়েছিল, যখন শুনলাম বাবা এবং মাকে খুন করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দাহ করা হয়েছে। চোখের উপর ভাসত, মার চোখে দুটিকে চুল্লীর আগুন গিলে খাচ্ছে। এই দুঃস্বপ্ন দিনরাত আমাকে ঘিরে থাকত। শান্তভাবে শোয়ার্থস্ বললেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন রিফিউজির ভেঙ্গে পড়া মানসিক অবস্থা……"

সায় দিলাম। ওয়েটার একটি পাত্র ভর্ত্তি চিংড়ি মাছ আনল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত এবং দুপুর থেকে কিছু খাইনি। একটু বাধো বাধো ভাবে মিঃ শোয়ার্থসের দিকে তাকাতে, উনি বললেন, "আপনি খেতে শুরু করুন। আমি পরে খাব।"

উনি মদ এবং সিগারেট অর্ডার দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম। মাছগুলি তাজা এবং সুস্বাদু। বললাম, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। দারুণ খিদে পেয়েছে।"

খেতে খেতে মিঃ শোয়ার্থস্কে লক্ষ্য করছিলাম। উনি শান্তভাবে বসেছিলেন, লিসবনের দিকে তাকিয়ে। মুখে বিরক্তি বা অধৈর্য্যের লেশমাত্র নেই। ভদ্রলোকের জন্য মায়া হল। মনে হল, উনি নিশ্চয় বুঝেছেন, সমব্যথী হলেও, নিদারুণ ক্ষুধা চেপে

রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া, অন্য কিছু করার না থাকলে, খাবার জিনিস খেয়ে নেওয়া ভাল। কারণ, একজনের খাবার অন্য কেউ যে কোন সময় ছিনিয়ে নিতে পারে। খাওয়া শেষ করে ডিশটা সরিয়ে রাখলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। বহুদিন পর আবার ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করলাম। কিছুদিন যাবৎ সিগারেটের পয়সা বাঁচিয়ে জুয়া খেলতাম।

শোয়ার্থস্ শুরু করলেন, "১৯৩৯ সালের বসন্তে রিফিউজির মানসিক উৎকণ্ঠা আমাকে পেয়ে বসল। ততদিনে রিফিউজি জীবনের পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করেছিলাম। ১৯৩৮ সালের শেষে কোথায় ছিলেন আপনি?"

"প্যারীতে।"

"আমিও। সব আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মিউনিখ চুক্তি সই হওয়ার সময় আমার ভয়ও ফুরিয়ে গিয়েছিল। স্বভাবের বশে লুকোতাম এবং সতর্কতা অবলম্বন করতাম। বুঝতাম, যুদ্ধ হবেই, জার্মানরা আসবেই এবং আমাদের বন্দী করবেই। এই অদৃষ্টের লেখা।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, তখনই আত্মহত্যার হিড়িক পড়েছিল। কিন্তু, দেড় বছর পরে যখন জার্মানরা সত্যিই এল, আত্মহত্যার সংখ্যা কমে গেল।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "তারপর মিউনিখ চুক্তি হল। মনে হল নতুন জীবন পেলাম। দিনগুলি আবার মধুময় হল। বিধি নিষেধ ভুললাম। মনে পড়ে, প্যারীতে সে বছর দ্বিতীয়বার চেস্টনাট গাছে ফুল ধরেছিল? আবার নিজেকে মানুষ মনে হত। কাল হল, মানুষের মত চলাফেরা শুরু করে। ফলে, পুলিশ ধরে ফেলল। বার বার বিনা অনুমতিতে ফ্রান্সে প্রবেশের অপরাধে চার সপ্তাহ জেলে রেখে দিল। তারপর সেই পুরানো খেলা: ফরাসী পুলিশ বাসল্-এর কাছে গোপনে আমাকে সুইজারল্যাণ্ডে ঠেলে পাঠাল। সুইস পুলিশ ফ্রান্সে ফেরত পাঠাল। ফরাসী পুলিশ আবার সুইজারল্যাণ্ডে ঠেলে দিল। মানুষ নিয়ে দাবাখেলা, বুঝতেই পাবছেন · · "

"আমি ভালই বুঝতে পারছি। শীতের দিনে এমন এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে গলাধাক্কা মোটেই সুখকর নয়। অবশ্য সুইস জেলগুলি ছিল তখনকার ইউরোপে সেরা। শীতকালে হোটেলের কামরার মত গরম করার ব্যবস্থা ছিল·· ···" আমি খেতে লাগলাম। সুখস্মৃতির মজা হল, হয়ত কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলেন আপনার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে নেই, কিন্তু স্মৃতি রোমন্থনের সময় মনে হবে তার বিপরীত। সুইস জেল আমার ভাল লেগেছিল কারণ, সেগুলি অন্ততঃ জার্মান নয়। আমার সামনে একজন মানুষ বসে আছেন, যিনি বলছেন, যুদ্ধপূর্ব দিনগুলিতে নবজীবন পেয়েছিলেন। আমি কিন্তু ভুলতে পারছিলাম না, লিসবনেরই কোন এক বাতাসহীন ঘরে উনি একটি নারীকে কফিনের মধ্যে রেখে এসেছেন।

শোয়ার্থস্ বললেন, "সুইসরা শেষবার ছেড়ে দেবার সময় শাসিয়েছিল, পাসপোর্ট ভিসা বিনা আবার ধরা পড়লে, ওরা আমাকে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেবে। এ অবশ্য শুধু

সাবধান বাণী। তাতেই ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না, সাবধান বাণী সত্যি হলে কী করব? সেই রাতে স্বপ্ন দেখলাম: আমি জার্মানীতে, গেস্টাপো গোয়েন্দা আমার পিছনে। তারপর এত বেশী বার সেই স্বপ্ন দেখতাম যে, ঘুমাতেও ভয় করত। আপনার কখনো এমন হয়েছে?"

"এর উপর একটা থিসিস লিখতে পারি," উত্তর দিলাম।

"এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি অস্‌নাব্রুকে,—যে শহরে আমরা থাকতাম এবং আমার স্ত্রী তখনো ছিল। আমি শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে। স্ত্রী অসুস্থ, লতার মত রোগা হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন ভাঙ্গতে, শরীরে ঠান্ডা শিহরণ বয়ে গেল। পাঁচ বছর ওকে দেখিনি। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও নেই। আমি লিখিনি, কারণ সন্দেহ ছিল, ওর চিঠি অন্য লোক খোলে। দেশ ছাড়বার আগে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, ও বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করবে। তাতে অন্ততঃ ওর কষ্ট লাঘব হবে। পাঁচ বছরে হয়ত অনুমতি পেয়েছে।"

শোয়ার্থস্‌ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। ও'র জার্মানী ত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করতে আমার উৎসাহ ছিল না। তখন জার্মানীতে ইহুদি, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হলে পেষনের চাকার আবর্ত্তনে পড়তে হত। বন্দী বা হত্যা করার যোগ্য কয়েক ডজন কারণ পাওয়া যেত।

শোয়ার্থস্‌ বললেন, "সে যাত্রা গা ঢাকা দিয়ে প্যারীতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু দুঃস্বপ্ন আমায় রেহাই দিল না। মিউনিখ চুক্তি সই হওয়ার সাথে সাথে আশার কেল্লাও ভেঙ্গে গেল। সেই বসন্তে সবাই বুঝতে পারল, যুদ্ধের দেরী নেই। এমন কি যুদ্ধের গন্ধও পাওয়া যেত, যেমন দূরে থেকে আগুনের গন্ধ পাওয়া যায়। একমাত্র কূটনীতিকরা যুদ্ধ এড়ানোর স্বপ্ন দেখছিলেন,—দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় মিউনিখ চুক্তির আকাশ-কুসুম রচনা করছিলেন। একসাথে এতগুলি মানুষ আর কখনো দৈবে বিশ্বাস করেনি। অথচ, তখনই দৈবের কোন স্থান ছিল না।"

"না, ওটা সত্যি নয়। দৈবে বিশ্বাস না থাকলে আজও আমরা বেঁচে থাকি?" উত্তর দিলাম।

শোয়ার্থস্‌ মানলেন, "ঠিকই। কিন্তু আপনি বলছেন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা। আমায় নিজের জীবনে একবার তা ঘটেছিল। আমি তখন প্যারীতে। হঠাৎ একটি চালু পাসপোর্টের উত্তরাধিকারী হলাম। পাসপোর্টধারীর নাম শোয়ার্থস্‌। দেশ অস্ট্রিয়া। পরিচয় রোজ্‌ কাফেতে। তিনি মারা গেলেন। আমি পেলাম তাঁর পাসপোর্ট আর কিছু টাকা। মাত্র তিন মাস আগে প্যারীতে পৌঁছেছিলেন। তাঁকে প্রথম দেখি ল্যুভর মিউজিয়মে, ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবি দেখবার সময়। প্রায়ই বিকেলের দিকে ল্যুভরে যেতাম, স্নায়ু শান্ত করতে। শান্ত, সুন্দর, রৌদ্রস্নাত ল্যান্ডস্কেপগুলি দেখে বিস্ময় হত, যে সুসভ্য মানব জাতি ঐ রকম ছবি আঁকতে সক্ষম, তারাই আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে পারে!"

"শোয়ার্থস্ নামে ভদ্রলোকটি প্রায়ই মনেট্-এর আঁকা গীর্জার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন আলাপ করতে বললেন, জার্মানী-অস্ট্রিয়ার মিলনের পর উনি কোন রকমে অস্ট্রিয়া থেকে পালান। ফেলে আসেন, ইম্প্রেশানিস্ট শিল্পীদের আঁকা বহুমূল্য চিত্র সম্পদ। রাষ্ট্র সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ও'র তাতে দুঃখ নেই। ছবিগুলি মিউজিয়মে রাখলে জনসাধারণও দেখতে পারবে, চুরি বা আগুন থেকে রক্ষার দায়ও রাষ্ট্রের উপর বর্ত্তাবে। তা ছাড়া, ফরাসী মিউজিয়মগুলিতে তাঁর সংগ্রহের থেকে অনেক ভাল ছবি আছে। পরিবারের কর্তা যেমন সন্তান-সন্ততির জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত, চিত্র সংগ্রহ নিজের কাছে থাকার সময় ও'রও সেই রকম চিন্তা ছিল। ফরাসী মিউজিয়মের ছবিগুলিকে পেয়ে উনি এক বৃহত্তর পরিবারের মালিক হলেন, কিন্তু দায় আর আগের মত নেই। অদ্ভুত মানুষ। শান্ত, ভদ্র, অত কষ্ট সত্ত্বেও আমুদে। দেশ থেকে অল্প টাকা নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিছু ডাকটিকিট লুকিয়ে এনেছিলেন। হীরা অপেক্ষা ওগুলি লুকিয়ে আনা সহজ। বিক্রি করতেও কোন বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয় না। ডাকটিকিটের ক্রেতারা সংগ্রাহক,—ওদের সন্দেহ বাতিক কম।

"উনি কী করে ওগুলি নিয়ে এলেন ?" রিফিউজির স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"উনি কতকগুলি নির্দোষ চেহারার চিঠি নিয়েছিলেন। টিকিটগুলি খামের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কাস্টমসের অফিসাররা চিঠিগুলি পরীক্ষা করল, খাম দেখল না।"

"মন্দ বুদ্ধি নয়", আমি যোগ করলাম।

"উনি ইনগ্রে'র আঁকা দুটি পেন্সিল-স্কেচ্ সঙ্গে নিয়েছিলেন। ছবি দুটি নিজের বাপের ছবির তলায়, ফ্রেমের ফাঁকে লুকিয়েছিলেন। দেগা'র আঁকা দুটি ছবিও ঐ ভাবেই পাচার করেছিলেন।"

"ভাল বুদ্ধি," আবার যোগ করলাম।

"এপ্রিলে ও'র হার্ট এ্যাটাক হয়। মারা যাবার আগে, যা কিছু ডাকটিকিট তখনো ছিল, ছবি কটি এবং তাঁর পাসপোর্ট আমাকে দিয়েছিলেন। কয়েকটি ডাকটিকিটের ক্রেতার ঠিকানাও দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে তিনি মারা যান। নীরবতায় মানুষটি তখন এত পরিবর্ত্তিত যে চেনা কঠিন। কিছু টাকা, একটি স্যুট এবং কিছু অন্তর্বাস ছিল। সেগুলি আমি নিই। আগের দিন ওগুলি নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন।"

"আপনি পাসপোর্টটি অদল বদল করেছিলেন ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"শুধু ফটো আর জন্মের বৎসর পাল্টিয়েছিলাম। শোয়ার্থস্ আমার থেকে বিশ বছরের বড় ছিলেন। শোয়ার্থস্ ছিল ও'র পদবী। আমাদের দু'জনের নামের প্রথম দিকটাতে মিল ছিল।"

"পাল্টাতে কে সাহায্য করল ? ব্রুনার ?"

"মিউনিখের এক ব্যক্তি।"

"ওরই নাম ব্রুনোর, পাসপোর্ট ডাক্তার। আসলে আর্টিস্ট।"

সুকৌশলে পাসপোর্ট ভিসার অদল বদলের জন্য ব্রুনোর বিখ্যাত ছিল। কত লোককে যে সে এভাবে সাহায্য করেছে তার হিসাব নেই। কিন্তু যখন ধরা পড়ল, নিজেরই কোন কাগজ নেই। অত্যন্ত সংস্কারগ্রস্ত মানুষ ছিল। নিজেকে মনে করত মানী লোক, জনদরদী। বিশ্বাস করত, বিদ্যাকে আপন কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে না লাগালে, নিজে বিপদে পড়বে না। মিউনিখে থাকাকালীন তার নিজের কোন দোকান ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্রুনোর এখন কোথায় ?"

"সঠিক জানি না। বেঁচে থাকলে, লিসবনে থাকতে পারে।"

"অদ্ভুত ব্যাপার," দ্বিতীয় শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "পাসপোর্টটি পেয়ে ব্যবহার করার সাহস পেলাম না। ধার করা নামে অভ্যস্ত হতেও কিছুদিন লেগেছিল। সর্বদাই নতুন নাম আওড়াতাম। প্যারীর শাঁসেলিজি-তে নতুন নাম, জন্মস্থান এবং তারিখ আওড়াতাম। একলা থাকলে, মিউজিয়মে ছবির দিকে তাকিয়ে কল্পিত কথোপকথন অভ্যাস করতাম : কোন পুরুষ কণ্ঠ হাঁকত, "শোয়ার্থস !" আমি দাঁড়িয়ে উত্তর দিতাম, "উপস্থিত।" অথবা নাকের মধ্যে দিয়ে বিকট সুর করে বলতাম, "নাম বলুন।" আবার নিজের ভূমিকায় উত্তর দিতাম, "জোসেফ্ শোয়ার্থস্, জন্ম ভাইনার নিউস্টাট-এ, ২২শে জুন ১৮৯৮ সাল। ঘুমাবার আগেও ঐ রকম অভ্যাস করতাম, পাছে কাঁচা ঘুম থেকে পুলিশের গুঁতো খেয়ে উঠে আসল পরিচয় বলে ফেলি। এইভাবে ক্রমে আসল নাম ভুলে গেলাম। আসল এবং ভুয়া পাসপোর্ট থাকার মধ্যে তফাত হল, শেষোক্তটি হামেশাই বিপদ ডেকে আনে।

"ইনগ্রে'র আঁকা দুটি ছবি বিক্রি করলাম। যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে কম দাম পেলাম। কিন্তু কিছু টাকা ত' পেলাম। তারপর এক রাতে মাথায় একটা মতলব চাপল : নতুন পাসপোর্টটি নিয়ে জার্মানী গেলে কেমন হয় ? আপাতদৃষ্টিতে ওটি আসল বলেই মনে হয়। সুতরাং বর্ডারে কারো সন্দেহ হবে না। আবার স্ত্রীকে দেখতে পাব। ওর সম্পর্কে দুশ্চিন্তাও অনেকটা কমবে।"

শোয়ার্থস, আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ওঁর কথা বুঝছি কিনা। উনি বলে চললেন, "আমার তখনকার মানসিক অবস্থা হয়ত বুঝতে পারছেন। একজন রিফিউজির স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা আর কি। চিন্তা করতে করতে গলা শুকিয়ে যেত, চোখের পাতা ব্যথা করত। যে চিন্তা দীর্ঘকাল আগে কবর দিয়েছি, তাই জীবন্ত হয়ে এল। একজন রিফিউজির, স্মৃতির থেকে বড় শত্রু নেই। স্মৃতি তার আত্মার ক্যান্সার।

"অতি কষ্টে চাপতে চেষ্টা করতাম। সিস্লি, পিসারো এবং রেনোয়া'র আঁকা ছবিগুলি বারবার দেখতে যেতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিউজিয়মে কাটাতাম, কিন্তু তাতে উল্টো ফল হত। ওরা আর শান্তি দিতে পারত না। ওরা চেঁচিয়ে বলত : ওঠো, মানুষের মত চ্যালেঞ্জ নাও। ওরা মনে করিয়ে দিত আমার ফেলে আসা দেশের কথা, সেই শহরের রাস্তা, যার ধারের দেওয়ালগুলি লিলাক লতায় ঢাকা। পুরানো গীর্জাগুলির

চ্ড়ো বিকেলের সোনালী রোদে স্নান করে উঠেছে। তাদের ঘিরে পাখীদের নীড়ে ফেরার কলতান। আর আমার স্ত্রী।

"আমি এক সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ গুণ নেই। অন্য সব মানুষের মত আমরা স্বামী-স্ত্রী চার বছর একসঙ্গে বসবাস করেছিলাম,—পরম শান্তিতে, আনন্দে, কিন্তু কোন বিরাট উন্মাদনা ছিল না। প্রথম কয়েক মাসের পর আমাদের সম্পর্কে বলা যেত, সুখী পরিবার। দুটি বিবেচক মানুষের মিলন, যার মধ্যে একে অন্যের কাছে পাওনার হিসাব কমই। আমরা দু'জনে দুজনকে খুব ভালবাসতাম।

"অথচ পাসপোর্টটি হাতে পেয়ে সব কিছু অন্যভাবে দেখতে লাগলাম। আমাদের বিবাহিত জীবন আর পাঁচজনের মত হয়েছিল বলে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। সব পণ্ড করেছি। কিসের জন্য জীবন ধারণ? এখনই বা কী করছি? শুধু একটা গর্তে ঢুকে শেয়ালের মত রাত্রিবাস করছি। কতদিন এইভাবে চলবে? যুদ্ধ হবেই, জার্মানী জিতবেই। কারণ, অন্য দেশগুলির প্রস্তুতি নেই। অতঃপর? পূর্ণ শক্তি আর সময় থাকতেও কোন গর্তে লুকাব? কোন ক্যাম্পে পচে মরব? ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, কোন দেওয়ালে আমাকে গুলি করে মারা হবে?

"যে পাসপোর্ট শান্তি দিতে পারত, সেই আমাকে মরীয়া করল। যতক্ষণ পা চলত, রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। ঘুমাতাম না। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখতাম, আমার স্ত্রী গেস্টাপোর কারাগারে। তন্দ্রা টুটে যেত। একদিন শুনতে পেলাম, হোটেলের উঠানে ও চেঁচিয়ে কাঁদছে। আর একদিন রে াজ্ কাফেতে ঢুকবার মুখে মনে হল, সামনের বড় আয়নাতে ওর সুন্দর মুখটি দেখলাম। আমার দিকে ঘুরে তাকাল। চেহারা ফ্যাকাশে হয়েছে, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। হঠাৎ মিলিয়ে গেল। দৌড়ে আয়নার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম। সে ঘরে পরিচিত মুখগুলি আছে, ও নেই।

"কিছুদিন যাবৎ একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল : ও প্যারীতে এসেছে এবং আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অন্ততঃ দশ বারো বার দেখেছি, ও রাস্তার বাঁকে ঘুরে গেল। আর একবার দেখলাম ও লাক্সেমবুর্গ গার্ডেন-এর বেঞ্চিতে বসে আছে। কাছে যেতে একটি অপরিচিত মহিলা অবাক হয়ে তাকালেন। আর একদিন কংকর্ড প্লেসে গাড়ির স্রোত সবে চলতে শুরু করেছে, ও তখন রাস্তা পার হল। সেই চলার ভঙ্গী, কাঁধের গড়নও চেনা। পরনের পোষাকটাও অত্যন্ত চেনা। ট্র্যাফিক পুলিশ গাড়ির স্রোত থামাতে ওকে ধরতে গেলাম। ও ততক্ষণে পাতাল রেল স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। আমি নীচে পৌঁছাতে, রেলের অপসৃয়মান লাল বাতিটি শুধু দেখতে পেলাম।

"লসার নামে এক বন্ধুকে সব বললাম। লসার আগে ব্রেস্‌লে শহরে ডাক্তার ছিল। তখন প্যারীতে মোজা বিক্রি করত। ও বলল, "বেশী একলা থেকো না। কোন বান্ধবী জুটিয়ে নাও।"

"তাতে কাজ হল না। বুঝতেই পারছেন ভয়, নিঃসঙ্গ জীবন ইত্যাদি মানসিক

প্রশান্তি হরণ করেছিল। ঐ অবস্থায় মানুষ খোঁজে মানবদেহের উত্তাপ, একটি স্নেহভরা কণ্ঠস্বর। আমার বরাদ্দ ছিল, একটু অপরিচিত বিশ্রী ঘর, যেখানে মনে হত পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মরীয়া অবস্থায় পাশে একজনের নিঃশ্বাসের শব্দও ভাল লাগে। কিন্তু হায়, আমার অদৃষ্টে সবই দিবাস্বপ্ন। অপেক্ষা করতাম, নিজেকে আশার ছলনে ভুলালাম।

"ঐ কাহিনী এখন বলতে গেলে মনে হয় অদ্ভুত, বাস্তববিরোধী। অথচ তখন এমন মনে হয়নি। সব কষ্টের তখন একটাই সার্থক লক্ষ্য ধরে নিয়েছিলাম: জার্মানী ফিরতেই হবে, স্ত্রীকে দেখতেই হবে। না জানি কতদিন ও অন্য লোকের ঘর করছে। তা হোক ওকে দেখতেই হবে। এটাই যুক্তিসঙ্গত।

"প্রতিদিন স্পষ্টতর হচ্ছিল যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হিটলার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে একটুও দ্বিধা করেনি। সুদেতেনল্যান্ড নিয়ে খুশি থাকেই নি, গোটা চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করতে চাইছিল। পোল্যান্ড সম্পর্কে হিটলারের একই মতলব। এর অর্থ যুদ্ধ, কারণ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তখনো পোল্যান্ডের সাথে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ। যুদ্ধ তখন মাস নয়, সপ্তাহ—দিন বললেই ভাল হয়—দূরে। আমারও আর সময় ছিল না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। বাকি জীবন তার উপর নির্ভরশীল। স্থির করলাম, জার্মানী ফিরে যাব। পরে কি হবে জানি না. জানার দরকারও নেই। যুদ্ধ হলেও বাঁচার পথ ছিল না। সুতরাং পাগলামি করতে বাধা কোথায়?

"এক অজানা প্রশান্তি খুঁজে পেলাম। তখন মে মাস। প্যারীতে ঝলমলে টিউলিপ ফুলের সমারোহ। রাতে রুপালী চাঁদনীর রোশনাই। কিন্তু তখনই খবরকাগজ অফিস-গুলির গায়ে লাল নিয়ন বাতির রিবন দিয়ে যে খবরের সারাংশ সাজাত তার একটাই অর্থ: যুদ্ধের দেরী নেই।

"প্রথম গেলাম সুইজারল্যান্ড। ভুয়া পাসপোর্ট চালানোর প্রকৃষ্ট স্থান। ফরাসী বর্ডার গার্ড পাসপোর্টটিতে অযত্নে চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল। আমিও এমনটি আশা করেছিলাম। কারণ, কেবলমাত্র ডিকটেটরশিপের আওতা থেকে পালানো শক্ত, ফ্রান্স থেকে নয়। কিন্তু সুইস বর্ডার গার্ডকে দেখে ভয়ে পেট ভেতরে ঢুকে গেল। যথাসম্ভব নির্ব্বিকারভাবে বসে রইলাম। হৃৎপিণ্ডটি এত কাঁপছিল যে, ছাড়া পেলে উড়ে পালিয়ে যেত।

"গার্ডটি পাসপোর্ট পরীক্ষা করল। লোকটির শক্তসমর্থ চেহারা, চওড়া কাঁধ, গায়ে টোব্যাকোপাইপের গন্ধ। রেলের কামরার আলোর দিকে পিছন করে দাঁড়াল, তাতে আলো ঢাকা পড়ল। যেন আমার স্বাধীনতা শেষবারের মত চাপা পড়ল—কামরাটি মন্ত্রবলে কয়েদখানা হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষে ও পাসপোর্ট ফেরত দিল। সহজ হবার জন্য বললাম, আপনি আমার পাসপোর্টে শীলমোহর দিতে ভুলে গেছেন।"

"ও হেসে উত্তর দিল, ঘাবড়াবেন না। শীলমোহর দিয়ে দেব। না দিলেই বা কী আসে যায়?"

"না। শীলমোহরটা আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে।"

লোকটি পাসপোর্টে শীলমোহর এঁকে চলে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার পাসপোর্টটি আরও একটু খাঁটি প্রমাণ হবে।

কোন ট্রেনে জার্মানী ফিরব সেই চিন্তায় সুইজারল্যান্ডে একদিন কাটিয়ে দিলাম। সামান্য ভয়ও লাগছিল। কে জানে, ঘরে ফিরতে ইচ্ছুক জার্মান এবং অস্ট্রিয়ানদের পাসপোর্ট হয়ত বর্ডারে বিশেষভাবে পরীক্ষা করবে। হয়ত করবে না। তবু, বেআইনী-ভাবে জার্মান বর্ডার পার হওয়া শ্রেয় মনে হল।

জুরিখ মেন পোস্টঅফিসে গেলাম। বহু বছর আগে যখন প্রথম জুরিখে আসি তখনো তাই করেছিলাম। সাধারণতঃ জেনারেল ডেলিভারি কাউণ্টারে পরিচিত লোক দেখা যায়। বাস্তুহারার দল এখানে ভিড় করে। ওদের কাছে অনেক খবর পাওয়া যায়। ওখান থেকে গেলাম গ্রীফ্ কাফে, প্যারীর রোজ্ কাফের নকল। অনেকের সঙ্গে দেখা হল, যারা জার্মানী থেকে গা ঢাকা দিয়ে সুইজারল্যান্ডে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এমন কেউ ছিল না, যে লুকিয়ে জার্মানী গিয়েছে। কারণ সহজেই অনুমেয়। আমি ছাড়া কে জার্মানীতে ফিরতে চাইবে? সবাই অবাক হয়ে তাকাত। যখন বুঝত, আমি সিরিয়াস, আস্তে আস্তে সরে যেত। ওরা ভাবত, যে জার্মানী ফিরতে চায় সে নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতক। জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যে মেনে নেবে একমাত্র সে জার্মানী ফিরতে চাইবে। তেমন লোক অনেককেই বিপদে ফেলতে পারে।

"আমি একা। ওরা আমাকে এড়িয়ে চলত, যেন এক খুনে। আমিও সব কথা খুলে বলতে পারতাম না। কে শুনবে?"

"তৃতীয় দিন ভোর ছ'টায় পুলিশ বিছানা থেকে টেনে তুলল। পরিষ্কার বুঝলাম, কোন পরিচিত লোক বলে দিয়েছে। পাসপোর্ট পরীক্ষার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। ভাগ্যে পাসপোর্টে শীলমোহর করিয়ে নিয়েছিলাম। প্রমাণ করতে পারব, মাত্র ক'দিন আগে আইন মাফিক সুইজারল্যান্ডে এসেছি। দুই পাশে প্রহরী নিয়ে চলার সে অভিজ্ঞতা ভুলব না। ঝকঝকে সকালের রোদে শহরের মিনার আর ছাদগুলি আকাশের দিকে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। দূরের একটি বেকারী থেকে গরম রুটির গন্ধ ভেসে আসছিল। সমস্ত সান্ত্বনা ঐ গন্ধে লুকানো। বুঝতে পারছেন……"

আমি ঘাড় নাড়লাম, "নিজে কয়েদী হলে পৃথিবী আরও সুন্দর দেখায়। সেই অনুভূতি যদি ধরে রাখা যেত!"

"আমারও ঐ অনুভূতি হয়েছিল।"

"ধরে রাখতে পেরেছিলেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

শোয়ার্থস্ উত্তর দিলেন, "জানি না। তাই খুঁজে বেড়াতেও চাই না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেছে। ধরে যখন রেখেছিলাম, তখন কি সম্পূর্ণ ধরতে পেরেছি? আর কি ফিরে পাব? সেই গুলিই কি আমরা হারাই না, যেগুলি মনে হয় শক্ত করে ধরেছি?

চলে গেলে তার যে রেশ থাকে, সে ত' যাবার নয় ; পাল্টাবার ও নয়। তবুই কি সত্যি পাই না ?" শোয়ার্থস্ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। চোখের মনি দুটি বিস্ফারিত। ভাবলাম উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ।

পাশের টেবিলের ইভ্‌নিং-ড্রেস পরা মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দা পেরিয়ে, বন্দরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে, ডিনার জ্যাকেট-পরা ভদ্রলোককে বললেন, "আমাদের ফিরে যেতেই হবে কেন ? এখানে থাকতে পেলে, আমি মোটেই আমেরিকা যেতে চাই না।"

দ্বিতীয়

শোয়ার্থস্ বলতে থাকলেন, "জুরিখে পুলিশের কাছে মাত্র একদিন আটক ছিলেন। বড় কঠিন দিনটি। ভয় ছিল, ওরা হয়ত পাসপোর্ট পরীক্ষা করবে। ভিয়েতনামে ফোন করলে অথবা কোন বিশেষজ্ঞকে ডাকলেই, আমার জালিয়াতি ধরা পড়ত।"

সন্ধ্যা নাগাদ সব চিন্তা ত্যাগ করলাম। আমাকে কয়েদ করলে, অগত্যা জার্মানী ফেরার মতলব স্থগিত রাখতে হবে। যা হোক একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে ওরা এই শর্তে মুক্তি দিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুইজারল্যান্ড ছাড়তে হবে।

স্থির করলাম, অস্ট্রিয়াতে লুকোব। অস্ট্রিয়ার বর্ডার সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল। জার্মান অপেক্ষা ঐ বর্ডারে শিথিল পাহারা। হবেই বা না কেন ? ঐ দেশগুলিতে যেতে কে আগ্রহী ? বরং বহু লোক ওদের দেশ থেকে পালাতে ব্যাকুল।

"ওবেরিয়ে-গামী ট্রেনে উঠলাম। কাছাকাছি কোথাও বর্ডার পার হয়ে যাব। আকাশে বর্ষা থাকলে সুবিধা হত। কিন্তু দুইদিনের মধ্যে বৃষ্টি হল না। তৃতীয় রাতে পালালাম, কারণ, আর বেশী থাকা বিপজ্জনক।"

সে রাতে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে গাছপালার প্রতি পলে বেড়ে ওঠার শব্দটুকুও শুনতে পাচ্ছিলাম। বিপদের সম্ভাবনায় ইন্দ্রিয় অধিকতর সচেতন হয়। কেবল চোখ, কানই তখন কাজ করে না, সারা দেহ বিভিন্ন সংকেত ধরতে পারে। বিশেষতঃ রাতে মানুষের চামড়াও সামান্যতম শব্দ শুনতে পায়। মানুষ ভয়ে মুখ হাঁ করে। তখন তার মুখও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা পায়।

সেই রাত ভুলব না। আমার দেহের সমস্ত তন্তু সজাগ ছিল। ইন্দ্রিয়গুলি ছিল সতর্ক। সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। মনে হচ্ছিল, জীবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বিস্তৃত একটি সুউচ্চ সেতু পার হচ্ছি ; পার হয়ে গেলে, সেতুটিও রূপালী ধোঁয়ার মত আকাশে মিলিয়ে যাবে। শুধু এই নয়,—

যুক্তি থেকে আবেগে, নিরাপত্তা থেকে এ্যাডভেঞ্চার, বাস্তব থেকে স্বপ্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছিলাম। আমি সম্পূর্ণ একাকী। তবু, সে একাকীত্ব আর দুঃসহ নয়, তার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ের স্বাদ পেয়েছি।

রাইন নদের কিনারে এলাম। ওখানে অপেক্ষাকৃত কম চওড়া। উলঙ্গ হয়ে জামা কাপড়গুলি বান্ডিল পাকিয়ে মাথায় বাঁধলাম। উলঙ্গ হয়ে জলে নামার এক অদ্ভুত অনুভূতি। জলের রঙে রাতের কালো মিশেছে। এক শীতল, অজানা ভাব। ভাবলাম, বিস্মরণের নদীতে ডুব দিচ্ছি। উলঙ্গ হওয়া এখানে তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেন জানাশোনার বোঝা পিছনে ফেলে এলাম।

অপর পারে উঠে গা মুছলাম। জামা কাপড় পরে যাত্রা শুরু করলাম। বর্ডারের রেখা ওখানে কি ভাবে বিস্তৃত, জানা ছিল না। জঙ্গলের কিনারে একটি রাস্তা ধরে চললাম। এক গাঁয়ের কাছে কুকুর ডেকে উঠল। দীর্ঘ সময় কোন মানুষ দেখতে পেলাম না। ভোরের আগে কেউ ওঠে না। ভারী শিশির পড়েছে। জঙ্গলের ধারে একটি হরিণ দাঁড়িয়ে। চলতে চলতে কানে এল, চাষীরা ঠেলাগাড়ি ঠেলছে। রাস্তার পাশে লুকালাম। এত ভোরে কাউকে বর্ডারের দিক থেকে আসতে দেখলে, লোকের সন্দেহ হতে পারে। পরে নজরে এল, দুই কাস্টমস্ গার্ড সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে। তাদের ইউনিফরম দেখে বুঝলাম, আমি অস্ট্রিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে। অস্ট্রিয়া সবে এক বছর হল জার্ম্মানীর পদানত হয়েছে।

এতক্ষণে ইভ্নিং-ড্রেস পরা মহিলা তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে গাড়িবারান্দা ছেড়ে চললেন। মহিলার কাঁধ দুটি রোদে পোড়া। উনি সাথী ভদ্রলোকের থেকে লম্বা। নীচে সিঁড়ির কাছে কিছু টুরিস্ট ঘোরাফেরা করছে। মনে হচ্ছিল, ওদের কেউ কোনদিন পুলিশের তাড়া খায়নি।

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "কিছু স্যান্ডউইচ্ খেয়ে নিলাম। কাছেই পাহাড়ী ঝরণাতে জল খেলাম।" আবার চলা শুরু করলাম। গন্তব্যস্থল ফেল্ড্‌কির্শ শহর। এটি স্বাস্থ্য-নিবাস, যেখানে দূরাগতের দিকে লোকের সন্দেহ দৃষ্টি নেই। এইবার বিপজ্জনক ভাবে প্রথম ট্রেন চড়তে হল। কামরায় পা দিয়ে দেখি জার্ম্মান পুলিশের ইউনিফরম পরা দু'জন বসে আছে।

"ইউরোপের পুলিশ সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতাই ছিল। ফলে, পিছু হঠলাম না। ওদের একজনের পিস্তল পোষাকের উপর থেকে নজর পড়ছিল। তারই পাশে, এক কোণে বসে পড়লাম।

পাঁচ বছর বাদে ভয়ের প্রতিমূর্ত্তির সাথে সাক্ষাৎকার হল। বিগত সপ্তাহগুলিতে এইরকম ঘটনার জন্য মনকে প্রস্তুত করেছি। তবু বাস্তব অন্য জিনিষ। সমস্ত শরীর জুড়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভয়ে পাকস্থলী শুকিয়ে গেল। মুখের ভিতর উনুনের মত গরম হল। ওরা দু'জন এক পরিচিত বিধবা সম্পর্কে গল্প করছিল। বিধবাটি রঙ্গিলা ধরনের। তার প্রেমকাহিনীর বর্ণনা হচ্ছিল। অল্পক্ষণ বাদে ওরা হ্যাম্ স্যান্ডুইচ্

থেকে লাগল। শিকারীর মত দেখতে, একটু দূরে বসা পুলিশটি আমাকে জিজ্ঞেস করল,
"আপনি কতদূর চলেছেন ?"

"ব্রেগেনজ্ যাব।"

"আপনাকে এদিকে নতুন মনে হয় ?"

"হ্যাঁ, ছুটি কাটাতে এসেছিলাম।"

"কোথা থেকে ?"

একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলাম, "হ্যানোভার থেকে। ওখানে ত্রিশ বছরের বাস।" পাসপোর্টে ভিয়েনার কথা লেখা থাকলেও বললাম না, কারণ ভিয়েনার কথার টান আয়ত্ত ছিল না।

"হ্যানোভার ! ওঃ, বহুদূর !"

"হ্যাঁ, অনেক রাস্তা। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি ছুটি কাটাবে কে বলুন ?"

শিকারী হেসে বলল, "ঠিকই। আপনার কপাল ভাল, এতদিন আবহাওয়াও ঝরঝরে ছিল।"

"ভয়ে, শার্ট পিঠে সেঁটে যাচ্ছিল। তবু উত্তর দিলাম, আবহাওয়া চমৎকার ছিল। কিন্তু গরম একটু বেশী পড়েছিল।"

"দু'জন আবার সেই বিধবার গল্প শুরু করল। কয়েক স্টেশন পরে ওরা নেমে গেল।" কামরায় আমি একা। ইউরোপের সবচেয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। কিন্তু আমার মন তাতে ছিল না। পরিতাপ, ভয় এবং হতাশার মিশ্রণে ডুবে গিয়েছিলাম। কি জন্য বর্ডার পার হলাম ? এই প্রশ্নের উত্তর হারিয়ে ফেললাম। জানলার পাশে স্থাণুর মত বসে রইলাম। আমি নিজেই নিজের বন্দী। ভাবছিলাম, এখনো সুইজারল্যান্ডে ফেরার ট্রেন আছে, রাতের দিকে।

কিন্তু, না ! বাঁ হাত দিয়ে মৃত শোয়ার্থসের পাসপোর্টটা শক্ত করে ধরলাম। তাতে শক্তি ফিরে পেলাম। নিজেকে বলতে থাকলাম, এখন ফিরে লাভ নেই। যত ভিতরে যাব, ততই বিপদ কাটবে। ঠিক করলাম, রাতটা ট্রেনে কাটিয়ে দেব। ট্রেনে কেউ পাসপোর্ট / ভিসার কথা জানতে চায় না। মানুষ ভয় পেলে মনে করে, পৃথিবীর বাকি সবাই তাকে খুঁজে বার করতেই ব্যস্ত।

চোখ বুজে থাকলাম। একাকী কামরায় বসে বিপদের আশঙ্কায় বারবার আঁতকে ওঠা স্বাভাবিক। না, আর ভয় করব না। কারণ, এক ইঞ্চি ভয় পেলে, সে শিগগির এক গজ হয়ে যাবে। নিজেকে বললাম, "এখন তোমাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাছে তোমার মূল্য এক মুঠো ধুলোর বেশী নয়। তোমার চেহারাতেও সন্দেহ-জনক কিছু নেই।"

"ভাবলাম, সত্যিই ভয় অহেতুক। পারিপার্শ্বিক জনতার সাথে আমার আকৃতিগত প্রভেদ নেই। আমার মাথায় আর্য্য জার্মানদের মতই সোনালী চুল। বরং হিটলার, গোয়েবলস্, হেস্ এবং অন্যান্য নেতাদের আর্য্যসন্তান মনে হয় না।

মিউনিখ পৌঁছে ট্রেন ছাড়লাম। এই ঘণ্টা হাঁটতে বাধ্য হলাম। এই শহরের সাথে আমার পরিচয় নেই। কোন পরিচিত লোকও নেই। ফ্রানসিস্‌কানব্রাউ নামে এক রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলাম। আগেই লোক ভর্তি হয়ে আছে। একলা বসে ওদের কথোপ-কথন শুনছিলাম। কয়েক মিনিট পরে একটি মোটা, ঘর্মাক্তকলেবর লোক আমার টেবিলে বসল। লোকটি গোমাংস সিদ্ধ এবং বীয়ার অর্ডার দিয়ে খবরকাগজ পড়তে লাগল। এ যাবৎ আমার জার্মান খবরকাগজ পড়ার ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু, তখন দুটি কিনলাম। বহুদিন পর জার্মান লেখা পড়লাম।

সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি ন্যক্কারজনক, রক্তখেকো কাহিনী এবং মিথ্যায় ভরা। বহির্জগতকে দেখানো হয়েছে কুৎসিত, বিশ্বাসঘাতক রূপে,—জার্মানী দ্বারা অধিকারই তাদের পরিত্রাণের সহজতম উপায়। বলা বাহুল্য, জার্মানীতে এই কাগজ দুটির ভাল নাম ডাক ছিল।

"টেবিলের সাথীকে লক্ষ্য করছিলাম। খাওয়া সেরে বীয়ার খেল, খবরকাগজ পড়ল, —তৃপ্তির আমেজ।" অন্য যারা খাচ্ছিল, তাদের অনেকে খবরকাগজ পড়ছিল। কাগজের মিথ্যা প্রচারে তারা আদৌ বিরক্ত মনে হয় না। বরং প্রচার কাহিনীগুলি দৈনন্দিন খাদ্যের মতই তাদের কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক।

"কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে অস্‌নাব্রুকের একটি ছোট্ট খবরে নজর আটকে গেল। খবরটি হল, লটার স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে।" রাস্তাটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। হেগার গেট থেকে শুরু হয়ে, রাস্তাটি শহরের অপর প্রান্ত ভেদ করে চলে গেছে। হঠাৎ নিজভূমে পরভূমের থেকেও একা লাগল। বিরক্তিতে আগেই মন ভরে গিয়েছিল। বুঝবার জন্য মন শক্ত করলাম। জানতাম, অস্‌নাব্রুকের যত কাছে যাব, বিপদ তত বাড়বে। পুরানো বাসিন্দারা চিনতে পারবে।

"পাছে হোটেলে থাকলে লোকেব দৃষ্টি পড়ে, তাই ছোটখাট ভ্রমণের উপযোগী টুকিটাকি, আর একটি সস্তা স্যুটকেস কিনলাম।" ট্রেনে উঠলাম। তখনো ধারণা নেই কিভাবে স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করব। প্রতি মিনিটে প্ল্যান পাল্টাতে থাকলাম। অবশেষে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম। কারণ, তখনো জানি না, ও ততদিন বাপের বাড়ির (এরা অনুগত রাষ্ট্রভক্ত) কথামত অন্য লোককে বিয়ে করেছে কিনা। জার্মান কাগজগুলি পড়ে বুঝলাম, দেশে এমন মানুষ অল্পই আছে, যারা রাষ্ট্রের প্রচারকে বেদবাক্য মনে করে না। জার্মানীতে বিদেশী কাগজের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত। অতএব, তুলনার সম্ভাবনা নেই।

মুনস্টার শহরে একটি সাদাসিধে হোটেলে উঠলাম। রাতে এবং দিনে যত্রতত্র ঘুরে বা ঘুমিয়ে কাটানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং হোটেলে উঠতে হল। আর হোটেলে থাকলে গতিবিধি পুলিশের নজরে আসবেই। "আপনি মুনস্টার শহর দেখেছেন?"

উত্তর দিলাম, "সামান্যই দেখেছি। পুরানো শহর। অনেক গীর্জা আছে। ওয়েস্ট-ফেলিয়া চুক্তি সই হয়েছিল ঐ শহরে।"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, "হ্যাঁ, তিন, বছরের যুদ্ধের শেষে মুনস্টার এবং অস্নাব্রুকে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি সই হয়েছিল ১৬৪৮ সালে। কে জানে, এই যুদ্ধ ক' বছর চলবে ?"

উত্তর দিলাম, "এ ভাবে চললে বেশী দিন লাগবে না। জার্মানরা চার সপ্তাহেই ফ্রান্স দখল করেছিল।"

ওয়েটার জানাল, রেস্তোরাঁ বন্ধ হতে চলেছে। বাকি সবাই চলে গেছে। শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোনো জায়গা খোলা আছে ?"

ওয়েটার জানাল, লিসবনে তেমন কাফে বা বার নেই। শোয়ার্থস্ তাকে অল্প কিছু টিপস্ দিতেই সে গোপনে একটি রাশিয়ান নাইট ক্লাবের ঠিকানা জানাল, "ভারী বাছাই করা লোকের জায়গা।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের ঢুকতে দেবে ?"

"নিশ্চয় দেবে, স্যার। আমি বলছিলাম, ওখানকার মেয়েগুলো বাছাই করা। সব জাতেরই পাওয়া যায়। এমন কি জার্মানিও।"

"কতক্ষণ খোলা থাকে ?"

"যতক্ষণ খদ্দের থাকে। এই সময় প্রচুর জার্মান খদ্দের আছে।"

"কি রকম জার্মান ?"

"জার্মানরা যেমন হয়।"

"পয়সাওলা ?"

"নিশ্চয়।" ওয়েটার হেসে উত্তর দিল, "জায়গাটা সস্তা নয়। তবে, আমোদ-প্রমোদের ঢালাও বন্দোবস্ত। কেবল বলবেন, মানুয়েল পাঠিয়েছে। আর কিছু বলতে হবে না।"

"সাধারণতঃ আরও কিছু বলতে হয় ?"

"না। দরওয়ান ভুয়া নামে আপনাদের জন্য মেম্বরশিপ কার্ড করে দেবে। এটা একটা নিয়ম মাত্র।"

"ভালই মনে হচ্ছে।"

শোয়ার্থস্ বিল চুকিয়ে দিলেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। আশপাশের বাড়িগুলি একে অপরের গায়ে হেলান দিছে ঝিমুচ্ছে। মানুষের নাসিকাগর্জনও কানে আসছিল।

শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "রাতে আলোতে আপনার অসুবিধা হয় ?"

"হ্যাঁ, আমি ইউরোপের ব্ল্যাক আউটের ঘোর কাটাতে পারিনি। ভয় হয়, কেউ বাতিগুলি নেভাতে ভুলে গেছে। সেই ফাঁকে শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন বোমা বর্ষণ করবে।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "ভগবান আলোককে বর রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আজ আমরা আলোকে ঢেকে রাখি, কারণ, আমরা খুনে হয়েছি। হৃদয়ে যে ভগবান আছেন, আমরা তাঁর কণ্ঠরোধ করছি।"

উত্তর দিলাম, "গল্পটা অন্যরূপ। ভগবান মানুষকে আলোক বর দিতে চান নি। প্রমিথিয়াস এটি চুরি করেছিলেন। দেবতারা তাই রুষ্ট হয়ে মানুষকে যন্ত্রণের দাহ অভিশাপ দিলেন।"

শোয়ার্থস্ আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, "আমি ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে দিয়েছি। ওতে বিষয়ের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয়।"

"হয়ত তাই, তবু, সেই সূত্রে আশার রেখা ফিরে পেলে ক্ষতি কি?"

"ঠিকই। কিন্তু, ভুলছেন কেন যে, আপনার প্রথম লক্ষ্য পালানো। এমন মানুষ কি করে তামাশার কথা ভাবে?"

"আপনি কি পালাচ্ছেন না?"

"শোয়ার্থস্ মাথা নাড়লেন, "না, আর পালাতে চাই না। এখন ফিরতে চাই।"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

বিশ্বাস করতে পারলাম না, উনি দ্বিতীয়বার জার্ম্মানীতেই ফিরতে চান।

তৃতীয়

নাইট ক্লাবটি সারা ইউরোপ জুড়ে ১৯১৭ সালের পরে গজানো অগণিত শ্বেত রাশিয়ান ক্লাবের একটি। এই ক্লাবগুলিতে একই ধরনের ওয়েটার দেখা যায়—যারা অতীতে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের বাদকের দলও প্রাক্তন রুশ সম্রাটের প্রাসাদরক্ষীদের দ্বারা পুষ্ট। এগুলিতে দাম বেশ চড়া। ভিতরেই আবহাওয়ায় স্ফূর্ত্তির স্পর্শ কম। লাভের মধ্যে এই ক্লাবগুলির অভ্যন্তরে বাতি সাধারণতঃ কমজোর হত। আমরাও তাই চাই। আগের কাফের ওয়েটারের কথামত এখানে অনেক জার্ম্মান দেখতে পেলাম। কেউই রিফিউজি মনে হল না। অনেক জার্ম্মান দূতাবাস এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী। গুপ্তচরও আছে।

শোয়ার্থস্ বললেন, "রাশিয়ানরা অন্ততঃ বিদেশে জার্ম্মানদের থেকে ভাল জায়গা করে নিয়েছে। ওরা অবশ্য আমাদের পনের বছর আগে কাজে নেমেছে। পনের বছর পরভূমে নির্বাসনে কাটানোর অভিজ্ঞতা একটা গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনীয়।"

উত্তর দিলাম, "ইউরোপে প্রথম রিফিউজির প্লাবন বয়েছিল রুশদের। সাধারণ মানুষের মনে তখনো ওদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। অন্য দেশে পা দিতেই ওরা সেখানে থাকতে এবং কাজ করতে অনুমতি পেল। যখন আমাদের রিফিউজি হওয়ার পালা এল, পৃথিবীর করুণাভাণ্ডার ফুরিয়ে গেল। আমাদের সম্পর্কে ভাল বলার প্রায় কেউ নেই।

আমাদের কাজ করার, বাঁচবার কোন অধিকার নেই। কেউ কোন প্রকার পাসপোর্ট বা ভিসা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না।"

নাইট ক্লাবে পা দেওয়া থেকে নার্ভাস লাগছিল। হয়ত চারপাশ বন্ধ, ভারী পর্দা দেওয়া ঘরের প্রভাব। এক গাদা জার্মানের উপস্থিতি এবং আমি দরজা থেকে বহুদূরে বসেছি—এও একটা অস্বস্তির কারণ। দরজার গা ঘেঁষে বসা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, বসার জায়গা থেকে জাহাজটি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কে জানে, আমার অজান্তে কোন সংবাদ পেয়ে জাহাজটি রাতের আঁধারে ছেড়ে যাবে, আমি পড়ে থাকব।

শোয়ার্থস্ আমার মন বুঝতে পারলেন। পকেট হাতড়ে টিকিট দুটি সামনে রেখে বললেন, "নিন। যদি চান, এখনই এগুলি নিয়ে যেতে পারেন।"

লজ্জা পেয়ে বললাম, "দয়া করে ভুল বুঝবেন না। এখনো অনেক সময় আছে। আমারও তাড়া নেই!"

শোয়ার্থস্ কাহিনীর সূত্র ধরে নিলেন, এমন একটি ট্রেনে উঠলাম যেটি সন্ধ্যা নাগাদ অস্নাব্রুক পৌঁছাবে। এবার শুধু জার্মান বর্ডার পার হলেই হয়। কিছু আগে নিজের দেশের মাটি, মানুষ, সব কিছুই অপরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল ওরা কত আপনার। এমনকি গাছপালাগুলিও ডেকে কথা বলল। পরিচিত গ্রাম, যার পথ দিয়ে ছোটবেলায় স্কুলে গিয়েছি। সেই প্রিয় পিকনিকের স্থানটি যেখানে প্রথম পরিচয়ের অল্প ক'দিন পরেই হেলেনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কত পুরানো কথা মনে পড়ল।

সে পর্য্যন্ত ভয়ের প্রকৃতি ছিল বিক্ষিপ্ত। কখনো ভয়ে পাথর হয়ে গেছি। কিন্তু তাকে বিশ্লেষণ করার কথা মনে হয়নি। ওখানেই আরও ভয়। সেই সময় ছোট ছোট জিনিষগুলি—যাদের সাথে ভয়ের সম্পর্ক নিবিড় বলা চলে না, -সমস্বরে কথা কয়ে উঠল।

গ্রামগুলি পাল্টায়নি। গীর্জার চূড়ায় তেমনি নরম সবুজ শেওলা বিকেলের পড়ন্ত রোদে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। নদীতে তেমনি আকাশ ডুব দিয়েছে। পুরানো দিনে মাছ ধরতে যাওয়া, শিকারের স্মৃতি ও ভিড় করে এল। খোলা মাঠের উপর প্রজাপতি তেমনি খেলছে। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলি আর বনফুল একটুও পাল্টায়নি। যৌবনে যেমন দেখেছি তেমনি আছে। ওদের মধ্যে আমার যৌবন কবরে শায়িত? না, তাকে ফিরে পেতে হবে। আমি আশাবাদী।

উপর থেকে কিছুই পাল্টায়নি। ট্রেন থেকে দেখছিলাম, কিছু লোক। ওরা ইউনিফরম পরেনি। ধীরে গোধূলি নামছে। স্টেশন মাস্টারদের ছোট ছোট বাগানে ডালিয়া আর গোলাপ ফুটেছে, যেমন চিরকাল ফুটত। রাজনৈতিক কুষ্ঠব্যাধি থেকে ওরা মুক্ত। মাঠে রঙ বেরঙের গরু চরছে তেমনি শান্ত চোখ মেলে—তাদের গায়ে স্বস্তিকা আঁকা নেই। একটি গোলাবাড়িতে সারস দাঁড়িয়ে। চড়াই পাখীদের ওড়ার কামাই নেই।

শুধু মানুষ পাল্টেছে। এও অজানা ছিল না। তবু, সে সম্বন্ধে আমি জানতে চেয়েছি।

তাছাড়া, মানুষের পরিবর্ত্তনের মাত্রাও জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র এক নয়। ট্রেনের কামরা বার বার মানুষে ভরে যাচ্ছিল, আবার খালি হচ্ছিল। তাদের মধ্যে ইউনিফরম ছিল খুব কম লোকের গায়ে। ওদের কথাবার্ত্তাও সুইজারল্যান্ড বা ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের মত। চিরাচরিত আবহাওয়া, দিনের বিশেষ ঘটনাবলী এবং সবশেষে যুদ্ধের সম্ভাবনা। ওরাও যুদ্ধকে ভয় করে। তফাত হল, বহির্বিশ্ব বলে, জার্ম্মানী যুদ্ধ চায়, এরা বলে অন্য দেশগুলি জার্ম্মানীকে যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। তবু, সবাই শান্তি চায়।

গাড়ি থামল। অন্য সকলের সঙ্গে আমিও গেটের ফাঁক দিয়ে গলে গেলাম। স্টেশনের ভিতরটা পাল্টায়নি। আগের থেকে নোংরা আর অল্পপরিসর হয়েছে।

বান্‌ফ্ প্লেসে পা দিয়ে, ট্রেনে আসতে যা ভেবেছি সব ভুলে গেলাম। রাত এগিয়ে আসছে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে ভাব, যেন বৃষ্টি হয়েছে। ভয়ে, দুশ্চিন্তার ভিতরে কম্পন শুরু হল। আশেপাশে কিছুই দেখছিলাম না। বুঝতে পারলাম, বিপদ এগিয়ে আসছে। কষ্টে সাহস সঞ্চয় করলাম। মনে হচ্ছিল, একটি পাতলা কাঁচের আবরণের মধ্যে আছি, যে কোন সময় আবরণটি নষ্ট হবে।

মন ঘুরে গেল। ভাবলাম, অস্‌নাব্রুকে থাকা সমীচীন নয়। স্টেশনে গিয়ে মুনস্টারের টিকিট কিনলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "শেষ ট্রেন কখন ?" বুকিং ক্লার্ক একটি মৃদু হলুদ বাতি জেবলে কাউন্টারে বসে আছেন। যেন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। উনি উত্তর দিলেন, "রাত ন'টা কুড়িতে একটি, দ্বিতীয়টি এগারোটা বারোতে।" একটি প্ল্যাটফরম টিকিটও কিনলাম,--যদি কাজে লাগে। রেল স্টেশনগুলি লুকানোর জায়গা হিসাবে নিরাপদ নয়। কিন্তু ওখানে থাকলে পালাবার নানা ফন্দি ফিকির করা যায়। তাক বুঝে একটি ট্রেনে উঠুন, টিকিট চেকার ঝামেলা করলে, কিছু মাশুল দিয়ে পরের স্টেশনে নেমে যান।

আর এক ফন্দি মাথায় এল। অস্‌নাব্রুক শহরেই এক পুরানো বন্ধু ছিল। ও নাজিবিরোধী। ফোন করলে জানা যাবে ওর দ্বারা কোনো উপকার হবে কিনা। তাতে স্ত্রীকে সরাসরি ফোন করার ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। ও তখন কোথায় থাকে তাও জানতাম না।

টেলিফোন বুথের কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোন ডাইরেকটরীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম। ভয় হচ্ছিল, অন্য লোকও শুনতে পাবে। পরিচিতি এড়াবার জন্য বেঁকে নীচু হয়ে দাঁড়ালাম। আনমনা হয়ে কখন ডাইরেকটরীতে নিজের আসল নামের জায়গাটা খুলে বসলাম। দেখলাম, স্ত্রীর নাম, ফোন এবং বাড়ির নম্বর পাল্টায়নি। শুধু বিসমার্কের প্লেস নাম পাল্টে হিটলার প্লেস হয়েছে।

ফোন নম্বর দেখা মাত্র মনে হল, বুথের অল্প পাওয়ারের বাল্বটি প্রচণ্ড তেজে

জ্বলছে। আমি এক অত্যুজ্জ্বল সন্ধানী আলোর নীচে দাঁড়িয়ে, বাইরে ঘন অন্ধকার। নিজের পাগলামিতে শিউরে উঠলাম।

তাড়াতাড়ি ফোন বুথ ছেড়ে, প্রায়ান্ধকার স্টেশনের বাইরে পা দিলাম। নীল আকাশ, আর "আনন্দের মধ্যে শক্তি" পোস্টারের মুখগুলি আমার দিকে ভয়াল দৃষ্টিতে তাকাল। একটি দুটি ট্রেন এল। যাত্রীর ভিড় রাস্তায় উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন পুলিশ আমার দিকে এগিয়ে এল।

তবুও দৌড়ালাম না। ও হয়ত অন্য কাউকে খুঁজছে। ও একেবারে আমার সামনে এসে মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখল। জিজ্ঞেস করল, "দেশলাই আছে?"

"দেশলাই? অবশ্যই আছে।"

নিজের পকেট খুঁজতে লাগলাম। ও বলল, "দেশলাই কেন? আপনার সিগারেটই ত জ্বলছে।"

এত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম যে, জ্বলন্ত সিগারেটের কথা মনে ছিল না। ও সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী সিগারেট খাচ্ছেন। চুরুট মনে হয়?"

উত্তর দিলাম, "ফরাসী সিগারেট। বর্ডার পার হওয়ার আগে পেয়েছিলাম। বন্ধুর উপহার। ফরাসী কালো তামাকের তৈরী। আমারও খুব কড়া লাগে।"

ও হেসে উত্তর দিল, "সব চেয়ে ভাল, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়া। ফ্যুরারের মত। কিন্তু, তা সহজ নয়, বিশেষতঃ এই রকম সময়।" আমাকে নমস্কার করে চলে গেল।

শোয়ার্থস্ মৃদু হেসে বললেন, "যখন স্বাধীন মানুষ ছিলাম, অনেকে ভয়ের যে বিভিন্ন বর্ণনা দেন সেগুলি আজগুবি মনে হত। ওঁরা লেখেন, ভীত লোকেব হৃৎস্পন্দন থেমে যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়বার শক্তি থাকে না, শিরদাঁড়া বেয়ে হিমশীতল শিহরণ নামে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় ইত্যাদি- ভাবতাম, ওসব লেথকদের বাঁধা বুলি। বাস্তব থেকে অনেক দূরে। অপরপক্ষে ভাবতাম, ওঁদের বর্ণনা সত্যি হতেও পারে। পরে নিজের বাক্‌বিতন্ডায় হাসতাম।"

একটি ওয়েটার এসে বলল, "আপনাদের সঙ্গদান করার জন্য কাউকে প্রয়োজন?"

"না।"

সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে বারে দাঁড়ানো মেয়ে দুটির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন।" দেখলাম। দুজনই অত্যন্ত সুগঠিত টাইটফিটিং ইভ্‌নিং-ড্রেস পরেছে। মুখগুলি ভাল দেখতে পেলাম না। আবার বললাম, "না।"

ও উত্তর দিল, "ওরা ভদ্রঘরের। ডানদিকেরটি জার্ম্মান।"

"ও তোমাকে পাঠিয়েছে?"

নিষ্পাপ হেসে, ও উত্তর দিল, "আমি নিজেই এসেছি।"

"বেশ। তবে ওদের গুলি মারো। বরং কিছু খাবার আনো।"

শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "ও কী চাইছিল?"

"আমাদের সঙ্গে মাতাহারির নাতনীকে লটকে দিতে চায়। বোধ হয় ওকে মোটা টিপস্ দিয়েছেন ?"

"এখনো দিইনি। মেয়ে দুটি স্পাই মনে হয় ?"

"হতে পারে।"

"জার্মান ?"

"ওদের একজন।"

"কী মনে হয়,—আমাদের ভুলিয়ে জার্মানীতে নিয়ে এসেছে ?"

"মনে হয় না। রুশ বর্ডারেই ওরকম করা হয় শুনেছি।"

ওয়েটার কিছু খাবার আনল। শরীরে তখন মদের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। খাবারগুলি পেটে গেলেই কমবে। আমারও তাই প্রয়োজন। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি খাবেন না ?"

শোয়ার্থস্ আনমনা ভাবে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বলে চললেন, "আগে ভাবিনি সিগারেটগুলি গোপন কথা ফাঁস করতে পারে। এবার সব টুকিটাকি জিনিষ পরীক্ষা করে দেখলাম। দেশলাইটাও ফরাসী। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বাকি সিগারেটগুলি ফেলে দিয়ে জার্মান সিগারেট কিনলাম। মনে পড়ল, পাসপোর্টে ফ্রান্সে চুকবার শীলমোহর রয়েছে। ফরাসী শীলমোহর কী করে লুকাব ? ভয়ে ঘেমে গেলাম। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল। টেলিফোন বুথেই আবার হাজির হলাম।

সামান্য অপেক্ষা করতে হল। একটি অতিকায় পার্টি- ব্যাজে লাগানো এক মহিলা তখন ফোন করছিলেন। উনি দুটি নম্বর ডায়াল করে, আদেশ জানিয়ে দিলেন। বুথের বাইরে এলে দেখলাম, কোন কারণে উনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

বন্ধুর নম্বর ডায়াল করলাম। মহিলার কন্ঠস্বর ভেসে এল। জিজ্ঞেস করলাম, "ডাঃ মার্টেন্সের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?" আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কে বলছেন ?" উনি হয়ত ডাক্তারের স্ত্রী অথবা ঝি।

"ডাঃ মার্টেন্সের এক বন্ধু।" ভরসা করে নিজের নামধাম বলতে পারলাম না।

উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম ?"

উত্তর দিলাম, "ডাঃ মার্টেন্সের বন্ধু। এটুকু বললেই হবে। জরুরী দরকার।"

"দুঃখিত। আপনার নাম না বললে, ডাক্তারকে জানাতে পারব না।"

"এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতেই হবে। ডাক্তার আমার ফোনের অপেক্ষায় বসে আছেন।"

"সুতরাং, আপনার নাম বলতে অসুবিধা নেই……"

উনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ভাবছিলাম, আমার প্রথম চালটি ভেস্তে গেল। সোজা হেলেনকে ফোন করলে কেমন হয় ? নিজের নামে ফোন করলে বিপদ হতে পারে। ওর বাপের বাড়ির কেউ জানতে পারলে রক্ষা নেই। অন্য নামে করলে কেমন হয় ? ডাঃ মার্টেন্সের নাম মনে এল। আর এক মতলব মাথায় এল। ডাক্তারকে আমার শ্যালকের নামে ফোন করব। ডাক্তার ওকে ভাল চেনে। দশ বছর আগে দুজনের মনোমালিন্য হয়েছিল।

সেই মহিলা ফোন ধরলেন। বললাম, "জর্জ জর্গেন্স বলছি। ডাঃ মার্টেন্সকে চাই।"

"আপনি কি একটু আগে ফোন করেছিলেন ?"

"আমি স্থানীয় পার্টিনায়ক জর্গেন্স। এক্ষুণি ডাঃ মার্টেন্সকে চাই।"

"এক মিনিটে ডেকে দিচ্ছি," মহিলা বললেন।

শোয়ার্থস্ আমার দিকে তাকালেন, "ফোনের রিসিভার কানে নিয়ে কখনো জীবনের অপেক্ষা করেছেন ?"

উত্তর দিলাম, "না।"

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "অবশেষে শুনলাম, "ডাঃ মার্টেন্স বলছি," আমার গলা শুকিয়ে গেল।"

ফিসফিস করে বললাম, "রুডলফ্, আমি বলছি।"

"বুঝতে পারছি না "

"রুডলফ্, আমি বলছি। হেলেন জর্গেন্স এর ভাই।"

"ঠিক বুঝলাম না। আপনি কি স্থানীয় পার্টিনায়ক জর্গেন্স ?"

"আমি হেলেনের জন্য ফোন করছি। বুঝলেন ?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না," কণ্ঠে বিরক্তির আভাস, "আমি একটি রোগী দেখতে ব্যস্ত "

"আপনার চেম্বারে দেখা করতে পারি ? আপনি কি খুব ব্যস্ত ?"

"বুঝলাম না, আপনি কি বলতে চান। আমি আদৌ আপনাকে চিনতে পারছি না··· "

"আমি 'নুলো' বলছি," অবশেষে বলতেই হল।

"হঠাৎ মনে পড়ল বছর বারো বয়সে কার্লমের উপন্যাস থেকে ধার করা নাম ধরে পরস্পরকে ডাকতাম। ও আমাকে 'নুলো' বলে ডাকত। কিছুক্ষণ কিছু শোনা গেল না। তারপর মার্টেন্স আস্তে উত্তর দিল, "কী নাম বললেন ?"

"উইন্টো, তুমি কি পুরানো নামগুলি ভুলেছ ? ওগুলি ফ্যুরারের প্রিয় বই থেকেই ত' নেওয়া।"

"তা বটে। উইন্টো " মার্টেন্সের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

জনসাধারণ জানত, ফ্যুরার হিটলার, যিনি একদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করবেন, রাত্তে কার্লমে'র গল্প সঙ্কলন পাশে নিয়ে শুতেন। গল্পগুলি শিকারী, রেড ইন্ডিয়ান, ডাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে,- যা বারো বছরের ছেলেরও আজগুবি মনে হত।

"বললাম, "উইন্টো, আমার তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে ?"

"বুঝতে পারছি না তুমি কোথা থেকে ফোন করছ ?"

"অসনাব্রুক থেকে। কখন দেখা করব ?"

"আমি এখন রোগী দেখছি ···" ও যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিল।

"আমি অসুস্থ। তোমাকে দেখাতে চাই।"

"অসুস্থ হলে চলে এসো। ফোন করার দরকার কি?" মনে হল, ও কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

"কখন যাব?"

"সব চেয়ে ভাল, সাড়ে সাতটা। তার আগে নয়।"

"ঠিক আছে। সাড়ে সাতটায় দেখা করব।"

"ফোন নামিয়ে রাখলাম। ঘেমে নেয়ে গেছিলাম। ধীরে ধীরে বুথের বাইরে এলাম। মেঘের ফাঁকে পান্ডুর চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। স্টেশনের ঘড়ি দেখলাম। হাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে। বিনা কাজে স্টেশনে ঘোরাফেরা করা সন্দেহজনক, অতএব বাইরে এলাম। সব চেয়ে অন্ধকার, জনবিরল পথ ধরে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটি শহরের কেল্লার দিকে গিয়েছে। কেল্লার কাছাকাছি "পবিত্র হৃদয় গীর্জার" পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম। এই জায়গাটা থেকে নদী এবং বড় বড় বাড়ির ছাদ দেখা যায়। গীর্জার চুড়াটি চাঁদের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। অনেক পোস্টকার্ডে এই দৃশ্যের ছবি থাকে। জলের গন্ধে ফুলের সুবাস মিশে নাকে আসছিল। নদীর ধারে অনেক প্রেমিকযুগল বসে। একটি ফাঁকা বেঞ্চিতে বসলাম। আধ ঘন্টা পরে মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

গীর্জার ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। ঘন্টার আওয়াজ যেন হৃদয়ে অদৃশ্য টেনিস খেলায় মেতে উঠল। একজন খেলোয়াড় আমার পুরানো আত্মা,—যে অতি পরিচিত, ভীত। অপরজন নবজাগ্রত আত্মন, যে সাহসী, নিজের জীবন তুচ্ছ করতে চায়,—যেন সেই তার স্বাভাবিক পথ। এক অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্ব, আমি তার বিচারক। তবু, আমার একান্ত প্রার্থনা, নবজাগ্রতের জিত হোক।

সে আধঘন্টার প্রতিটি মিনিট মনে আছে। অবাক লাগছিল, নিজের দ্বন্দ্বের এত পক্ষপাতশূন্য বিচারক কি করে হলাম? এ যেন, এক বিরাট আয়নামোড়া ঘরের প্রত্যেক আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব পড়ছে,—একটি অপরটির থেকে বড় মনে হচ্ছে। আয়নাগুলি ভাঙ্গা এবং পুরানো। বিচারের কত অসুবিধা!

আমার পাশে একটি মহিলা বসলেন। বুঝবার উপায় নেই উনি কী চান? মনে সন্দেহ, উনি তখনকার বর্ব্বর শাসনযন্ত্রের আর একটি নাট বা বল্ট। সাবধানে উঠে পড়লাম। কানে এলো মহিলাটির বিদ্রূপের হাসি। সে হাসি আজও ভুলতে পারিনি।

চতুর্থ

ওয়েটিং রুম ফাঁকা ছিল। জানলার শেলফে রাখা টব থেকে লতানো গাছ উঠে গেছে। টেবিলে কিছু সাময়িক পত্র পড়ে আছে। তাতে সৈন্যসামন্ত আর পার্টির হোমড়া-চোমড়াদের ছবি। "হিটলার যুব দল"-এর ছবিও আছে। পদধ্বনি শুনলাম। ডাঃ মার্টেন্স দরজায় দাঁড়িয়ে। চশমা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল। নতুন গোঁফজোড়া এবং ঘরের মৃদু আলোর জন্য আমাকে চিনতে পারেনি। বললাম, "রুডলফ, আমি জোসেফ।"

ও আস্তে কথা বলতে ইশারা করল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে আসছ ?"

"তাতে কী আসে যায় ? আমি এসেছি। আমাকে সাহায্য করতেই হবে।"

ও চশমার ভিতর দিয়ে ভাল করে তাকাল। চোখ দুটি যেন এক বাটি ঝোলের মধ্যে দুটি মাছ। জিজ্ঞেস করল, "তোমার এখানে থাকার অনুমতি আছে ?"

"নিজেই নিজেকে অনুমতি দিয়েছি।"

"কি করে বর্ডার পেরোলে ?"

"সে কথা থাক। আমি হেলেনকে দেখতে এসেছি।"

ও বিস্ময়ে হতবাক হল। বিড়বিড় করে বলল, "শুধু এইজন্য এসেছ ?"

"শুধু হেলেনকে দেখতে এসেছি। আমাকে সাহায্য করতেই হবে।"

"হা ঈশ্বর !"

"কেন, ওকি মারা গেছে ?"

"না, মারা যায়নি।"

"তবে কি এখানে নেই ?"

"এখানেই আছে মনে হয়। অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে ছিল।"

"ওর সঙ্গে এখানে দেখা হওয়া সম্ভব ?"

"হতে পারে। আমার রিসেপশনিস্টকে ছুটি দিয়েছি। কোন রোগী এলে ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু, তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। দু'বছর হল বিয়ে করেছি। বুঝতেই পারছ "

আমি ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। হিটলারের "সহস্রবর্ষ ব্যাপী রাজ"-এ আত্মীয়কেও বিশ্বাস করা চলত না। আত্মীয়কে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারলে সেখানে রাষ্ট্রের পরিত্রাতারূপে গণ্য হত। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। শ্যালক আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

মার্টেন্স বলল, "আমার স্ত্রী অবশ্য পার্টির সভ্য নয়। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমরা

কোনদিন আলোচনা করিনি। ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করতে পারছি না। বরং তুমি ভিতরে এসো।"

আমরা কনসালটেশন চেম্বারে ঢুকলে, মার্টেন্স দরজায় চাবি দিল। বলল, "ওয়েটিং রুমের দরজা খোলা থাক। ওটা বন্ধ করলে লোকের বেশী সন্দেহ হবে।" ঠিকমত চাবি দেওয়া হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে বলল, "জোসেফ, তুমি লুকিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ, লুকিয়ে এসেছি। কিন্তু, আমাকে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে না। শহরের উপকণ্ঠে একটি হোটেলে উঠেছি। তোমার কাছে এসেছি কারণ, তুমিই একমাত্র লোক যে হেলেনকে বলতে পারবে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দীর্ঘ পাঁচ বছর ওর কোন খবর পাইনি। আবার বিয়ে করেছে কিনা তাও জানি না "

"শুধু এইজন্য এসেছ?"

"হ্যাঁ, আর কি জন্য আসব?"

"তোমাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে। রাতটা এই কোচে শুয়ে কাটাতে পারবে না? সকালে সাতটার আগেই তোমাকে জাগিয়ে দেব। সাতটার সময় ঝি আসে ঘর পরিষ্কার করতে। ও কাজ সেরে গেলে, তুমি আটটার পরে ফিরবে। এগারোটার আগে কোন রোগী আসে না।"

"হেলেন আবার বিয়ে করেছে?"

ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, "আমার ধারণা, ও তোমাকে এখনো ডাইভোর্স করেনি।"

"কোথায় থাকে? আমাদের সেই ফ্ল্যাটে?"

"তাই ত' জানি।"

"সঙ্গে আর কেউ থাকে?"

"আর কেউ মানে?

"ওর মা, ভাই বা বোন, কিংবা অন্য কোন আত্মীয়া?"

"মনে হয় না ওরা কেউ থাকে।"

"সেটাই তোমায় খুঁজে বার করতে হবে আর ওকে জানাতে হবে. আমি এসেছি।"

"তুমি নিজেই বল না? এই যে ফোন।"

"ধর, ঘরে যদি ও একলা না থাকে? যদি ওর ভাই থাকে? জানই ত' ও একবার আমার রাজনৈতিক মতবাদের নিন্দা এবং সমালোচনা করেছিল, যার ফলে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিল।"

"তা বটে। তা ছাড়া, হেলেনও হয়ত আমার মত অবাক হবে। তাতে সব ফাঁস হয়ে যাবে।"

"রুডলফ, আমার সম্বন্ধে হেলেনের বর্তমান ধারণা কি, তাও জানা নেই। পাঁচ বছর কোন খবর নেই। আমাদের বিবাহিত জীবনে একত্র বসবাস মাত্র চার বছর। চাব থেকে পাঁচ বড়—বিচ্ছেদই আমাদের জীবন দীর্ঘতর।"

"ঠিকই। তোমার কথা যুক্তিপূর্ণ।"

"এ কথা সোজা হিসেবেই পেয়েছি। তবু মনকে বোঝাতে পারিনি। আমাদের দুজনের দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবন।"

"হেলেনকে সব কথা লিখলে কেমন হয়?"

"এখন লিখে সব পরিষ্কার করে বলতে পারব না। বরং তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে মন বুঝতে চেষ্টা কর। উচিত মনে হলে বলবে, আমি এসেছি। ওই বলবে, কখন, কোথায় দেখা করা সম্ভব।"

"কখন যাব, বল।"

"কেন, এখনই যাও। দেরী করে কী হবে?"

মার্টেন্স চারপাশে তাকিয়ে বলল, "সেই সময় তুমি কোথায় থাকবে? এখানে নিরাপদ নয়। হয়ত স্ত্রী এখানে ঝি-কে পাঠাবে আমার খোঁজে। ও জানে, রোগী দেখা শেষ হলে উপরতলার ফ্ল্যাটে বিশ্রাম নিতে যাই। অবশ্য তোমাকে চেম্বারের ভিতর রেখে, বাইরে চাবি দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেটা সন্দেহজনক হবে।"

"আমাকে তালাচাবি বন্ধ করতে হবে না। বরং স্ত্রীকে বলবে, একটি রোগী দেখতে গিয়েছ।"

"ভেবেছিলাম, হেলেনের সঙ্গে দেখা করে আসার পর ও কথা বলব।"

মার্টেন্স ফন্দি ভাবতে থাকল। খানিকক্ষণ পরে আমার মাথায় একটি ফন্দি এল। বললাম, "আমি বড় গীর্জাতে অপেক্ষা করব। আজকাল গীর্জাগুলি সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু কখন তোমার সঙ্গে দেখা করব?"

এক ঘন্টা বাদে। তোমার নাম বলবে, অটো ষ্টার্ম। ততক্ষণে আমি না ফিরলে, হয় চিঠি লিখে যেও, অথবা আবার এসো। ঠিক আছে?"

"অপূর্ব।"

* * * *

"জনশূন্য পথ ধরে গীর্জার দিকে চললাম। বেশী দূর নয়। এগন ষ্ট্রীটে একদল সৈন্য গান গেয়ে মার্চ করে চলেছে। গানটি আগে শুনিনি। ডম্ প্লেসে আরও সৈন্য। অনতিদূরে গীর্জার পাশে শ'তিনেক লোক জুটেছে। ওদের অনেকের গায়ে পার্টির ইউনিফরম। মঞ্চের উপর একটি কালো লাউডস্পীকার দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রটি যেন নিজেই চেঁচিয়ে বলছে, পবিত্র জার্মানভূমির প্রতিটি ইঞ্চি পুনর্দখল করতে হবে! জার্মানী অন্যায়ের প্রতিশোধ চায়! একমাত্র সেই পথে বিশ্বশান্তি আসবে।

"জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। গাছের ডালগুলি হাওয়ায় দোল খেয়ে জনতার মুখের উপর বিশ্রী ছায়া ফেলছিল। সামনে বক্তা তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছেন। পিছনে ক্রুশবিদ্ধ পাথরের যীশু, দুই চোরের মাঝে দাঁড়িয়ে। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে বক্তৃতা শুনছিল। মাঝে মাঝে হাততালিও দিচ্ছিল। গোটা দৃশ্য তাৎপর্য্যপূর্ণ। বক্তা দক্ষিণ বা বাম যে কোন পন্থী কথা বলুন না কেন, পার্টির ইন্দ্রজালে দৈত্যসম জনমানস মুগ্ধ বিস্ময়ে সব গ্রহণ করছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বক্তা ওদের হয়ে চিন্তা করার

দায়িত্বটুকুও নিয়েছেন। ওদের সত্তা চিন্তামুক্ত। এই ত আধুনিক সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যথার্থ প্রতীক।

"গীর্জায় এত লোক থাকবে ভাবিনি। মনে পড়ল, যে মাসের প্রতি সন্ধ্যায় গীর্জায় প্রার্থনা সভা হয়। একবার ভাবলাম, কোন প্রোটেস্টান্ট গীর্জায় গেলে কেমন হয়? সেখানেও যদি প্রার্থনা সভা থাকে? বড় প্রবেশদ্বারের অদূরে উপাসনা গৃহের এক কোনে বসলাম। দেবতার মঞ্চে উজ্জ্বল মোমবাতির রোশনাই, কিন্তু উপাসনা গৃহে মৃদু আলোক। আমাকে চিনবার সম্ভাবনাও কম।"

দুটি সঙ্ঘবালককে নিয়ে পুরোহিত দেবমঞ্চের দিকে চললেন। বালক দুটি লাল এবং সাদা মেশানো পোষাক পরেছে। জলন্ত মোমবাতি আর সুগন্ধ ধূপ হাতে নিয়েছে। অর্গ্যান বাজিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত সুরু হল। উপাসনা গৃহের ভিতরেও মানুষের মুখে একই বিশ্বাস এবং তন্ময়তার ভাব, যা একটু আগে বাইরে দেখেছি। দুদলই অন্যের উপর নিজের ভাবনার বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। তফাত, গীর্জার অভ্যন্তরের পরিবেশ শান্ত এবং নম্র। তবু এই ধর্ম্ম, যা ঈশ্বর এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসতে শেখায়, চিরকাল এমন নরম ছিল না। অন্ধকার সেই শতাব্দীগুলিতে এর জন্যও রক্তস্রোত বয়েছে। অতীতে ধর্ম পাল্লা করে উৎপীড়ন করেছে এবং সয়েছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হেলেনের ভাই এই যুক্তিই দেখিয়েছিল, "আমরা তোমাদের ধর্মের রীতি গ্রহণ করেছি। ঈশ্বরে বিশ্বাসের নামে বিধর্মীর উপর ধর্ম যে অত্যাচার করেছে, আমরা তার অনুকরণ করেছি মাত্র। তবু অত নির্ম্মম হতে পারিনি। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই আমরা মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়েছি। সব সময় নয়।" আমি কুশে বদ্ধ হয়ে ঝুলতে ঝুলতে ওর উপদেশবাণী শুনে-ছিলাম। বন্দীদের থেকে খবর জোগাড়ের এটি ছিল ক্যাম্পের একটি সহজতর প্রক্রিয়া।

মঞ্চ থেকে পুরোহিত সোনার পাত্র দিয়ে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করলেন। চুপচাপ বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল সুগন্ধি শান্তিবারি এবং আলোকের চৌবাচ্চায় ভাসছি। শেষে যীশুর প্রশস্তি গীত হল: "এই রাতে আমাকে ঘিরে থাকো, আমাকে পথ দেখাও।" বাল্যকালেও এই গান গেয়েছি. তখন আঁধারে ভয় হত, এখন ভয় হয় আলোতে।

ভক্তরা উপাসনা গৃহ ছেড়ে চলল। আমার আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। একটি মোটা থামের আড়ালে লুকোলাম।

"হঠাৎ হেলেনকে দেখলাম। প্রথমে চিনতে পারিনি, কারণ ও আসবে ভাবিনি। আমার পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছল। সেখানে অল্প লোক রয়েছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার আর কাঁধ ঘোরানোর ভঙ্গী দেখে চিনলাম। যেন অন্যের স্পর্শ এড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। ও ধীরে ধীরে জনতা থেকে সম্পূর্ণ তফাতে, উপাসনা গৃহের মাঝখানে, মঞ্চের উপরে রাখা বড় বড় মোমবাতিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াল। ওকে অনেক রোগা আর ছোট দেখাচ্ছিল।"

"ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। তখনো অনেক লোক ছিল। হাতছানি দিয়ে ডাকতে সাহস হল না। আশ্বস্ত হলাম যে ও বেঁচে আছে এবং সুস্থও আছে। আমার

মানসিক অবস্থায় ঐ চিন্তা স্বাভাবিক। কেউ আগে মত রয়েছে দেখলেও অবাক লাগে।"

ও দ্রুত সঙ্গীতমঞ্চের দিকে এগোল। ওর পিছু পিছু চললাম। ও আবার ঘুরে প্রবেশদ্বারের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। যেন, সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে পরীক্ষা করে দেখছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে না দেখে উপায় নেই। ও এত কাছ দিয়ে গেল যে প্রায় ওর গায়ের ছোঁয়া লাগল। ওকে অনুসরণ করলাম। ও যখন থামল, আমি ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে। ডাকলাম, "হেলেন!"

চাপা স্বরে বলল, "থেমো না, এগিয়ে চল। আমি তোমার পিছু পিছু যাব। এখানে আমাদের একত্র দেখতে পাওয়া ঠিক নয়।"

"ও কাঁপছিল, যেন অসুস্থ। ও এখানে কেন এল? অনেকেই আমাদের চিনতে পারবে। কিন্তু আমি নিজেই ত' জানতাম না, এত লোক থাকবে।"

ও আমার সামনে চলতে থাকল। আমি চাইছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গীর্জার বাইরে যাব। ও কালো রঙের পোষাক পরেছে। মাথায় ছোট্ট একটি টুপি, একধারে ঈষৎ হেলান, যেন আমার প্রতিটি পদধ্বনি ওতে ধরা পড়বে। ইচ্ছা করেই কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলাম। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কেবলমাত্র একজনের কাছাকাছি হওয়ার দরুন বিপদে পড়তে হয়।

প্রাঙ্গণের পাথরের ফোয়ারাগুলি অতিক্রম করে গীর্জার প্রধান প্রবেশদ্বারের বাইরে পা দিল হেলেন। গীর্জার বাঁ পাশ দিয়ে শান বাঁধানো রাস্তা ধরে চলল। রাস্তার পাশে ফ্ল্যাগস্টোনের সঙ্গে লোহার চেনের সারি। ছোট একটি লাফে চেন পার হল। জায়গাটা একটু বেশী অন্ধকার। মনে হচ্ছিল, আমার জীবন সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। স্পষ্টতঃ দূরে সরে যাচ্ছে, নাগালের বাইরে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। সত্যি না মিথ্যা? আমার বুদ্ধির বাইরে।

হেলেনের দিকে এগিয়ে গেলাম,—ওর কালো পোষাকমোড়া অবয়বের দিকে। ওর ফ্যাকাশে মুখ চোখের দিকে। আমাদের বিচ্ছেদের দিনগুলি তখনো বিদ্যমান। বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা না থাকলেও, ও বিষয়ে পড়েছি বিস্তর।

কাছে যেতে, ও প্রায় রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে এলে?"

"ফ্রান্স থেকে।"

"ওরা আসতে দিল?"

"না। বেআইনীভাবে বর্ডার পার হয়ে এসেছি।"

"কেন?"

"তোমাকে দেখতে।"

"তোমার আসা ঠিক হয়নি।

"জানি। নিজেও একথা ভেবেছি।"

"তবে কেন এলে?"

"সে উত্তর জানলে আসতাম না।"

ওকে চুম্বন করার সাহস পেলাম না। ও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। ছুঁলে, ভেঙ্গে পড়বে। বুঝলাম না, ও কি ভাবছে। ওকে দেখলাম। ও বেঁচে আছে। এইবার ফিরে যেতে পারি। না, শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখব ?

"তুমি জান না ?" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

"কাল জানব। হয়ত পরের সপ্তাহে, কিংবা আরও পরে।"

ওকে ভাল করে দেখলাম। দেখে কতটুকু বা জানব। জ্ঞান হল ঢেউয়ের উপর ভাসমান একরাশি ফেনা। ঝোড়ো হাওয়ায় ফেনার রাশি চুপসে যাবে। ঢেউ তেমনি থাকবে।

ও বলল, "তুমি শেষে এলে ?" ওর মুখের কাঠিনতা কেটে নরম ভাব এসেছে। ওর ডান হাত জড়িয়ে আমার বুকে চেপে ধরলাম। অনেকক্ষণ এভাবে অন্ধকার, জনশূন্য রাস্তায় দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। দূর থেকে যানবাহনের কোলাহল ভেসে আসছিল। প্রায় একশ' গজ দূরে উজ্জ্বল আলোকে সজ্জিত একটি রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা দেখা যাচ্ছিল। অবাক লাগল, ঐটিকে তখনো জেলখানা বানানো হয়নি ! একদল লোক পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন আমাদের দেখে হাসল। কেউ ফিরে তাকাল। হেলেন চাপাকণ্ঠে বলল, "চল, এখানে দাঁড়ান ঠিক নয়।"

"কোথায় যাব ?"

"আমাদের ফ্ল্যাটে।"

মনে হল ভুল শুনলাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ?"

"কোথায় আবার ? আমাদের ফ্ল্যাটে।"

"সিঁড়িতে কেউ দেখলে আমাকে চিনতে পারবে। বাড়িটাতে পুরানো ভাড়াটেরাই আছে ত' ?"

"ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না।"

"তোমার ঝি ?"

"রাতে ছুটি দিয়ে দেব।"

"কাল ভোরে ?"

হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এতদূরে এসেছ কি শুধু এই প্রশ্নগুলি করতে?"

"ধরা পড়ে আবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পচবার জন্য অবশ্যই নয়।"

ও হাসল, "জোসেফ্ তুমি একটুও পাল্টাওনি। তুমি কি করে এলে ?"

এবার আমার হাসার পালা, উত্তর দিলাম, "আমিও জানি না।" মনে পড়ল, আমার বিজ্ঞতায় ও মাঝে মাঝে চটে যেত। কিন্তু রাগলেই বুঝতাম, ছদ্ম রাগ। বললাম, "আমি এসেছি, এইটুকু জানি।"

ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আমার হাতে পড়ল। ও বলল, "এসো, আর দেরী নয়। এ ভাবে আমাদের দেখলে সত্যিই কেউ সন্দেহ করতে পারে। ভাববে, রাস্তার উপরে দু'জন নাটক করছি।"

সাবধানে দু'জন একটা ছোট পার্ক পার হলাম। আমি বললাম, "এখনই তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে যেতে পারব না। তুমি আগে ঝিকে ছুটি দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ মুনস্টারের হোটেলে থাকব। ওখানেই উঠেছি।"

"কতদিন থাকবে?"

"জানি না। আগাম চিন্তা করার অভ্যাস নেই। শুধু জানি, তোমাকে দেখতে এসেছি এবং আমায় ফিরে যেতেই হবে।"

"বর্ডার পেরিয়ে?"

"অবশ্যই।"

হেলেন মাথা নিচু করে চলতে লাগল। ভেবেছিলাম, মিলনের এই মুহূর্তটিই হবে পরম আনন্দের লগ্ন। কিন্তু তখন তা হল না। শুধু মনে হল, আমি সুখী। বললাম "আজ রাতে আমার মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"আমাদের ফ্ল্যাট থেকে ফোনে কথা বললে ত' পার।" হেলেন আমাদের পুরানো ফ্ল্যাটের কথা বলার সাথে সাথে চমকে উঠেছিলাম। ও কি এ রকম হবে জেনেই বলেছিল?

উত্তর দিলাম, "কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে একঘণ্টার মধ্যে দেখা করব। তার মানে, এখন। ও ভাববে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। হয়ত উৎকণ্ঠায় এমন কিছু করে বসবে, যাতে আমি বিপদে পড়ব।"

"উনি জানেন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।"

ঘড়ি দেখলাম। পনের মিনিট আগেই মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। হেলেনকে বললাম, "আমি কাছাকাছি কোন কাফে থেকে ওকে ফোন করব। কয়েক মিনিট সময় লাগবে।"

হেলেন রেগে উত্তর দিল, "হা ভগবান! তুমি এতটুকু বদলাও নি। তোমার পীড়াতি বাই বরং বেড়েছে"

"হয়ত তাই, হেলেন। কিন্তু ঠেকে শিখেছি, ছোট ছোট জিনিষগুলির প্রতি নজর না দিলে, বড় বিপদে পড়তে হয়। ভালই জানি, বিপদকে সামনে নিয়ে অপেক্ষা করার অনুভূতি কী অস্বস্তিকর। পীড়াতি বাই-এর জন্যই আজও টিকে আছি।"

ও আমার ডান হাতটি আরও নিবিড়ভাবে জড়াল। অস্ফুটে বলল, "জানি। তুমি কি বোঝ না, এক মিনিটের জন্যও তোমাকে চোখের আড়াল করতে আমার চিন্তার শেষ থাকে না?"

"পৃথিবীর সব হারানো উত্তাপ আর মমতা ফিরে পেলাম। বললাম, "আমার কিছু হবে না, হেলেন।"

শুকনো মুখ তুলে হেসে, ও বলল, "টেলিফোন করতে পার, কাফে থেকে নয়। টেলিফোন বুথ থেকে করবে। ওতে বিপদ কম।"

আমি কাঁচঘেরা বুথের ভিতর গেলাম। হেলেন বাইরে রইল। মার্টেন্সের নম্বর

ডায়াল করলাম। এনগেজড্। আবার ডায়াল করলাম। আবার এনগেজড্। অধীর হয়ে উঠলাম। বাইরে হেলেন পায়চারি করছে, রাস্তায় চোখ রেখে। অন্য লোক ওর সতর্ক ভাব বুঝতে পারবে না। ও লিপস্টিক লাগিয়েছে। হলদে আলোয় ওর ঠোঁট দুটি কাল লাগছে। মনে পড়ল, নয়া জার্মানীর নেতারা রুজ, লিপস্টিকের উপর খড়্গহস্ত।

তৃতীয় চেষ্টায় মার্টেন্সকে পেলাম। ও বলল, "আমার স্ত্রী আধঘণ্টা ধরে কাউকে ফোন করছিল। ইচ্ছা করেই ওকে ফোনের মাঝখানে থামিয়ে দিই নি। বুঝতে পারলে? ও এখন রান্নাঘরে।"

"এদিকে সব ঠিক আছে। অশেষ ধন্যবাদ, রুডলফ্। ভুলে যাও, তুমি আমাকে দেখেছ।"

"কোথা থেকে ফোন করছ?"

"রাস্তা থেকে। ধন্যবাদ, রুডলফ্। যা খুঁজছিলাম, পেয়েছি। আমরা এখন একত্র।"

"থাকবার জায়গা কিছু ঠিক করেছ?"

"করেছি। ভেবো না। এই সন্ধ্যার কথা ভুলে যাও। মনে করো, স্বপ্ন দেখেছ।"

"আরও কিছু করণীয় থাকলে বলতে দ্বিধা করো না। প্রথমটা খুব অবাক হয়েছিলাম। বুঝতেই পারছ ."

"বুঝেছি, রুডলফ্। প্রয়োজন হলে অবশ্য জানাব।"

"আমার এখানে রাত কাটাতে চাইলে, বলো।"

"দরকার হলে তাও বলব। এখন ফোন ছাড়ছি।"

"ঠিক আছে, জোসেফ্। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।"

"ধন্যবাদ, রুডলফ্।"

বাতাসহীন টেলিফোন বুথের বাইরে এলাম। দমকা হাওয়ায় আমার টুপি উড়ে গেল। হেলেন কাছে এসে বলল, "তোমায় সাবধানের বাই আমাকেও ধরেছে। মনে হচ্ছিল হাজার চোখ মেলে অন্ধকার আমাদের দেখছে। চলো, ফ্ল্যাটে যাই।"

"আগের ঝি-টাকেই রেখেছ?"

"লেনা? না। ও আমার ভাইয়ের গুপ্তচর ছিল। জানতে চাইত, তোমার আমার মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময় হয় কিনা?"

"এখনকার ঝি-টা কেমন?"

"এটা হাবা। আমি কি করি তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। এক সপ্তাহ ছুটি পেলে, বর্তে যাবে। কিছু ভাববে না"

"এখনো ছুটি দাওনি?"

"ও মধুর হেসে জবাব দিল, "তুমি ঠিক আসবে জানতাম না।"

"আমি ওখানে যাওয়ার আগে ঝি-টাকে সরাতে হবে। আর কোথাও যাওয়া যায় না?"

"কোথায় ?"

"কোথায় ?" হেলেন আমার সঙ্গে বলে উঠল, "আমরা যেন দুটি চ্যাংড়া ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি, কোথায় গোপনে খানিকক্ষণ কাটানো যায়। বড় রাস্তায় গেলে, অভিভাবকরা দেখতে পাবে। তাহলে কাসল্ পার্ক ? সেও রাত আটটায় বন্ধ হয়। সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসব ? কিংবা কোন কেক—পেস্ট্রির দোকানে ? না, এর কোনটাই চলবে না।"

হেলেন ঠিক বুদ্ধি দিয়েছিল ? কিন্তু, আমি এই সামান্য খুঁটিনাটিগুলি আগে থেকে ভাবিনি। বললাম, "সত্যিই আমরা দুটি চ্যাংড়া ছেলেমেয়ের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।"

"ওকে ভাল করে দেখলাম। ও সবে উনত্রিশ বছরে পা দিয়েছে। পাঁচ বছরে ওর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। যেন হাঁস জলে স্নান করে উঠেছে। বললাম, "এবার আমার আসাটাই চ্যাংড়ামি হয়েছে। সব যুক্তির বিরুদ্ধে। আগে থেকে কিছু ভাবিনি। তুমি আর কাউকে বিয়ে করেছ কিনা, সে খোঁজটাও নিই নি।"

হেলেন উত্তর দিল না। ওর বাদামী চুল রাস্তার আলোতে চকচক করছিল। ও বলল "আমি আগে গিয়ে ঝি-কে ছুটি দিয়ে দেব। কিন্তু, তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। হয়ত, যেমন এসেছ তেমনি হঠাৎ ফিরে চলে যাবে। ততক্ষণ তুমি কোথায় থাকবে ?"

"যেখানে আমাদের আজ দেখা হল। সেই গীর্জাতে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আমি ফরাসী, সুইস এবং ইতালীয় গীর্জা আর মিউজিয়মের বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি।"

"তুমি আধ ঘণ্টা পরে আসবে। ফ্ল্যাটের জানলাগুলি মনে আছে ?"

"আছে।"

"কোণের জানলা খোলা থাকলে, সিধে উপরে চলে আসবে। বন্ধ থাকলে, অপেক্ষা করবে।"

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। রেড ইণ্ডিয়ান সেজে মার্টেন্সের সঙ্গে খেলতাম। আমাদের সংকেত ছিল, জানলার উপর বাতি। শৈশবের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে নাকি ? বললাম, "ঠিক আছে।" হাটতে শুরু করলাম। হেলেন জিজ্ঞেস করল, "এখন কোথায় যাচ্ছ ?"

"দেখি, সেণ্ট মেরীর গীর্জা খোলা আছে কিনা। যতদূর মনে পড়ে, গীর্জাটি গথিক শিল্পশৈলীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আজকাল এগুলি তারিফ করতে শিখেছি।"

"পাগলামি রাখো। তোমাকে ছেড়ে যেতে চিন্তা হচ্ছে।"

"হেলেন, আমি সাবধানে থাকতে ভালই শিখেছি।"

ও মাথা নাড়ল। মুখের উপর থেকে সাহসের প্রলেপটি উবে গেল। ও বলল, "কিছুই শেখোনি। সত্যি, ভেবে পাচ্ছি না, তুমি আর না এলে কী করব ?"

"কিছু করবার নেই। তোমার ফোন নম্বর পাল্টায়নি ত' ?"

"না। পাল্টায়নি।"

ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "সব ঠিক হয়ে যাবে, হেলেন।"

ও মাথা নাড়ল, বলল, "আমি তোমাকে সেন্ট মেরীর গীর্জা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব।"

"আমরা চুপ করে হেঁটে চললাম। গীর্জাটি বেশী দূরে নয়। হেলেন আর কোন কথা না বলে ফিরে গেল। দেখলাম, ও ধীরে ধীরে পুরানো বাজার পার হয়ে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল। দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। একবারও ফিরে তাকাল না।

অন্ধকার গীর্জাপ্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম। ডান দিকে পৌরসভা সৌধের অবয়বে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৬৪৮ সালে এই বাড়িটির সামনে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। ১৯৩৩ সালে এই সভাকক্ষে ঘোষিত হয়েছিল সহস্র বর্ষব্যাপী নাজি রাজের প্রারম্ভ। ভাবলাম, সেই রাজের শেষও কি দেখব না? না, সে নিতান্ত দুরাশা।

উপাসনাগৃহের ভিতরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। লুকোবার প্রবৃত্তিও আর ছিল না। তখনো যথাসম্ভব সাবধান ছিলাম। কিন্তু হেলেনের সাথে দেখা হওয়ার পর তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ক্রিয়াকলাপে অরুচি এসেছিল।

অপর পক্ষে এক জায়গায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। গীর্জার বাইরে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। যে শহরকে একটু আগে ভেবেছিলাম বিপজ্জনক, চেনা হয়েও অচেনা, সেই শহর আমার কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। বুঝলাম, জীবনের স্বাভাবিক ধারা ফিরে পেয়েছি, তাই পারিপার্শ্বিকও সুন্দর হয়েছে। পাঁচ বছরের অজ্ঞাতবাস, যাকে আগে এক বিরাট শূন্য এবং কেবল নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ ধারনের সংগ্রাম ভেবেছি, মনে হল নিষ্ফল হয়নি। সংগ্রাম আমাকে ধীরে ধীরে গড়েছে। তাই রাতে ফোটা ফুলের মত আজ জীবনের সার্থকতা পরিস্ফুট হয়েছে। এতে রোমাঞ্চ না থাক, নব অনুভূতির তৃপ্তি আছে। যেন যাদুবলে, বাগানের অনাদৃত ফুলগাছ কল্পনাতীত সুন্দর এক কমল মেলে ধরেছে।

নদীর ধারে এলাম। পুলের উপর উঠলাম। বাঁয়ে একটি মধ্যযুগের মিনার। এতে হালে একটি লণ্ড্রি হয়েছে। উজ্জ্বল আলোকিত জানলা দিয়ে দেখছিলাম, ধোবার মেয়েরা তখনো কাজ করছে। নদীর জলে সেই আলোর তরঙ্গ নাচছে। ডাইনে, গীর্জাপ্রাঙ্গণের লম্বা গাছগুলি সঙ্গীন লাগানো বন্দুক হাতে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে শান্তি কেটে গেল। জলের ছলছলানি আর লণ্ড্রির মেয়েদের চাপা কণ্ঠস্বর ছাড়া কোন শব্দ কানে আসছিল না। ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু ক'টি মানুষের কণ্ঠস্বর, যা কথার রূপ নেয়নি। মানুষের উপস্থিতির ক'টি চিহ্ন মাত্র। কথার রূপ নেওয়ামাত্র দেখা দেবে প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, মূঢ়তা এবং দুঃসহ একাকীত্বের অভিব্যক্তি—যা ভাবঘন সঙ্গীতকে চুরমার করে দেবে।

নিঃশ্বাসে জলের নৃত্যছন্দ লেগেছিল। এক অন্তহীন মুহূর্তে আমি আর পুলটি মিলে একাকার হয়ে গেছি, নিঃশ্বাসে নদীর জলতরঙ্গ। এ এক স্বাভাবিক আত্মীয়বন্ধন। হয়ত আমার চেতনাও এই নব আত্মীয়বন্ধনে ধরা পড়েছিল।

বাঁয়ে উঁচু গাছের সারিগুলি ধরে একটা চাপা আলোর রেখা সরে সরে যাচ্ছিল। ভাল করে দেখলাম। মেয়েদের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। বুঝলাম, কিছুক্ষণ ওদের কণ্ঠস্বর শুনিনি। জলের উপর দিয়ে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

চলমান আলোক রেখা অদৃশ্য হল। প্রায় সাথে সাথে পিছনের জানলাটিও আঁধার হল। হঠাৎ মনে হল, জলের রঙ পিচের মত কালো। এইবার চাঁদের আলো জলের উপর নকশা খুলে বসল। নিজের জীবনের উপমা মনে এল। সেখানেও বেশ কয়েক বছর আগে একটি আলো নিভেছে। এই চাঁদনির মত নরম আলোর মালা কি কখনো জ্বলবে না ? এ যাবৎ শুধু লোকসানের খতিয়ান করেছি। লাভের হিসাব জুড়বার সাহস পাইনি।

* * * *

পুল থেকে নেমে এলাম। আধঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। রাত যত বাড়ছে লিনডেন গাছের গন্ধ তত ভারী হচ্ছে। রুপার পাত দিয়ে গীর্জার চূড়াটি মুড়ে দিয়েছে চাঁদ। যেন শহরটি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে বোঝাবে, আমি অলীক ত্রাসের বেড়াজাল ঘিরে নিজেকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। খুসি হলেই এখন ঘরে ফিরতে পারি। যেমন মর্জি বেড়াতে পারি। আপনাকে ফিরে পেতে পারি।

এই নব অনুভূতির বিরুদ্ধে পাহারা মোতায়েন করার প্রয়োজন ছিল না। আমার দ্বিতীয় সত্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে কাজে লেগেছিল। অনুরূপ অনুভূতিতে—সৌন্দর্য্য, মিথ্যা প্রেম এবং অলীক নিরাপত্তার প্রলোভনে—একাধিকবার প্যারী, রোম এবং অন্যান্য শহরে গ্রেফতার হয়েছি। পুলিশ কখনো ভোলে না। চাঁদনি রাত আর লিনডেনের গন্ধে গুপ্তচর সাধু বনে না।

সাবধানে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বাদুড়ের ডানার মত সজাগ করে হিটলার পেলসের দিকে এগোলাম। বাড়িটি চৌরাস্তার মোড়ে।

জানলাটি খোলা ছিল। হীরো লিণ্ডারের কাহিনী এবং রাজকুমার-রাজকুমারীর রূপকথা মনে পড়ল। ওতে আছে, সন্ন্যাসিনী বাতি নিভিয়ে দেবেন, আর রাজকুমার জলে ডুবে মারা যাবে। ভাগ্যক্রমে আমি রাজকুমার নই। জার্মানরা যেমন ঝুড়ি ঝুড়ি রূপকথা রচনা করতে পারে, তেমনি পারে জঘন্যতম কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানাতে। শান্তভাবে রাস্তা পার হলাম।

প্রধান প্রবেশদ্বারে পা দিতে দেখলাম, অপরদিক থেকে একজন মানুষ আসছে। খুব দেরী হয়ে গেছে ; ফিরবার উপায় নেই। চিন্তা না করে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। এতক্ষণে এক অচেনা, বয়স্কা মহিলার মুখোমুখি হলাম। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এসেছিল। তবু সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললাম। কোন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই দেখলাম, হেলেন দাঁড়িয়ে। ও জিজ্ঞেস করল, "কেউ তোমাকে দেখেছে ?"

"এক বয়স্কা মহিলা।"

"তার মাথায় টুপি ছিল ?"

"না ।"

"তবে আমার ঝি । ঘরে নিজের সাজগোজ ঠিক করছিল । ওর ধারণা, দুনিয়ার লোকের একমাত্র কাজ ওর জামাকাপড়ের খুঁত ধরা ।"

"ওর জন্য ভাবতে হবে না । ও যেই হোক, আমাকে চিনতে পারেনি । চিনলে, সহজেই বুঝতাম ।"

হেলেন আমার টুপি আর বর্ষাতি নিয়ে সামনে হ্যাট র‍্যাকে রাখতে যাচ্ছিল । বললাম "ওগুলি এখানে রেখো না । কেউ দেখলে বিপদ হবে ।"

"কেউ আসবে না ।" ও আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে চলল । ওর পিছু নেওয়ার আগে দেখে নিলাম, দরজায় ঠিকমত চাবি দেওয়া আছে কিনা ।

অজ্ঞাতবাসের গোড়ার দিকে বাড়ির কথা খুব ভাবতাম । ক্রমে ভুলতে শুরু করেছিলাম । দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি । কোচ আর চেয়ারগুলি শুধু মেরামত করা হয়েছে । জিজ্ঞেস করলাম, "কোচের চামড়ার রঙ আগে সবুজ ছিল না ?"

"নীল ছিল ।"

শোয়ার্থস্ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "প্রত্যেক জিনিষের স্বতন্ত্র জীবন আছে । তার সাথে আমাদের জীবনের তুলনা করলে অবাক হতে হয় ।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তুলনা করবেন কেন ?"

"আপনি করেন না ?"

"করি । অন্যভাবে । নিজের সঙ্গেই তুলনা করি । নদীর ধারে খিদে পেলে এক কাল্পনিক আমির সঙ্গে তুলনা করি, যার শুধু খিদে পায়নি, ক্যান্সারও হয়েছে । এই ভেবে স্বস্তি পাই যে, আমার অন্ততঃ ক্যান্সার হয়নি ।"

"ক্যান্সারের কথা বললেন কেন ?"

"সিফিলিস, টিবির কথা বলতে পারতাম । কিন্তু ক্যান্সারই স্বাভাবিক মনে হল ।"

"স্বাভাবিক কেন ? ক্যান্সার আদৌ স্বাভাবিক নয় । আমি ভাবতেও পারি না," শোয়ার্থস উত্তেজিত হয়ে বললেন ।

ওঁকে ঠান্ডা করার জন্য বললাম, "ঠিক আছে । একটা উদাহরণ স্বরূপ ক্যান্সারের কথা বললাম ।"

"আমি ক্যান্সারের কথা ভাবতেও পারি না ।"

"মিঃ শোয়ার্থস, সে কথা ত' যে-কোন মারাত্মক অসুখ সম্পর্কেই বলা চলে ।"

উনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। খানিক পরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার খিদে আছে ?"

"না । কেন ?"

"একটু আগে ক্ষুধা সম্পর্কে বললেন কিনা, তাই মনে হল, হয়ত এখনো খিদে আছে ।"

আপনার সাথে যতক্ষণ আছি তার মধ্যে দুবার খেয়েছি। পেটে আর জায়গা নেই।"

অল্প নীরবতার পর শোয়ার্থস্ শান্তভাবে বললেন, "চেয়ারগুলি ছিল হলুদ রঙের। সামান্য মেরামত করা হয়েছে। পাঁচ বছরে বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে ঐটুকু, আর আমার জুটেছে ভাগ্যের পরিহাস। কী আপাতবিরোধী!"

আমি বললাম, "সত্যিই। যেমন মানুষ মারা গেলে তার খাটটি তেমনি থাকে। তার বাড়িটিও। মানুষের সাথে যদি তার আনুষঙ্গিকগুলিও শেষ করে দেওয়া যেত!"

"যে মানুষটি গেল কে আর তার কথা ভাবে?"

"সত্যিই মানুষের কোন দাম নেই।"

"নেই?" উনি বেদনাভরা চোখে তাকালেন। বললেন, "নেই-ই বটে! তবু, বলুন, মানুষের দাম না থাকলে, কিসের আছে?"

"কিছুরই নেই।" জেনে শুনেই উত্তর দিলাম। কারণ, আমার জবাব সত্যিও, মিথ্যাও। "আমরাই কখনো কোন জিনিষের দাম দিই, কখনো দিই না।"

এক ঢোক কালো মদে চুমুক দিয়ে শোয়ার্থস্ বললেন, "বলতে পারেন, কেন আমরা সব কিছুর দাম দিই না?"

"বলতে পারব না। থাকগে, এতক্ষণ এ সম্পর্কে যা বলেছি, হালকা মনের প্রলাপ মনে করুন। বাস্তবিক আমি জীবনকে অত্যন্ত সিরিয়াস ভাবে দেখি।"

হাতঘড়িতে দেখলাম, রাত দুটো বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। ব্যাণ্ড-এ নাচের বাজনা বাজছে। ভেঁপুর আওয়াজকে জাহাজ ছাড়ার সাইরেন বলে ভুল হচ্ছিল। ভোর হতে অল্প বাকি। তার পরই আমি এখন থেকে মুক্ত। হাত দিয়ে দেখলাম টিকিট দুটি পকেটে রয়েছে। সন্দেহ ছিল, ওরা নেই। অনভ্যস্ত বাজনা, মদ, ভারী পর্দা দেওয়া ঘর এবং শোয়ার্থসের কণ্ঠস্বর মিলে এক নিদ্রালু অবাস্তবতার ঘোর সৃষ্টি করেছিল। শোয়ার্থস্ বলে চললেন, তখনো বসবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ভাব দেখে হেলেন জিজ্ঞেস করল, "তোমার নিজের ঘর নতুন লাগছে নাকি?"

আমি মাথা নেড়ে কয়েক পা এগোলাম। এক অদ্ভুত লজ্জা ঘিরে ধরল। মনে হল, ঘরের জিনিষগুলি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমি আর ওদের আপনার নই। হয়ত হেলেনেরও আপনার নই। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম, "সব এক রকম আছে হেলেন। কিছুই পাল্টায়নি।"

"কিছু পাল্টালে তুমি কি আসতে?"

"তা নয়। বলছিলাম, আমরা কি এই ফ্ল্যাটেই থাকতাম না? কিন্তু সেই বছরগুলি কোথায় গেল?"

"তারা কোথায়? যে পুরানো জামাকাপড়গুলি ফেলে দিয়েছি, তাদের সাথে চলে গেল? তুমি কী ভাবছ?"

"আমার কথা ভাবছি না। ভাবছি, তোমার কথা। যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলাম তখনো তুমি এখানেই ছিলে। তোমারও কি কোন পরিবর্তন হয়নি, হেলেন?"

"ও অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলল, আগে এসব ভেবে নাওনি কেন ?"

"আগে ? এর থেকে আগে কি আসতে পেরেছি ?"

"তা বলিনি। বলছি, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে কেন ভাবনি ?"

"কথার খেই হারিয়ে ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কী আলোচনা করছিলাম, হেলেন ?"

হেলেন তখনই উত্তর দিল না। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে যখন গেলে, আমাকেও সঙ্গে যেতে বলনি কেন ?"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আমার সঙ্গে যেতে বলিনি কেন ? তোমার বাড়ি, তোমার বাপের বাড়ি, তুমি যা কিছু ভালবাস—এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে বলব !"

"আমি বাপের বাড়িকে ঘে া করি।"

আবার বিস্মিত হয়ে বললাম, "অজ্ঞাতবাসের কষ্ট কী নিদারুণ তুমি জান না।"

"তুমিও তখন জানতে না।"

সেটা সত্যি। ধীরে বললাম, "আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইনি।"

"এখানকার কিছুই আমার ভাল লাগে না। যাকগে, তুমি ফিরে এলে কেন ?"

"আগে কিন্তু তোমার এখানকার সবই ভাল লাগত," আমি বললাম।

হেলেন আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি ফিরে এলে কেন ?" ও ঘরের দূরতম কোণে দাঁড়িয়ে। আমাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে হলুদ রঙের চেয়ারগুলি এবং আমার পাঁচ বছরের অজ্ঞাতবাস। মনে হল তিক্ততা এবং বিরুদ্ধতার ঢেউ আমাকে ঘিরে ধরেছে। যখন ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম, আমার আচরণ ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিপদে এবং অনিশ্চয়তায় হেলেনকে সঙ্গী করার কথা ভাবিনি। ফলে, ওর মন ভেঙ্গে দিয়েছি। ও আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি ফিরে এলে কেন ?"

বলতে চেয়েছিলাম, "তোমার জন্যই ফিরে এলাম।" কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ, বলা সহজ নয়। আগে যা দেখতে পাইনি, তখন দেখতে পেলাম : নিষ্ঠুর হতাশা আমাকে পিছনে আটকে রেখেছে। আমার শক্তির ভান্ডার নিঃশেষ। আত্মরক্ষার নগ্ন প্রবৃত্তির এমন শক্তি নেই যে একাকীত্বের হিমস্পর্শ সইতে পারে। আমি নতুন জীবন গড়তে অক্ষম। সে ইচ্ছাও হয়নি কারণ, পুরানো জীবনকে পিছনে ফেলে আসতে পারিনি। তাকে ভুলতেও পারিনি, জয়ও করতে পারিনি। ফলে, তাতে পচন ধরল। তখনই কর্ত্তব্য স্থির করার পালা। ভাবতে বসলাম, পচতে থাকব, না ফিরে এসে নতুন জীবন সুরু করব ?

"কখনো কিছু শেষ পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবতে শিখিনি। তাই ভাবনার সঠিক উত্তর পাইনি। কিন্তু যা পেয়েছি তাতেই আমার উপর থেকে একটি বিরাট বোঝা নেমে গেছে। লজ্জা এবং পীড়া দূর হয়েছে। এখন জানি, আমি কেন ফিরে এসেছি। পাঁচ বছর নির্ব্বাসন ভোগের পর কোন উপহার আনতে পারিনি। শুধু এনেছি, ইন্দ্রিয়-

গ্নলির অধিকতর সজাগতা, প্রাণধারণের অকুলতা, সাবধানতা এবং এক তাড়াখাওয়া জেল পালানো আসামীর অভিজ্ঞতা। প্রায় সব বিচারেই আমি দেউলিয়া। বিভিন্ন বর্ডারের নো-ম্যান্স্-ল্যান্ড-এ অগণিত রাত্রিবাস, একমুঠো খাবার আর একটু ঘুমের বিলাসের জন্য পাঁচ বছরের নিরবচ্ছিন্ন একঘেঁয়ে সংগ্রাম এবং একটি ইঁদুরের মত নিরাপদ গর্তের সন্ধান—আমার ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে এ সবই অর্থহীন মনে হল। দেউলিয়া বটে, আমার অন্ততঃ কোন দেনা নেই। এই ঘরে ফেরার মধ্যে দেনার দায় নেই। বর্ডার পার হওয়ার সাথে সাথে সেই পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাস জীবনের অপমৃত্যু ঘটেছে। আর একটি মানুষ তার স্থান নিয়েছে, যে সব দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত। হয়ত আপাতবিরোধি কথা বলছি। আপনি বুঝতে পারছেন?”

উত্তর দিলাম, “মনে হয় বুঝতে পেরেছি। কোন বিশেষ সময়ে আত্মহত্যা সত্যিই আশীর্ব্বাদ। যদিও অল্প লোকই সে কথা বুঝবে। ওতে জোয়ালবিহিন ইচ্ছার অভিব্যক্তি হয়,—এই ধরনের একটা ভাব মনে আসে। হয়ত বোঝার থেকে অনেক বেশি না বুঝে আত্মহত্যা করি। শুধু আমরা জানি না।”

শোয়ার্থস্ আমার কথা লুফে নিলেন, “ঠিক বলেছেন। আত্মহত্যা করার সময় জানতে পারলে হয়ত মৃত্যুর পরে বেঁচে উঠতে পারতাম। দূষিত ক্ষতের অভিজ্ঞতা, এক সংকট থেকে আর এক সংকটের মুখে দাঁড়ানো, আর অবশেষে সংকটেই বিলুপ্ত,—নিদেনপক্ষে এই চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। নবজীবন লাভ করতাম।”

“হেলেনকে এ সব বোঝানোর ক্ষমতা ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। হঠাৎ এত হাল্কা বোধ করছিলাম যে এসব কথা নিষ্প্রয়োজন মনে হল। বেশী বোঝাতে গেলে, যদি উল্টো বোঝে? ও হয়ত চায় আমি বলি, ওর জন্যই ফিরে এসেছি। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, ওকথা বললে আমার পতন অবশ্যম্ভাবী। অতীত তার সব রোষ, দোষের বোঝা, হারানো সুযোগের তালিকা এবং অনাদৃত প্রেমের ধিক্কার নিয়ে আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়বে। তখন মুক্তির রাস্তা হারিয়ে ফেলব। আমার আনন্দময় আত্মিক হননের যদি কোন অর্থ থাকে, তাকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। শুধু অজ্ঞাতবাসের বছরগুলি জুড়ে তার পরিধি হবে না, তার আগের দিনগুলিও থাকবে। নচেৎ দ্বিতীয়, বৃহত্তর পচনের শিকার হব। হেলেন তখনো ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়েঃ একটি শত্রু, আমাকে প্রেম দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত। ও দুর্বল স্থানগুলি চেনে। আর রক্ষা নেই। যে আত্মহননে মুক্তির আশ্বাস ছিল, সে বেদনামগ্ন নৈতিক পীড়নের রূপ নেবে। সে পীড়নের প্রান্তে মৃত্যু নেই। পুনর্জ্জীবনের কথা তাই বাতুলতা। তার পরিসমাপ্তি আমার ধ্বংসে। স্ত্রীলোককে বেশী বোঝান একান্ত বোকামি। ওদের সম্পর্কে কথার থেকে কাজই ভাল।

হেলেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওর কাঁধে হাত রাখলাম। ও কাঁপছিল। ও আবার প্রশ্ন করল, “তুমি ফিরে এলে কেন?”

“বলতে ভুল করেছি, হেলেন, সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। খুব খিদে পেয়েছে।”

ওর পাশে একটি ছোট টেবিলে রূপোলী ফ্রেমে বাঁধানো এক অচেনা ভদ্রলোকের ছবি দেখলাম। বললাম, "ওটা রাখার দরকার আছে ?"

ও অবাক হয়ে বলল, "না।" টেবিলের দেরাজে ছবিটি রেখে দিল।

একটু হেসে শোয়ার্থস্ আবার বললেন, "হেলেন ফটোটি ফেলে দিল না। ছিঁড়েও ফেলল না। শুধু দেরাজে রেখে দিল। পরে ইচ্ছামত দেখতে পারবে। কেন জানি না, ওর এই হিসেবী ব্যবহার তখন ভাল লাগল। পাঁচ বছর আগে লাগত না। চেঁচামেচি করে নাটকীয় কাণ্ড করতাম। বুঝতে পারলাম, ছবিটির কৃপায় একটি বিস্ফোরণোন্মুখ ঘটনাচক্র থেকে মুক্তি পেয়েছি। কথার ধূম্রজাল রাজনীতিতে সহজে হজম করা যায়, প্রেমে অসম্ভব। উল্টো হলেও অবশ্য খুশি হতাম। হেলেনের বিবেকসম্পন্ন ব্যবহার আদৌ প্রেম-বিরহিত নয়। বরং নারীসুলভ বিবেচনায় সিঞ্চিত প্রেম। একবার হতাশ করেছি, ও সহজে বিশ্বাস করবে কেন ? ফ্রান্সে থাকাকালীন সাধুর মত থাকিনি। কোন প্রশ্ন করলাম না। কি প্রশ্ন করতাম ? কোন অধিকারে ? শুধু হাসলাম। ও ঘাবড়িয়ে গেল। হেলেনও আমার মত হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমাকে ডির্ভোস করেছ ?"

"ও মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, "না, করিনি।" করতে রাজী হইনি। কিন্তু তোমার কথা ভেবে নয়। বাপের বাড়িকে অগ্রাহ্য করতে।"

পঞ্চম

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "সে রাতে বেশি ঘুমাতে পারিনি। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম। তবু জেগে রইলাম। ক্রমে রাত গভীর হল। ছোটখাটো শব্দ কানে আসে। একটু ঘুমিয়ে পড়ে। তন্দ্রায় দেখি, পুলিশ তাড়া করেছে। আমি দৌড়াচ্ছি। ত্রাসে ঘুম ভেঙে যায়।

হেলেন একবার জেগেছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "ঘুম আসছে না ?"

"না। ঘুম হবে আসা করিনি।" ও ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিল। বললাম, "ঘুমের আশা করে লাভ নেই। ঘরে মদ আছে ?"

"আছে। বাপের বাড়ির লোকরা আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেয়। কিন্তু তুমি কবে থেকে মদ ধরলে ?"

"যখন থেকে ফ্রান্সে ডেরা বেঁধেছি।"

"বেশ। মদ সম্পর্কে নতুন কিছু শিখেছ ?"

"বেশী না। শুধু জেনেছি, লাল রঙের মদগুলি সস্তা এবং ভাল।"

হেলেন রান্নাঘর থেকে দুটি বোতল এবং কর্কস্ক্রু নিয়ে এল। ও বলল "মহামান্য,

হিটলার মদ তৈরীর পদ্ধতি পাল্টিয়ে দিয়েছেন। আগে মদে চিনি মেশানো ছিল আইন-বিরুদ্ধ। এখন মদ প্রস্তুতকারকরা যেমন খুশি মদ তৈরী করতে পারে। চিনিও মেশাতে পারে।" ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, ওর কথার অর্থ বুঝিনি। একটু হেসে, ব্যাখ্যা করে বলল, "দুঃসময়ে টক মদকে মিষ্টি করার জন্য এই ব্যবস্থা। রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে প্রভু জার্মান জাতের নাজি নায়করা অভিনব জোচ্চুরি ধরেছেন।"

ও কর্কস্ক্রু এবং বোতল দুটি এগিয়ে দিল। মোসেল মদের বোতলটি খুললাম। হেলেন দুটি পাতলা কাঁচের গ্লাস আনল। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার গায়ের রঙ এমন বাদামী কি করে হল?"

"পুরো মার্চ মাস পাহাড়ে স্কি খেলে কাটিয়েছি। সেইজন্য।"

"উলঙ্গ হয়ে স্কি খেলেছিলে?"

"না। কিন্তু সূর্য্যস্নানের সময় কি কেউ পোষাক পরে?"

"কবে থেকে স্কি খেলতে শিখলে হেলেন?"

ও উদ্ধতভাবে উত্তর দিল, "একজন শিখিয়েছে।"

"বেশ, বেশ। তোমার তাতে উপকার হয়েছে দেখছি।"

একটি গ্লাসে মদ ঢেলে ওকে দিলাম। ফরাসী মদের থেকে মিষ্টি গন্ধ। জার্মানী ছেড়ে যাবার সময় দেশে এমন জিনিস তৈরী হত না। হেলেন জিজ্ঞেস করল, "জানতে চাও, কে স্কি খেলতে শিখিয়েছে?"

"না।"

"ও অবাক হয়ে ষ্ট... ল। এমন অবস্থায় আগেকার দিনে হয়ত ওকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জর করে ফেলতাম। কিন্তু এখন আমার জানবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রথম সন্ধ্যার হাল্কা অবাস্তবতা ...ার ঘিরে ধরেছিল। ও বলল, তুমি পাল্টে গেছ।"

প্রতিবাদ করলাম, "তুমি অন্ততঃ দুবার বিপরীত কথা বলেছ। যাকগে, ওতে কিছু আসে যায় না।"

গ্লাস ওর হাতেই ধরা ছিল, কিন্তু চুমুক দিচ্ছিল না। ও বলল, "না পাল্টালেই আমি খুশি।"

"বললাম, "আমি সহজে ধ্বংস হওয়ার জন্য মদ খেতাম।"

"আমি তোমাকে আগে ধ্বংস করেছি?"

"ঠিক বলতে পারব না। অনেক দিন হয়ে গেছে। অবশ্য সে সময় তোমার ও চেষ্টা না করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না।"

"সবাই চেষ্টা করে। তুমি জানতে না?"

"না। যা হোক, তুমি সাবধান করলে। মদটিও উৎকৃষ্ট। আশা করি বিধিসম্মত ভাবেই তৈরী। অর্থাৎ, তৈরীর সময় কেউ অযথা নির্দ্দেশ দিয়ে পণ্ড করেনি।"

"তোমার মত?"

"হেলেন, তুমি উত্তেজনায় ভরা। রঙ্গরসেও টইটুম্বুর। বিপরীতধর্মী গুণের এমন মধুর সংমিশ্রণ বিরল।"

"এখনই এত নিশ্চিন্ত ভাবে বলো না।" হেলেনের কথায় ঝাঁঝ। ও বিছানায় বসে পড়ল। গ্লাস তেমনি হাতে ধরা।

হেসে উত্তর দিলাম, "আমি অল্প কিছুর সম্পর্কেই নিশ্চিত করে বলতে পারি। কিন্তু অনিশ্চয়তার গুণ আছে। যদি চরম বিপদের মুখে ঠেলে না দেয়, অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে অপরিবর্ত্তনীয় নিশ্চয়তা বা স্থিরতা দেবে। অনেক বড় কথা বললাম। মনে করো, এসব গড়াতে থাকা একটি শিলার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।"

"গড়াতে থাকা শিলা মানে?"

"আমার মত কোন মানুষ। যে কোথাও স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। রিফিউজি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন। অথবা, নব মানব। প্রচলিত ধারণার অনেক বেশী রিফিউজি পৃথিবীতে বাস করে হেলেন, যদিও তাদের একটা বড় অংশ কখনই ঘর ছেড়ে যায় না।"

"মন্দ শোনাচ্ছে না। বুর্জোয়া জীবনের দৈনন্দিন পচনের থেকে ভালই।"

সায় দিয়ে বললাম, "অন্য ভাবেও বলা যায়। হয়ত খুব চিত্তাকর্ষক হবে না। কপাল-গুণে আমাদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। নচেৎ, এত লোক স্বেচ্ছায় যুদ্ধে নাম লেখাত না।"

ও এক চুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করে বলল, "তিলে তিলে পচন ছাড়া সব কিছুই ভাল।"

ওকে ভাল করে দেখলাম। কত অল্প বয়স। অভিজ্ঞতাও কত কম। তাই অত উদ্ধত। হয়ত বুদ্ধিও একটু কম। তবু, সব মিলিয়ে ভালবাসা কেড়ে নিতে জানে। ও কিছুই জানে না। এও জানে না যে, বুর্জোয়ার শারীরিক অপেক্ষা নৈতিক পচনই বেশী হয়। ও জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ঐ জীবনে ফিরতে চাও?"

উত্তর দিলাম, "পারব মনে হয় না। মাতৃভূমি আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বনাগরিক করেছে। এখন প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব।"

"একটি বিশেষ মানুষের কাছেও নয়।"

"না। কারণ, পৃথিবী গড়াচ্ছে। সূর্য্যের কাছে পৃথিবী রিফিউজি। কি করে ফিরব? চেষ্টা করে লাভ নেই। দুঃখ বাড়বে।"

হেলেন গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বলল, "কখনও ফিরতে চাওনি?"

উত্তর দিলাম, "সর্ব্বদাই চেয়েছি। তুমি জান, আমি কোন মতবাদ আঁকড়ে ধরি না। মতবাদ আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।"

হেলেন হেসে বলল, "এবার শুধুই কথার জাল বুনলে।"

"হতে পারে। কিন্তু কিছু গোপন রাখার চেষ্টাও ত' বাতুলতা।"

"অর্থাৎ?"

"এমন কিছু যা কথায় বলা যায় না।"

"যা শুধু রাতে ঘটে।" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

বিনা উত্তরে বিছানায় বসে রইলাম। এতক্ষণ কালের ঘূর্ণাবর্তের গর্জন শুনছিলাম। ক্রমে তা থেমে গেল। আমি তখনো হাওয়ায় ভাসছি। হেলেন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বর্ত্তমান নাম কী?"

"জোসেফ্ শোয়ার্থস্।"

"ও একটু চিন্তা করে বলল, "তাহলে আমি মিসেস শোয়ার্থস্?"

হেসে উত্তর দিলাম, "না, হেলেন, ওটা একটা নাম মাত্র। যে মানুষটির থেকে ঐ নাম পেয়েছি, সে নিজে ওটি পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। সে হিসাবে আমি তৃতীয় পুরুষ। দীর্ঘকাল আগে মৃত জোসেফ্ শোয়ার্থস্ ভবঘুরে ইহুদীর মত আমার মধ্যে বেঁচে আছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও ও আমার আত্মার পূর্ব্বপুরুষ।"

"তুমি তাকে চিনতে না?"

"না।"

"অন্য নাম নিলে কোন সুবিধা হয়?"

"হ্যাঁ। অন্য নামের সাথে একটি পাসপোর্টও থাকে।"

"যদি পাসপোর্টটি ভুয়া হয়?"

না হেসে পারলাম না। প্রশ্নটি আর এক জগতের। পাসপোর্ট খাঁটি কিনা বিচার করবে পাসপোর্ট পরীক্ষক পুলিশ। বললাম, "তুমি একটি দার্শনিক তত্ত্ব লিখলে পার। তত্ত্বের শুরু হবে "নাম কি শুধু একটা ঘটনা না পরিচিতি"—এই প্রশ্ন দিয়ে।"

"হেলেন একগুঁয়েমি বজায় রেখে বলল, "নাম নামই। আমি আমার নামকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমার নামটি আসলে তোমারই। এখন শুনছি, তুমি আর একটি নাম কুড়িয়ে পেয়েছ!"

"উপহার পেয়েছি, হেলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান উপহার, যা পেয়ে আমি আনন্দিত। এ নামে অর্থ ঃ দয়া, মায়া এবং মানবিকতা। যদি আবার কখনো হতাশা পথ রোধ করে, মনে পড়বে দয়ার উৎস শুকিয়ে যায় নি। বাপের বাড়ির নাম তোমাকে কী মনে পড়িয়ে দেয়? আমি বলছি ঃ একটি প্রাশিয়ান যোদ্ধা এবং শিকারী পরিবার যারা মনোবৃত্তিতে শেয়াল অথবা নেকড়ে বাঘ।"

পায়ের বুড়ো আঙুলে একটি স্লিপার নাচাতে নাচাতে হেলেন বলল, "বাপের বাড়ির নামের কথা বলিনি। এখনো আমি তোমার নামই বয়ে বেড়াচ্ছি। অবশ্য পুরানো নাম, মিঃ শোয়ার্থস্।"

দ্বিতীয় মদের বোতলের ছিপি খুলে বললাম, "শুনেছি ইন্দোনেশিয়াতে প্রায়ই নাম পাল্টানোর রীতি আছে। নিজের ব্যক্তি-সত্তাতে বিরক্তি বোধ করলে, নতুন নাম নাও। নতুন জীবন সুরু করো। আইডিয়াটা ভাল।"

"নতুন জীবন শুরু করেছ?"

"হ্যাঁ, আজ করেছি।"

"ওর পিপারটি মাটিতে পড়ে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, নতুন জীবনের সাথে কিছু পুরানো মিশিয়ে ফেলোনি ত' ?"

"মিশিয়েছি, হেলেন। প্রতিধ্বনি।"

"কোন স্মৃতি মেশাওনি ?"

"ঐ ত' প্রতিধ্বনি। যে স্মৃতির লজ্জা বা আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই।"

হেলেন জিজ্ঞেস করল, "বায়োস্কোপ দেখার মত ?"

মনে হচ্ছিল ও মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারবে। ওর হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে কিছু মদ ঢেলে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "এ কোন মদ ?"

"এটি রাইন প্রদেশের বিখ্যাত মদ। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তৈরী। সরকারী নির্দেশ মত এর প্রস্তুত প্রণালীর হেরফের ঘটানো হয়নি। একে মিথ্যা নামে চালানোর চেষ্টা করতে হয় না।"

"রিফিউজি নয় ?"

"ও উত্তর দিল, গিরগিটির মত রঙ বদলায় না। দায়িত্বও এড়ায় না।"

"হা ভগবান! এ যে বুর্জোয়া সম্ভ্রমবোধের মত শোনাচ্ছে। তুমিই না বুর্জোয়ার পচনশীল জীবন থেকে মুক্তি চাইছিলে ?"

হেলেন উত্তর দিল, "তুমি এমন অনেক কথা বলতে বাধ্য কর, যা বলতে চাই না। থাক, রেখে দাও কথার কচকচি। প্রথম রাত কোথায় চুমু খেয়ে কাটাব, না দুজনে ঝগড়া করেই শেষ করলাম।"

"তাই ত' করলাম হেলেন।"

"কথা আর কথা। এত কথা কোথা থেকে পাও ? কথা বলে রাত কাটানো কি ভাল ?"

"বলতে পারব না।"

"সত্যি, কোথায় এত কথা খুঁজে পাও ? যেখানে থাক, সেখানেও কি এত বকবক কর ? ওখানে এত সঙ্গী আছে ?"

"না। সেখানে কথা বলার সুযোগ নেই। তাই আজ ঝুড়ি ওল্টানো আপেলের মত কথার রাশি বেরিয়ে আসছে। আমিও তোমার মত অবাক হচ্ছি, হেলেন।"

"সত্যি ?"

"সত্যি, নির্জ্জলা সত্যি। তুমি এখনো বোঝনি ?"

"আরও সহজ করে বলতে পার না ?"

"আমি মাথা নাড়লাম।"

ও বলল, "কেন পার না ?"

"সিধে উত্তর দিতে ভয় হয়। হয়ত কথার যোগফল দাঁড়াবে একটি বিবৃতি। জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বাস্তবিক তাই, হেলেন। ত্রাসে মরি, অনামা ভীতি রাস্তার কোণে লুকিয়ে আছে। চুপ করে থাকি। তাকিয়ে দেখি না, পাছে করাল মূর্ত্তি দেখতে পাই। তাই আজ এভাবে কথা বলছি। যখন এভাবে কথা বলি, ভাবি, কাল স্তব্ধ

হয়ে আছে। যেন এক ছেঁড়া ফিলম্। তার সাথে সব স্তব্ধ হয়ে আছে। কিছুই ঘটছে না।"

"অতি গভীর তত্ত্ব।"

"আমারও তাই মনে হয়, হেলেন। কিন্তু এই কি সবচেয়ে বড় কথা নয় যে, আমি এখানে ফিরেছি, এখনো ধরা পড়িনি এবং তুমিও বেঁচে আছ?"

"তুমি কি সেইজন্যই এসেছ?"

আমি উত্তর দিলাম না। ও একটি হ্রস্ব আমাজন নদীর মত বসে। নগ্ন। হাতে মদের গ্লাস। চাতুর্যময়ী এবং সাহসিকা। সর্ব্বোপরি, গ্রহণোদ্যত কিন্তু প্রতিগ্রহণ জানে না। বিগত জীবনে ওর কিছুই জানতে পারিনি। তখন ভাবতাম, আমাকে বাদ দিয়ে ওর জীবন চলবে না। যেন একটি বিড়ালছানা পুষেছিলাম। সে আজ বাঘিনী হয়েছে। গলার নীল রিবনের দিকে ফিরেও তাকাবে না। আদর করতে গেলে হাত কামড়ে দেবে।

অতি কঠিন জায়গায় পা দিয়েছি। বুঝতেই পারছেন, প্রথম রাতে নিজের দুর্ব্বল স্থানগুলি মেলে ধরেছিলাম। অকেজো কাজে আমি নিজেই লজ্জিত। ধারণা ছিল, এমন হবে। হলও তাই। সত্যি বলতে কি আমি তখন পৌরুষহীন। কিন্তু আন্দাজ থাকার দরুন এক্ষেত্রে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। তা করলাম না। নারীজাতি এমন বুঝবার ভান করতে পারে এবং মায়ের মত ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে। কিন্তু যে ভাবেই দেখুন, ব্যাপারটা লজ্জাজনক।

স্বাভাবিক জবাবগুলির একটিও দিইনি। হেলেন তাই খুব চটে গিয়েছিল। ও আক্রমণ করল। বুঝতে পারল না, আমি কেন ওর সঙ্গে প্রেম করলাম না। হয়ত সত্যি কথা বললেই ভাল হত। কিন্তু তার জন্য আর একটু ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। এ রকম ব্যাপারে দুটি সত্যি কথা বলা চলে। এক ঃ সব খোলসা করে দেওয়া। দুই ঃ কূটনৈতিক সত্যি, যাতে ঝঞ্ঝাট নেই। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গলা বাড়ালে গুলি খেতে হবে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

হেলেনকে বললাম, "আমার পরিস্থিতিতে মানুষ কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ভাবে, সিধে বললে বা করলে উল্টো ফল হবে। তাই সে সদা সতর্ক। কথাতেও সতর্ক।"

"পুরোপুরি অর্থহীন।"

হেসে বললাম, "বহুদিন হল অর্থ খোঁজা ছেড়েছি। না হলে, বুনো লেবুর মত তেতো হয়ে যেতাম।"

"আশা করি, গভীর কুসংস্কারগ্রস্ত হওনি?"

শান্তভাবে বললাম, "কি রকম কুসংস্কারগ্রস্ত হয়েছি, বলব। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে যদি বলি, তোমাকে সব কিছু থেকে বেশী ভালবাসি, এক মিনিট বাদে শুনব গেস্টাপো দরজা ধাক্কাচ্ছে।"

কয়েক মুহূর্ত হেলেন চুপ করে রইল। যেন বন্য জন্তু অচেনা শব্দ শুনেছে। ধীরে মুখ ফেরাল। মুখের ভাব পাল্টিয়েছে। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, "এ কি সত্যি?"

"সম্পূর্ণ সত্যি। সাক্ষাৎ নরক থেকে একটি বিপজ্জনক স্বর্গে আমার উত্তরণ হয়েছে। এ অবস্থায় কি করে চিন্তা ভাবনার সামঞ্জস্য সম্ভব ?"

একটু পরে হেলেন বলল, "প্রায়ই ভাবতাম, তুমি ফিরে এলে কেমন হয়। বাস্তব দেখছি স্বপ্নের থেকে যোজন তফাত।"

জিজ্ঞেস করলাম না, কিসে তফাত। প্রেমে মানুষ অনেক প্রশ্ন করতে চায়। জবাব খুঁজলেই প্রেম খিড়কি দিয়ে পালায়। বলালাম, "হ্যাঁ। সবাই তফাত, হেলেন।"

ও হেসে বলল, "আসলে তফাত হয় না, জোসেফ্। ও মনের ভুল। মদ আছে ?" ও নর্তকীর ভঙ্গীতে খাটটি পরিক্রমা করল। গ্লাস রেখে, মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। রোদে পুড়ে ওর সর্ব্বাঙ্গে বাদামী রঙ ধরেছে। ওর নগ্ন শয়নে বিলাসের স্পষ্ট রূপ। এ দেহ একান্ত কাম্য। দেহের অধিকারিণীও তা জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কখন যেতে হবে ?"

"কাল সকালে ঝি আসবে না।"

"পরশু ?"

হেলেন মাথা নাড়ল। বলল, "সহজ হিসেব। আজ শনিবার। ওকে আজ ছুটি দিয়েছি। ও সোমবারের আগে আসবে না। ওর ভালবাসার লোক আছে। সে পুলিশে কাজ করে। দুই সন্তানের জনক।" আধবোজা চোখে তাকিয়ে যোগ করল, "ছুটি পেয়ে ও খুব খুশি।"

"দূর থেকে মার্চের আওয়াজ আর গান ভেসে আসছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের আওয়াজ।"

"সেনা অথবা হিটলার-যুবদলের। জার্ম্মানীতে সর্ব্বদাই কেউ না কেউ মার্চ্চ করছে আজকাল।"

"পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, হিটলার-যুবদল মার্চ্চ করে চলেছে। বললাম, "তুমি বাপের বাড়ির আর সকলের মত হলে না কেন, হেলেন ?"

"বোধ হয়, ফরাসী প্রপিতামহীর জন্য। ওরা সবাই ওঁর কথা গোপন রাখে, যেন উনি এক ইহুদী।"

"হেলেন হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গল। ওর শ্রান্তি দূর হয়েছে। যেন আমরা বহু সপ্তাহ একত্র আছি এবং বাইরে ভয়ের লেশমাত্র নেই। এর মধ্যে আয় ভীতির প্রসঙ্গ তুলিনি। হেলেনও অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। বুঝতে পারিনি, ও আমার অন্তস্তল দেখেছে এবং সিদ্ধান্তও করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করল, "আর ঘুমোবে না ?"

তখন রাত একটা। আমি শুয়ে পড়লাম। বললাম, "একটা বাতি জ্বালিয়ে রাখলে কেমন হয় ? আমি ঐ ভাবে ঘুমোতে অভ্যস্ত। জার্ম্মানীর অন্ধকার এখনো ধাতস্থ হয়নি।"

"দরকার হলে সবকটি বাতি জ্বালাও না, প্রিয়তম।"

"আমরা জড়াজড়ি করে শুলাম। একটা বিবর্ণ স্মৃতি মনে ভাসছিল,—রাতের পর রাত আমরা ঐভাবে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি। এখন হেলেন আমার কাছে। একটু তফাত

আছে। এ এক নূতন মিলন। ওর শ্বাস প্রশ্বাস, চুলের মিষ্টি গন্ধ, গায়ের প্রায় সব গন্ধ চিনতে পারলাম। ওরা দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসেছে। পুরো ফেরেনি। তবু ত' আমার মস্তিষ্কের, আমার হৃদয়ের এরা কত আপনার। প্রিয়জনের চামড়ার স্পর্শে কী সুখ। মানুষের মুখের থেকে চামড়া কত বেশী বুঝতে পারে! জেগে রইলাম। হেলেন আমার আলিঙ্গনে বদ্ধ। শুয়ে শুয়ে বাতি দেখছিলাম। ঘর দেখছিলাম,—যে ঘর চিনেও চিনি না। শেষে নিজেকে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিলাম। হেলেন জাগল। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, "ফ্রান্সে তোমার মেয়ে মানুষ ছিল?"

"প্রয়োজনের অধিক ছিল না, হেলেন। তবে কোনটিই তোমার মত নয়।"

"ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। ঘুমে তলিয়ে গেল। ধীরে ঘুম আমাকেও গ্রাস করল। কোন স্বপ্ন দেখলাম না। ভোরের দিকে যখন জাগলাম, সব ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। হাত বাড়িয়ে দিলাম। ও এগিয়ে এল। দুজনে আবার ঘুমে তলিয়ে গেলাম। যেন রুপালী বনাত দেওয়া মেঘে মিলিয়ে গেলাম। অন্ধকার রইল না।"

ষষ্ঠ

পাছে বিল ফাঁকির সন্দেহে হোটেলমালিক পুলিশে খবর দেয়, তাই সকালে মুন-স্টারের হোটেলে ফোনে জানালাম: গত রাতে জরুরী কাজে অস্নোরুকে আটকে গিয়েছিলাম, আজ রাতে ফিরব। অলস কণ্ঠে একজন জানাল, ঘর রাখা হবে। জিজ্ঞেস করলাম, আমার নামে কোন চিঠি আছে? না, চিঠি নেই।

ফোন ছেড়ে দিলাম। হেলেন পাশে ছিল। জিজ্ঞেস করল, "চিঠি? কার চিঠি পাওয়ার আশায় আছ?"

"কেউ না। ও কথা বলেছি, শুধু সন্দেহ কাটাতে। যে চিঠির আশা করবে সে নিশ্চয় হোটেলকে ঠকাতে যাবে না।"

"তুমি ঠকাও?"

"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু ওতে সামান্য একটু মজাও আছে।"

ও হেসে জিজ্ঞেস করল, "আজ রাতে মুনস্টারে ফিরছ?"

"এখানে আর থাকার উপায় নেই, হেলেন। কাল তোমার ঝি আসবে। অস্নোরুকের হোটেলে থাকাও বিপজ্জনক। মুনস্টারের রাস্তাঘাটে কেউ চিনবে না। ওখান থেকে এখানে মাত্র এক ঘণ্টার পথ।"

"কতদিন মুনস্টারে থাকবে?"

"ওখানে গেলে বলতে পারব। সময়কালে মানুষের ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে। বিপদের সম্ভাবনায় সজাগ হয়।"

"এখানে বিপদ হতে পারে?"

"হ্যাঁ। আজ সকাল থেকে মনে হচ্ছে, হেলেন।"

হেলেন ভ্রূ কুঁচকে বলল, "তুমি বাইরে যাবে না।"

"না। সন্ধ্যার আগে যাব না। তাও যদি স্টেশনে যাই।"

হেলেন উত্তর দিল না। আবার বললাম, "ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘণ্টা হিসেব করে বাঁচতে শিখেছি।"

"তাই নাকি? তাই সুবিধা" ওর কণ্ঠে গত সন্ধ্যার বিরক্তির সুর।

"সুবিধা নয়। প্রয়োজন। তবু, প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ প্রায়ই ভুলে যাই। মুনস্টার থেকে একটি ক্ষুর কিনে আনা উচিত ছিল। দাড়ি না কামালে সন্ধ্যা নাগাদ আমাকে ভবঘুরের মত দেখাবে। একজন রিফিউজির ঐ বিষয়ে সাবধান হতেই হবে।"

হেলেন বলল, "বাথরুমে পাঁচ বছর আগে রেখে যাওয়া ক্ষুরটি আছে। আলমারিতে তোমার শার্ট, আন্ডারওয়্যার এবং স্যুটও আছে।"

ও এমনভাবে কথা বলছিল যেন, পাঁচ বছর আগে ওগুলি অপর এক মহিলার কাছে ছেড়ে গিয়েছি। এতদিন বাদে এসেছি, নিজের জিনিষ নিয়ে ফিরে যাব। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। করলে, অবাক হয়ে বলত, অমন কথা ও ভাবেনি। অনর্থক কথা কাটাকাটির মধ্যে পড়তাম।

বাথরুমে গেলাম। পুরানো স্যুটগুলি মনে পড়াল, কত রোগা হয়েছি। স্থির করলাম, বিকালে হোটেলে ফিরবার সময় একটি পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার নিয়ে যাব। পোষাকগুলি কোন ভাবোদয় ঘটাল না। দীর্ঘকাল আগেই নির্ব্বাসনবাসকে ক্রমবিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় স্নায়ুযুদ্ধ ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম।

আবেগ গোধূলির মধ্যে দিয়ে দিনটি কাটল। রওনা হওয়ার সময় এগিয়ে আসার সাথে সাথে দুজনে দমে গেলাম। ওতে আমি হেলেনের থেকে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতা আমাকে প্রস্তুত করেছিল। অপরপক্ষে আমার যাওয়ার উদ্যোগ ওর ব্যক্তিগত অপমান মনে হচ্ছিল। প্রত্যাবর্ত্তনজনিত চমকের ঘোর না কাটতে এবং ওর ব্যথিত অভিমানে প্রলেপ না পড়তেই ওকে ছেড়ে যেতে হবে। দুজনের উপর রাতের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। একটি জোয়ার চলে গিয়েছে, নদীবক্ষে অকিঞ্চিৎকর খড়কুটোর পাহাড় সাজিয়ে। উভয়ে সতর্ক ছিলাম, যেন দুর্বল স্থানে আঘাত না লাগে। কারণ, আমরা পরস্পরের পুরানো অভ্যাসগুলি ভুলে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা একলা থাকতে পারলে কিছুটা ধাতস্থ হতে পারতাম। কিন্তু এক ঘণ্টার অর্থ একত্র বাসের মোট সময়ের বারো ভাগের এক ভাগ। অতএব সে চেষ্টা করলাম না। শান্তির দিনগুলিতে ভাবতাম, আয়ু মাত্র একমাস হলে কী করব। কিছু স্থির করতে পারতাম না। অথবা এমন কিছু স্থির করতাম, যা কাজে লাগানো অসম্ভব। এখনো তাই করলাম। দিনটিকে সানন্দে আলিঙ্গন না করে, হেলেনকে দেহের সব তন্তু দিয়ে অনুভব না করে, শুধু ভেসে বেড়ালাম। যেন আমার দেহটি

কাচের। ওরও একই সমস্যা। ফলে দুজনে ভুগছিলাম। উভয়ের মন উঁচু পর্দায় বেঁধেছিলাম। দিনের আলো যত কমতে থাকল, পরস্পরকে হারানোর বেদনা ততই তীব্র হল। আবার আমাদের চেনাচিনি হল।

সন্ধ্যা সাতটায় কলিং বেল বাজল। চমকে উঠলাম। কলিং বেল বাজার অর্থ পুলিশের আবির্ভাব। চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কে, মনে হয়?"

হেলেন বলল, "চুপ করে থাকো। হয়ত কোন বন্ধু। উত্তর না দিলে, ফিরে যাবে।"

আবার বেল বাজল। কয়েকবার দরজা ধাক্কাল। হেলেন ফিসফিস করে বলল, "বেডরুমে যাও।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কে, হতে পারে?"

"জানি না। তুমি বেডরুমে যাও। ওকে তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিচ্ছি। আর বেশীক্ষণ দরজা ধাক্কালে প্রতিবেশীরা জানতে উৎসুক হবে।"

হেলেন আমাকে জোর করে সরিয়ে দিল। চকিতে দেখে নিলাম, ঘরে কোন কিছু পড়ে রইল কিনা। তারপর বেডরুমে গেলাম। শুনতে পেলাম, হেলেন বলছে, "ও, তুমি!" পুরুষের কণ্ঠস্বরও কানে এল। আস্তে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিলাম। রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার একটি দরজা আছে। কিন্তু সে দরজা নাগালের বাইরে। কেউ দেখে ফেলবে। ঘরের দেওয়াল আলমারিতে হেলেন অনেক কাপড়চোপড় রেখেছে। আলমারিটার কাঠের দরজা। লুকাতে হলে ঐ আলমারিই ভাল।

লোকটি হেলেনের সাথে বসবার ঘরে গেল। কণ্ঠস্বর চিনলাম। জর্জ, হেলেনের ভাই। ও আমাকে একবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল।

দেখলাম, ড্রেসিং টেবিলে একটি কাগজ কাটা ছুরি পরে আছে। আমার আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র। বিনা দ্বিধায় ওটি পকেটে পুরে, দেওয়াল আলমারির মধ্যে লুকোলাম। জর্জ যদি আবিষ্কার করেই ফেলে, প্রয়োজন বোধে ওকে খুন করে পালাব।

শুনলাম, হেলেন বলল, "টেলিফোন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই শুনতে পাইনি। কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?"

"চরম বিপদে মানুষের ভিতর শুকিয়ে যায়। যেন সামান্য স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। ওর উত্তর শোনার আগেই বুঝেছিলাম, জর্জ আমার উপস্থিতির বিন্দু বিসর্গ জানে না।

জর্জ বলল, "বেশ কয়েকবার ফোন করলাম। কেউ ধরল না। এমন কি ঝিটাও না। ভাবলাম, কিছু হয়েছে। তুমি দরজা খুলছিলে না কেন?"

হেলেন স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, "আজকাল প্রায়ই মাথা ধরে। এখনো ধরে আছে। তাই টেলিফোন নামিয়ে রেখে ঘুমিয়েছিলাম। তুমি ডাকতে, ঘুম ভাঙ্গল।"

"মাথা ধরেছে?"

"হ্যাঁ।এবার যেন আগের থেকে বেশী ধরেছে। দুটি পিল খেয়েছি। ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমের পিল ?"

"মাথা ধরার। জর্জ, তুমি বরং ওঠো। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"পিলগুলি কাজের নয়। জামা কাপড় পরে নাও। বেড়াতে চলো। বাইরের হাওয়ায় মাথা ছাড়বে।"

"কিন্তু পিল দুটি যে খেয়ে ফেলেছি। এখন ঘুমানো ছাড়া রাস্তা নেই। ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করছে না, জর্জ।"

ওরা কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলল। জর্জ ঘণ্টাখানেক বাদে হেলেনের খবর নিতে আসবে। হেলেন বলল, দরকার নেই। জর্জ জিজ্ঞেস করল, ঘরে যথেষ্ট খাবারদাবার আছে কিনা। হেলেন জানাল, প্রচুর আছে। এবার জর্জ ঝিয়ের কথা জিজ্ঞেস করল। হেলেন ঝিকে সন্ধ্যাবেলা ছুটি দিয়েছে। রাতে খাবার বানাতে আসবে। জর্জ জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই ত' ?"

"না।"

"তাহলে আর দাঁড়াব না। সব ঠিক থাকলেই ভাল। আমি তোমার ভাই·········
তাই চিন্তা হয়···।"

"সুতরাং ?"

"সুতরাং, কী ?"

"সুতরাং তুমি আমার ভাই।"

"তুমি কি সে কথা স্মরণ রাখ ?"

হেলেন অধৈর্য্যভরে বলল, "খুবই রাখি।"

"আজ তোমার কি হল ?"

"বিশেষ কিছু না, জর্জ।"

"সেই পুরানো ব্যামো ধরেনি ত' ?"

"না, জর্জ। মাথা ধরেছে মাত্র। আমি চাই না, কেউ আমাকে প্রতি পদে পরীক্ষা করে।"

"কেউ পরীক্ষা করছে না। আমি শুধু তোমার জন্য চিন্তিত।"

"চিন্তার কারণ নেই, জর্জ। আমি ভাল আছি।"

"ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলে ?"

হেলেন কয়েক মুহূর্ত বাদে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"ডাক্তার কি বলল ? নিশ্চয় কিছু বলেছে ?"

হেলেন বিরক্ত সুরে উত্তর দিল, "বিশ্রাম নিতে বলেছে। ক্লান্তি এলে অথবা মাথা ধরলে, ঘুমোতে বলেছে। আরও বলেছে, ঐ অবস্থায় যেন বাদ প্রতিবাদ না করি। জাতির একজন কমরেড এবং মহান "সহস্র বর্ষব্যাপী রাজ্যে"র নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যের সাথে ঘুমের সঙ্ঘাত সম্পর্কে চিন্তা করতেও নিষেধ করেছে।"

"ডাক্তার ঐ কথা বলেছে ?"

"না, অত কথা বলেনি, জর্জ। কিছু আমি নিজে যোগ করেছি। শুধু ভাবনা চিন্তা এবং উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে বলেছে। এ উপদেশ দিয়ে সে কোন অন্যায় করেনি। এর জন্য তাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাতে হবে না। তা ছাড়া, ডাক্তার সরকারের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। আর কিছু জানার দরকার ?"

জর্জ বিড়বিড় করে কিছু বলল। বুঝলাম, ও রওনা হবে। এখন অধিকতর সাবধান হতে হবে। আলমারির কপাটের ফাঁক দিয়ে সব দেখছিলাম। একটু পরে ঘরের দরজায় ওর ছায়া পড়ল। পায়ের শব্দে বুঝলাম, ও বাথরুমে গেল। মনে হল, হেলেনও বেডরুমে এসেছে। হেলেনের কায়া বা ছায়া দেখলাম না। কপাট বন্ধ করে, হেলেনের জামাকাপড়ের আড়ালে, হাতে কাগজ কাটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"জানতাম, জর্জ আমার উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানে না। ও হয়ত বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসবাব ঘরে যাবে। শেষে চলে যাবে। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেল। গা বেয়ে ঘাম পড়ল। অচেনা থেকে চেনা ভয়ে ডর বেশী। অচেনা ভয় মারাত্মক হলেও, আকৃতি অজানা। তার বিরুদ্ধে মানসিক শৃঙ্খলাবোধকে কাজে লাগানো চলে। চেনা ভয়ের কাছে এসব কৌশল ব্যর্থ। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়ার আগে প্রথমটিকে চিনেছিলাম। দ্বিতীয়টিকে এখন চিনলাম। এবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কপালে যা আছে, তা ভালই জানতাম। কিন্তু, বর্ডার পেরিয়ে এতখানি রাস্তায় ও কথা মনে পড়েনি। মনে করতে চাইনি। করলে, জার্মানীতে ফিরতে পারতাম না। তা ছাড়া, স্মৃতিশক্তি আমাদের দুঃসহ স্মৃতি মুছে বিগত দিনগুলি সোনালী পাতে মুড়ে দেয়। আপনি বুঝতে পারছেন ত' ?"

উত্তর দিলাম, "বুঝেছি। আমরা ওগুলি ঠিক ভুলি না। ওরা স্মৃতির কোণে সুপ্ত থাকে। এক ধাক্কায় জেগে ওঠে।"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে বললেন, "আলমারির অন্ধকার সুগন্ধ কোনে দাঁড়িয়েছিলাম। কাপড়চোপড়ের রাশি আমাকে অতিকায় বাদুড়ের ডানার মত চেপে ধরেছিল। অত্যন্ত ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম, পাছে হেঁচে কিংবা কেশে ফেলি। ভয় যেন আলমারির মেঝে থেকে বিষাক্ত গ্যাসের মত ক্রমে উপরে উঠছিল। ভাবছিলাম, ঐ গ্যাস আমার শ্বাসরোধ করবে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এবার রক্ষা নেই। প্রথমবার যে অত্যাচার সয়েছি, তা ভবিষ্যতের তুলনায় অবশ্যই লঘু। এতদিনে সে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। তখন মনে পড়ল : অন্যের উপর যে অত্যাচার নিজ চোখে দেখেছি, যা অনুমান করেছি। ভাবলাম ইউরোপের সেই সুন্দর দেশগুলি থেকে চলে এসে কী পাগলামিই না করেছি। ওখানে বিনা পাসপোর্টে ধরা পড়লে বড় জোর জেলে পাঠাত অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করত। পৃথিবীতে মানবতার স্বর্গপ্রতিম ঐ দেশগুলি।

"বাথরুমের পাতলা দেওয়ালগুলির মধ্যে দিয়ে জর্জের উপস্থিতি বুঝতে পারলাম। ও প্রভু জার্মান জাতের মহান প্রতিনিধি। ধীরে সুস্থে কাজ করতে জানে না। কমোডের

ঢাকাটি সশব্দে উল্টিয়ে, আত্মগরিমা তৃপ্ত করে প্রস্রাব করল। ওর মনে সন্দেহের ছোঁয়া নেই। তাতে আমার আশ্বস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু জঘন্যতম অবমাননা বোধ হল। ও প্রস্রাব করল, আমি তাই কান পেতে শুনলাম! মনে পড়ল, সিঁধেল চোররা চুরি সেরে যাওয়ার আগে সে বাড়িতে প্রস্রাব করে যায়। আসলে প্রাণভয়ে প্রস্রাব পেলেও, এভাবে ওরা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে।

"সিস্টার্ন টানার শব্দ শুনলাম। অনতিকাল পরে জর্জ বিজয়গর্বে বাথরুম থেকে বেডরুমে পা দিল। অবশেষে সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ। আলমারির দরজা খুলে গেল। চোখে আলো লাগল। আলোয় হেলেনের ছায়া। ও ফিসফিস করে বলল "চলে গেছে।"

আলমারির বাইরে এলাম। তখন ভয় আর লজ্জা মিলে আমার এক অদ্ভুত মনের ভাব। এ ভাব নতুন নয়। তবু, অন্য দেশে অনুরূপ পরিস্থিতিতে এবং জার্মানীতে ধরা পড়ার মধ্যে অনেক তফাত। হেলেন বলল, "এক্ষুনি তোমায় যেতে হবে।"

"ওর দিকে তাকালাম। আশা করেছিলাম, বিদ্রূপের আভাস পাব। বিপদ মুক্তির পর ভাবছিলাম, আমি ব্যক্তি হিসাবে কত অবমানিত। কিন্তু হেলেন ব্যতীত অন্য লোকের সামনে ঐ ভাব হত না। ওর মুখে নগ্ন ভীতির ছায়া। ও বলল, "তোমায় পালাতেই হবে। ফিরে এসে নিছক পাগলামি করেছ।"

"একটু আগে আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তখন বললাম, "এক্ষুণি নয়। এক ঘণ্টা বাদে। জর্জ হয়ত আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর ফেরার সম্ভাবনা আছে?"

"মনে হয় না, ফিরবে। ও কোন সন্দেহ করেনি।"

হেলেন টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে একবার বাইরে উঁকি দিল। বাতির রেখা বসবার ঘরে একটি সোনালী বৃত্ত রচনা করল। বৃত্তের বাইরে, হেলেন। যেন শিকারের অপেক্ষায় শিকারী। ও বলল, "তুমি হেঁটে স্টেশন যাবে না। কেউ চিনে ফেলবে। কিন্তু এ শহর ছাড়তেই হবে। এলা'র গাড়ি ধার চেয়ে, তোমাকে মুনস্টারে ছেড়ে আসব। তোমাকে এখানে এনে খুব আহাম্মকি করেছি। আর না।"

হেলেন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে। তবু কী দুঃসহ বিচ্ছেদ। ও সেই প্রথম বুঝল, আমাদের একত্র থাকা অসম্ভব। সারাদিন ধরে গড়ে ওঠা ব্যবধানের প্রাচীর ধ্বসে পড়ল। ও ভয় প্রত্যক্ষ করেছে। নিরাপত্তাচিন্তার কাছে তাই ওর অন্য ভাবনা তলিয়ে গেছে। ওর সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো ভয় আর প্রেম। ও স্পষ্ট দেখেছে, বিচ্ছেদ অবধারিত। ছল, প্রতারণায় তা এড়ানো যাবে না। আমার অসহ বেদনা কামনায় রূপান্তরিত হল। ওকে আর একবার জড়িয়ে ধরতে চাইলাম। হাত বাড়ালাম। শুধু আর একটি বার । ও পাশ কাটিয়ে বলল, "এখন নয়। এক্ষুণি এলার কাছে যেতে হবে। তোমায় পালাতেই হবে……।"

ভাবলাম, কিছু হবে না। তখনো এক ঘণ্টা বাকি। কিন্তু, আগে থেকে কেন তৈরী হইনি? মন কেন শক্ত করিনি? বিদায় লগ্ন আসন্ন জেনেও, ব্যক্তি এবং মানসের মাঝে

কেন কাচের পাঁচিল তুলে ভুলেছিলাম ? যদি প্রত্যাবর্ত্তন পাগলামি হয়ে থাকে, এ অধিকতর পাগলামি। তবু, ধূসর শূন্যে ফিরবার আগে অন্ততঃ হেলেনের কিছু সাথে নিতে হবে, যা অতিসাবধানী, ছলচাতুরীভরা ব্যবহার এবং এক থেকে অপর নিদ্রার মাঝে মিলনের স্মৃতি অপেক্ষা মহত্তর। ওকে পেতে হবে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে। ওর ইন্দ্রিয়, চেতনা এবং মন যখন সজাগ। অর্থাৎ ওর সবটুকু চাই। জন্তুর মত দিনরাতের মাঝে মিলন হলেই চলবে না।

ও বাধা দিয়ে বলল, জর্জ্জ ফিরতে পারে। বুঝলাম না, সেটা ওর বিশ্বাস কিনা। কিন্তু একাধিকবার বিপদে পড়ে, সঙ্কট কাটলেই ভুলতে শিখেছিলাম। তখন আমার একটি মাত্র কামনা ঃ ঐ ঘরের বিছানা, হেলেনের গায়ের গন্ধ আর মিষ্টি সন্ধ্যা। আমার সব দিয়ে ওকে পেতে চেয়েছি। শুধু একটা কথা মনকে পীড়ন করছিল, বিচ্ছেদের বেদনা ফুটো করে দিচ্ছিল। হায়, প্রকৃতি বিরূপ ! ওকে আরও, আরও গভীর ভাবে পাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যদি হেলেনের উপর নিজেকে কম্বলের মত বিছিয়ে দিতে পারতাম, যদি আমার হাজারটা হাত আর মুখ থাকত, যদি ওকে এমন ভাবে জড়াতে পারতাম যে দুজনের চামড়ার মাঝে ফাঁক থাকবে না,—তবু, তবু আক্ষেপ থাকবে, চামড়ার সাথে চামড়ার মিলন মাত্র হবে। রক্তের সাথে রক্ত মিলাব কি করে ? দুজনে এত কাছাকাছি। তবু মিলন হল কই ?

সপ্তম

শোয়ার্থস্ বলে যাচ্ছিলেন, কোন বাধা না দিয়ে শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমি ওঁর কাছে একটি দেওয়াল মাত্র, যার থেকে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি ওঠে। নিজের সম্পর্কে ও কথা ভেবেছিলাম বলেই বিনা লজ্জা বা দ্বিধায় ওঁর কাহিনী শুনতে পেরেছি। উনিও, যে কথা বিস্মরণের বালুরাশিতে মিলিয়ে যাবে, আমার সামনে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। আমরা দুই আগন্তুক। এক রাতে দুজনের পথ এক হয়েছিল। তাই উনি আমার কাছে হৃদয় মেলে ধরতে পেরেছিলেন। উনি এক অপরিচিত মৃতের নামের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন ছদ্মবেশ খুলে যাবে, উনিও অনামা জনতার সাথে মিশে, শেষ বর্ডারের কালো গেট পার হয়ে যাবেন। সেখানে কেউ পাসপোর্ট চায় না, না থাকলেও ফেরত পাঠায় না।

ওয়েটার জানাল, এক জার্ম্মান কূটনীতিক এসেছেন। আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে দেখাল। মহামান্য হিটলারের দূত পাঁচ টেবিল দূরে এক ভদ্রলোক এবং দুটি মহিলা পরিবৃত হয়ে বসলেন। মহিলারা ঈষৎ স্থূলকায়া। নীল সিল্কের পোষাক পরনে। কূট-নীতিক আমাদের দিকে পিছন করে বসলেন। আমরাও আশ্বস্ত হলাম। ওয়েটার বলল,

"আপনারা জার্মান ভাষায় কথা বলছিলেন, তাই ভাবলাম কূটনীতিকের সাথে পরিচয় করতে চাইবেন।"

শোয়ার্থস্ এবং আমি যথার্থ রিফিউজির মত দৃষ্টি বিনিময় করলাম। রিফিউজি আর হিটলারের প্রজা জার্মানের চাউনির মধ্যে বিস্তর তফাত। রিফিউজি চট করে সাবধানে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করে। জার্মানী থেকে অগণিত শোয়ার্থসের বিতাড়ন এবং রাশিয়া থেকে একটি গোটা জাতির উৎখাতের মত এ ও বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দান। একশ' বছর পরে আর্তনাদের চাপা গোঙানি যখন আর শোনা যাবে না, ঐতিহাসিক হয়ত বলবেন সে বেদনা মানুষের ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়েছে।

শোয়ার্থস্ নিরাসক্তভাবে ওয়েটারকে বললেন, "আমরা জানি, উনি কে। তুমি বরং কিছু মদ আনো।" তারপর শান্তভাবে বলে চললেন, "হেলেন ওর বন্ধু এলার গাড়ি ধার করে আনতে গেল। আমি ফ্ল্যাটে রইলাম। রাত হয়েছে। জানলাগুলি খোলা। সব বাতি নিভিয়ে দিলাম, যেন ঘরে কেউ নেই। ফোন এলে, ধরব না। জর্জ ফিরে এলে, পিছনের দরজা দিয়ে পালাব। আধ ঘণ্টা জানলার ধারে বসে রাস্তার আওয়াজ শুনলাম। ক্রমে আসন্ন বিচ্ছেদ মনে ছায়া ফেলল, যেমন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কালো ছায়া দিগন্ত ছেয়ে দেয়। অন্ধকারে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে বসলাম। এক পাল্লায় আমার শূন্য অতীত। অপরটিতে শূন্য ভবিষ্যৎ। মাঝখানে কাঁটার স্থানে হেলেন। ওর পিঠে দাঁড়ির ছায়া লম্বমান। যেন জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি। পরের পদক্ষেপে ভারসাম্য নষ্ট হবে। ভবিষ্যতের পাল্লা বেশি ঝুলে যাবে। একগাদা ধূসর রঙ মেখে উঠবে। আর ভারসাম্য ফিরে পাবে না। গাড়ির শব্দে সচকিত হলাম। রাস্তার আলোয় হেলেনকে দেখলাম। অন্ধকারে সদর দরজার পাশে দাঁড়ালাম। চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। চট করে ভিতরে ঢুকে হেলেন বলল, "আমরা এখন রওনা হতে পারি। তুমি মুনস্টারে ফিরবে ত'?

"ওখানে স্যুটকেস রেখেছি, ঘরও বুক করেছি। আর কোথায় যাব?"

"ঐ হোটেলের বিল চুকিয়ে অন্য হোটেলে উঠবে।"

"কোথায়?"

"হ্যাঁ, কোথায়?" হেলেন ভাবতে লাগল। শেষে বলল, "মুনস্টারই ভাল। ওটাই সবচেয়ে কাছে।"

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, একটি স্যুটকেসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিয়েছিলাম। স্থির করলাম, বাড়ির সামনে গাড়িতে উঠব না। হেলেন গাড়িতে স্যুটকেস নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে, আমি উঠব। গাড়ি অবধি পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ দেখেনি। গরম হাওয়া বইছিল। অন্ধকারে গাছের পাতা নড়ছিল। হেলেন বলল, "উঠে এসো। তাড়াতাড়ি। গাড়িটি চারপাশে ঢাকা। ড্যাশবোর্ডের আলোয় হেলেনের মুখ উজ্জ্বল। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছিল। ও বলল, "আমি সাবধানে চালাচ্ছি। এ্যাক্সিডেন্ট হলে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে।"

আমি উত্তর দিলাম না। রিফিউজিরা এসব কথার উত্তর দেয় না। হেলেনের সত্তা সজাগ, যেন এ্যাডভেঞ্চার করতে চলেছে। আপন মনে, নয় গাড়ির সাথে বকবক করছিল। ট্র্যাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামতে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল। দ্বিতীয়বার গাড়ি থামতে বলে উঠল, "দোহাই তোর, সবুজ হয়ে যা বাবা।" শহরের সীমা পেরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কবে মুনস্টার ছেড়ে যাচ্ছ ?"

কবে, কোথায় যাব জানতাম না। শুধু জানতাম, ওখানে থাকার পালা শেষ হয়েছে। উত্তর দিলাম, "কাল যাব।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ও জিজ্ঞেস করল, "এবার তোমার কী প্ল্যান ?"

একা ঘরে বসে এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছিলাম। ট্রেনে চড়া বিপজ্জনক। বর্ডারে পাসপোর্ট দেখালেই হবে না। ভিসা, দেশত্যাগের ট্যাক্স দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি দেখতে চাইবে। আমার ওসব কাগজের বালাই ছিল না। স্থির করেছিলাম, যেভাবে জার্মানীতে এসেছি, সেভাবেই ফিরে যাব। অর্থাৎ, রাতের আড়ালে রাইন নদ পেরিয়ে অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া থেকে সুইজারল্যান্ড। হেলেনকে বললাম, "ও বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না।"

ও মাথা নেড়ে বলল, "অল্প কিছু টাকা এনেছি। তোমার কাজে লাগবে। লুকিয়ে বর্ডার পেরোবার মতলব থাকলে সাথে নিতে পার। এ টাকা সুইজারল্যান্ডে বদল করা সম্ভব হবে ?"

"হবে। কিন্তু, তোমার লাগবে না ?"

"আমি ঐ টাকা সঙ্গে নিতে পারব না। আমাকে বর্ডারে সার্চ করবে। অল্প কয়েক মার্ক নিতে পারি।"

ওর দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। ও কী বলতে চায় ? ভুল বকছে না ত' ? জিজ্ঞেস করলাম, "কত আছে ?"

হেলেন হেসে জবাব দিল, "যত কম ভাবছ, তত কম নয়। অনেকদিন ধরে জমিয়েছি। ব্যাগটার মধ্যে আছে।" ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ দেখিয়ে বলল, "বেশীর ভাগই একশ' মার্কের মোট। কিছু পঁচিশ মার্কের আছে। তোমার কাজে লাগবে। নিয়ে নাও। সব তোমার।"

"নাজি পার্টি আমার ব্যাঙ্কে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল ?"

হেলেন জবাব দিল, "করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি পারেনি। তার আগে ব্যাঙ্কের এক কর্মীর সহায়তায় ঐ টাকা উঠিয়ে ফেলেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে পাঠিয়ে দেব, ঠিকানা জানতাম না।"

"আমি চিঠি লিখিনি। সন্দেহ ছিল, তোমার উপর গোপনে নজর রাখা হচ্ছে। আদৌ চাইনি, তোমাকেও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাক।"

হেলেন শান্তভাবে জবাব দিল, "যদিও ঐটিই একমাত্র কারণ নয়।"

আমরা একটি গ্রাম পার হলাম। সাদা মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের বাড়ির

সারি। ইউনিফরম গায়ে জোয়ান ছেলেরা ঘোরাফেরা করছে। পানশালা থেকে জাতীয় সঙ্গীতের রেশ ভেসে এল। হেলেন বলল, "মনে হয় যুদ্ধ বাধবে। তুমি কি তাই ফিরে এসেছ ?"

"কি করে জানলে, যুদ্ধ বাধবে ?"

"জর্জ্জ বলেছে। তুমি কি তাই ফিরে এসেছ ?"

"ওটা একটা কারণ বৈকি।"

"না, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ ?"

ওর দিকে চেয়ে বললাম, "দোহাই হেলেন, ও কথা বলো না। তোমার ধারণা নেই ওখানকার কী অবস্থা। আর যাই হোক, সেখানে স্বর্গ নয়। যুদ্ধ বাধলে ওখানেও দুর্ভোগ হতে পারে। ওরা হয়ত তখন জার্ম্মানদের জেলে পুরবে।"

লেভেল ক্রসিংয়ে থামতে হল। গেটকিপারের কুঁড়েঘরের সামনে ডালিয়া আর গোলাপ ফুটেছে। গেটের তারে বাতাস এক বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করছে। আমাদের পিছনে গাড়ির সারি। একটি ছোট ওপেল গাড়িতে চারজন গম্ভীর দর্শন শক্তসমর্থ লোক বসে। একটি সবুজ টু-সিটার গাড়িতে একজন বুড়ী বসে। ধীরে ধীরে একটি কালো মার্সেডিস গাড়ি—যেন শববাহী শকট আমাদের পাশে দাঁড়াল। ড্রাইভারের পরনে কালো পুলিশের পোষাক। পিছনের সীটে দুটি পাংশু মুখ পুলিশ অফিসার বসে। গাড়িটি এত কাছে দাঁড়িয়ে যে হাত বাড়িয়ে ধরা যায়। ট্রেন আসতে দেরী আছে। হেলেন আমার পাশে চুপ করে বসে। ঝকঝকে নিকেল পালিশ করা মার্সেডিসটি একটু এগোল। ওর রেডিয়েটার প্রায় লেভেল ক্রসিং ছোঁয়। মনে হচ্ছিল ও দুটি শব বয়ে নিয়ে চলেছে। যে যুদ্ধের কথা একটু আগে হেলেনের সাথে আলোচনা করছিলাম, তার প্রতীক। কালো ইউনিফরম, কালো গাড়ি এবং কুশ্রী আরোহী। সাধারণতঃ শববাহী গাড়িতে গোলাপ থাকে, সুগন্ধ বার হয়। এখানে তফাত, পচনের দুর্গন্ধ।

ট্রেন গর্জ্জন করে চলে গেল। যেন একটি জীবন। এটি এক্সপ্রেস ট্রেন, স্লিপিং কার এবং উজ্জ্বল আলোকিত ডাইনিং কার আছে। সাদা টেবিলক্লথগুলিও দেখা গেল। গেট ওঠার সাথে সাথে মার্সেডিসটি অন্য গাড়িকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেল। একটি কালো টর্পেডো আরও কালো রাতে মিশে গেল।

হেলেন বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব ?"

"তার মানে ? তুমি কী বলতে চাও ?"

ও গাড়ি থামিয়ে দিল। আমাদের মাঝে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের মত নীরবতা নেমে এল। শুধু রাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। হেলেন আবার বলল, "কেন যাব না ? তোমার কি আমাকে এখানে রেখে যাবার ইচ্ছা ছিল ?"

ড্যাশবোর্ডের নীল আলোয় হেলেনকে পুলিশ অফিসার দুটির মত পাংশু লাগছিল। মনে হচ্ছিল, রাতের আঁধারে চুপিসারে মৃত্যু ওর কপালে চিহ্ন এঁকে দেবে। আগেকার দুশ্চিন্তাগুলি মনে পড়ল : ভাবতাম যুদ্ধ যখন বাধবে, আমরা দু'জন তখন দুই

দেশে। যুদ্ধ শেষের আগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ভূমিকম্প থামলে কি দুটি ক্ষুদ্র প্রাণীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে?

হেলেন রেগে বলল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা না থাকলে, ফিরে এসে ঘোরতর অপরাধ করেছ। বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে এড়িয়ে যেতে চাও কেন?"

"এড়াতে চাই না, হেলেন। তুমি জান, আমার সঙ্গে যাওয়ার কী অর্থ।"

"তুমি জান? তাহলে এসেছিলে কেন? শুধু বিদায় নিতে? মিথ্যা কথা।"

"না। তা নয়।"

"তবে? এখানে আত্মহত্যা করতে?"

আমি মাথা নাড়লাম। জানতাম, একটি উত্তরই ও বুঝবে, সে যত মিথ্যা হোক। বললাম, "তোমাকে নিতেই এসেছি, হেলেন। এখনো কি বোঝনি?"

ওর মুখের ভাব বদলাল। রাগ মিলিয়ে গেল। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও অস্ফুটে বলল, "আমি জানতাম। আগে কেন বলনি?"

সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিলাম, "একশ' বার বলতে চেয়েছি, হেলেন। প্রতি মুহূর্তে ও কথাই সবচেয়ে বেশী বলতে চেয়েছি। কিন্তু এ অসম্ভব।"

"আদৌ অসম্ভব নয়। আমার পাসপোর্ট আছে। বাকি সব সোজা, তাই না?"

"তুমি ট্রেনে চেপে জার্মানী ছেড়ে যেতে পার। কিন্তু তোমার ফ্রেঞ্চ ভিসা কই?"

"জুরিখে জোগাড় করব। সুইজারল্যান্ড যেতে ভিসা লাগে না।"

"তা বটে। ভেবে দেখো, হেলেন, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু বলবে না? ওরা যেতে দেবে?"

"ওদের সব বলব না। শুধু বলব, জুরিখে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। আগেও তাই করেছি।"

"তোমার অসুখ করেছিল?"

"মোটেই না। পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলাম। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর এলোমেলো চিন্তা ভেদ করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার পাসপোর্ট আছে?"

হেলেন হ্যান্ডব্যাগ খুলে পাসপোর্ট বার করল। খাঁটি পাসপোর্ট, যার বলে বিদেশ ভ্রমণ চলবে। বাইবেলের থেকে পবিত্র। জিজ্ঞেস করলাম, "কতদিন আগে করিয়েছ?"

"দু' বছর আগে। আরো তিন বছর এর মেয়াদ। তিনবার ব্যবহার করেছি। একবার অস্ট্রিয়া গিয়েছিলাম। তখনো অস্ট্রিয়া স্বাধীন। দু'বার সুইজারল্যান্ড গিয়েছি।"

ভাল করে পাসপোর্টটি পরীক্ষা করলাম। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। এখন আর ওর পক্ষে জার্মানী ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মনে পড়ল, জর্জ প্রশ্ন করেছিল, ও ডাক্তার

দেখাতে গিয়েছিল কিনা। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার অসুখে করেনি ?"

"বোকার মত কথা বলো না। বাপের বাড়িতে জানে, আমি অসুস্থ। ওদের তাই বুঝিয়েছি। মার্টেন্স সাহায্য করেছিল। খাঁটি জার্মানকে বোঝানো কঠিন যে, সুইজারল্যাণ্ডে এমন বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁরা বার্লিনের বিশেষজ্ঞদের থেকে পটু। এ ছাড়া আমি শান্তি পেতাম না।" হেলেন আবার হেসে বলল, "অত ঘাবড়িও না। কোন ভয় নেই। আমি ত' রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর চেষ্টা করব না। ট্রেনে চেপে বলব, জুরিখে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। আগেও তাই করেছি। জুরিখে থাকলে দেখা করবে ?"

"আচ্ছা। এখন গাড়ি চালাতে থাকো। সব এত ভাল মনে হচ্ছে যে ভয় হয়, জঙ্গল থেকে একদল পুলিশ হাজির হবে। কখনো ভাবিনি, আমাদের প্ল্যান এত সহজ হবে হেলেন।"

হেলেন হেসে উত্তর দিল, "প্রিয়তম, আমরা মরীয়া, তাই সব সহজ।"

আমরা ধুলিমলিন গ্রামের রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তা ধরলাম। হেলেন বলল, "আমি ঠিক আছি। ফাঁকি দিয়ে পালাব।" ওর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক।

দুজনে হোটেলে গেলাম। অবাক হলাম, কত সহজে ও ঘটনার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। ও বলল, "তোমার সঙ্গে হোটেলের লবি পর্য্যন্ত যাব। স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকলে, একটু কম সন্দেহজনক মনে হবে।"

"খুব শিগ্‌গির উল্টো কথা বলবে, হেলেন।"

হোটেল ক্লার্ক চাবি দিল, আমি কামরায় গেলাম। হেলেন লবিতে অপেক্ষা করতে লাগল। দরজার পাশেই আমার স্যুটকেশ ছিল। ঘরটির চারদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, কি করে এই ঘরে এসে পেঁৗছেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেল। আমি যেন আর শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই। ভেলায় ভাসছি। সাথে আনা স্যুটকেসটি রেখে, তাড়াতাড়ি লবিতে ফিরলাম। হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার হাতে কত সময় আছে ?"

"আজ রাতে গাড়িটা ফেরত দিতে হবে।"

ওর দিকে তাকালাম। ওকে জড়িয়ে ধরতে এত ইচ্ছা করছিল, বোঝাতে পারব না। লবির বাদামী রঙ, সবুজ রঙের চেয়ারগুলি, উজ্জ্বল আলোকিত রিসেপশন ডেস্ক, তার পিছনে চাবির র‍্যাক আর ডাকবাক্স আমাদের দিকে চেয়ে আছে। ওকে আমার কামরায় নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। বললাম, "আমরা এক সাথে খাব। কাল সকালে দেখা হবে।"

"কাল নয়। পরশু।"

পরশু ! ওর হয়ত পরশুদিন সুবিধা, কিন্তু আমার কাছে তার অপর অর্থ কখনো নয়। অথবা, প্রায় নিশ্চিত উঠবে না, এমন লটারির টিকিট। দেখেছি, অনেক পরশু

আশার বিপরীত ফল দিয়েছে। বললাম, "পরশু বা তার পরের দিন,—তাও আবহাওয়া কেমন থাকে, দেখে। তার থেকে, ও চিন্তা ত্যাগ করি।"

"আমার উপায় নেই।"

দুজনে 'ডোমকেলার' নামে একটি রেস্তোরাঁয় গেলাম। এমন টেবিলে বসলাম, যেখানে কেউ আড়ি পাততে পারবে না। এক বোতল মদের অর্ডার দিয়ে, খুঁটিনাটির জট ছাড়াতে বসলাম। হেলেন পরদিন জুরিখ যাবে। জুরিখে অপেক্ষা করবে। আমি রাইন পার হয়ে সুইজারল্যান্ড পেঁাছাব। জুরিখে দুজনের দেখা হবে।

ও জিজ্ঞেস করল, "যদি জুরিখ না পেঁাছাতে পার?"

"ক্ষতি নেই। সুইস জেলে কয়েদীদের চিঠি লিখতে দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার খবর না পেলে, বাড়ি ফিরে যাবে।"

হেলেন স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ও জানত, জার্মান জেলে কয়েদীদের চিঠি লিখতে দেওয়া হয় না। জিজ্ঞেস করল, "বর্ডারে কড়া পাহারা থাকে?"

"না। যা হোক, ও বিষয়ে ভেবো না। আমি ঢুকতে পেরেছি। বেরোতে পারব না কেন?"

"বিদায়ের পালা লঘু করতে চেষ্টা করেও পারলাম না। ও যেন একটি শক্ত কালো পাঁচিল। বার বার দুজনের ক্লিস্ট মুখের দিকে দেখলাম। বললাম, পাঁচ বছর আগের মত মনে হচ্ছে। এবার দুজনই যাচ্ছি।"

ও বলল, "খুব সাবধানে থাকবে। ঈশ্বরের দোহাই, সাবধানে থাকবে। আমি অপেক্ষা করব। এক সপ্তাহের বেশী। যতদিন তুমি চাও। কোন ঝুঁকি নেবে না।" আমার হাতে হাত রেখে আবার বলল, "এখন মনে হচ্ছে তুমি এসেছিলে। এবার ফেরার পালা। দেরী হয়ে গেল।"

বললাম, "সে কথাই ভাবছি। এবার কিন্তু দুজনে দুজনকে চিনেছি।"

ও অস্ফুটে বলল, "বড় দেরী হয়ে গেছে। এবার তোমার ফেরার পালা।"

"খুব দেরী হয়নি, হেলেন। এমন যে হবে তা ত' জানতাম। তা ছাড়া, অন্যভাবে এলে কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে?"

"আমি ত' সব সময়ই অপেক্ষা করিনি।'

"উত্তর দিতে পারলাম না। আমিও অপেক্ষা করিনি। কিন্তু সহজে স্বীকার করতাম না। তখন ত' নয়ই। উভয়েরই আত্মরক্ষার ব্যূহ রইল না। আমাদের চারদিক খোলা। ভবিষ্যতে কখনো একত্র থাকা যদি সম্ভব হয়, মুনস্টারের কোলাহলমুখর রেস্তোরাঁর এই মুহূর্তটি ফিরে পেতে হবে। তাতে শক্তি এবং শান্তি ফিরে পাব। যেন দর্পণে নিজেদের দুটি প্রতিবিম্ব দেখতে পাব। একটি— ভাগ্য আমাদের কী করতে চেয়েছিল। অপরটি— ভাগ্য আমাদের কী করেছে। হেলেনকে বললাম, "এখন তোমায় ফিরতে হবে। জোরে ড্রাইভ করবে না। সাবধানে থাকবে।"

ও ফিসফিস করে বলল, "তুমিও সাবধানে থেকো। তোমার বেশী সাবধান হওয়া উচিত।"

কিছুক্ষণ থাকার পর হোটেলের কামরা অসহ্য লাগল। স্টেশনে গেলাম। মিউনিখের টিকিট কাটলাম। অন্যান্য ট্রেনের সময়ও জেনে নিলাম। এক রাতের ব্যাপার। ট্রেনে ভালই কাটবে।

মুনস্টার শহর তখন শান্ত হয়ে গেছে। বড় গীর্জার পাশে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে আশেপাশের কয়েকটি বাড়িও চিনলাম। মনে হল, হেলেনের কী হবে? গীর্জার উপর-দিকের বড় জানলাগুলির মত আমার ভবিষ্যদৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল। ওকে সাথে নিয়ে কি ঠিক করছি? ওর বিপদ হবে না ত'? নির্বোধের মত কোন অন্যায় করছি না ত'? না অবশেষে কোন অভূতপূর্ব আশীর্বাদ কুড়াব? কী জানি, কী হবে?

হোটেলের কাছে চাপা কণ্ঠস্বর এবং পায়ের শব্দ শুনলাম। দুটি পুলিশ একজন মানুষকে ধাক্কা দিতে দিতে এক বাড়ি থেকে বেরুল। রাস্তার আবছা আলোয় লোকটিকে দেখলাম। লম্বাটে ধরনের ফ্যাকাশে মুখ। শুকনো রক্তের কালো রেখা ঠোঁটের কোণ থেকে চিবুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাথার চাঁদি ফাঁকা। দুপাশে ঘন চুল। চোখ দুটি ত্রাসে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বহু বছর এমন দেখিনি। পুলিশ দুটি ওকে অধৈর্য্য হয়ে ঠেলছে, টানাটানি করছে। ওদের বিশেষ কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই। চারপাশে চাপা থমথমে আবহাওয়া। পাশ দিয়ে যেতে যেতে পুলিশ দুটি আমার দিকে ভীষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকাল। বন্দীটি যেন স্থির হয়ে যাওয়া চোখ দিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করল। ওর ঠোঁট দুটি নড়ল। কথা বেরুল না। দৃশ্যটি সভ্যতার ইতিহাসের পুরানো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। সেই রাজক্ষমতার আজ্ঞাবাহক, উৎপীড়িত ভুক্তভোগী এবং দর্শক,—যে উৎপীড়িতের সমর্থনে নিজ অঙ্গুলি উত্থানেও বিরত। কারণ, তার আপন নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠা। হায়, সে নিরাপত্তাও অবশেষে বিপর্যস্ত।

গ্রেফতার করা লোকটিকে সাহায্য করার সাধ্য ছিল না। সে চেষ্টা করলে পুলিশ দুটি সহজেই আমাকে ধরাশায়ী করত। একটি অনুরূপ ঘটনা মনে পড়ল। একজন দেখল, একটি পুলিশ এক ইহুদীকে বেদম প্রহার করছে। সে ইহুদীর সাহায্যে এগিয়ে গেল। পুলিশকে মেরে অচৈতন্য করে, ইহুদীকে পালাতে বলল। ইহুদী কিন্তু মুক্তিদাতাকে গাল পাড়ল। ইহুদী বলল, এবার তার রক্ষা নেই। পুলিশ মার খেল, অতএব ইহুদীর আর একটি অপরাধ বাড়ল। চোখ মুছতে মুছতে বেচারা অচৈতন্য পুলিশের জন্য জল আনতে ছুটল, যাতে জ্ঞান ফিরে ও ইহুদীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

ভয় আর অক্ষমতার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। মনে হল, শুধু নিজের কল্যাণের কথা ভেবে জঘন্যতম পাপ করেছি। হোটেলে ফিরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। স্টেশনে যাব। ট্রেন আসতে অনেক সময় বাকি। হোটেল থেকে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করা বেশী বিপজ্জনক। তবু, পাপ স্খালনের জন্য তাই চাইলাম। নিছক ছেলেমানুষি বটে, কিন্তু বিপদের ঝুঁকি আমার আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে।

অষ্টম

সারা রাত ট্রেনে কাটিয়ে পরদিন নির্ব্বিঘ্নে অস্ট্রিয়া পৌঁছলাম। খবরকাগজগুলিতে বাদ-প্রতিবাদের প্রবল ঝড়। সীমান্ত গোলযোগের অভ্যস্ত বুলি। বলা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তিগুলি গোলযোগের সূত্রপাত করেছে। মহাযুদ্ধের সূচনা। সৈন্যভর্ত্তি ট্রেন চলেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের ধারণা, যুদ্ধ হবে না। ওদের আশা, নতুন মিউনিখ চুক্তি হবে। দৃঢ় বিশ্বাস, জার্ম্মানীর সাথে যুদ্ধে এঁটে ওঠার সাধ্য বাকি ইউরোপের নেই। ফ্রান্সে বিপরীত চিত্র। ওখানে সবাই জানে, যুদ্ধ অবধারিত।

ফেল্ড্‌ক্রিশে পেঁ'ছে একটি ছোট হোটেলে উঠলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। টুরিস্টের মরশুম। কেউ কারুর দিকে নজর দেওয়ার ফুরসৎ নেই। সঙ্গের দুটি স্যুটকেসের জন্য আমাকে একটু ভদ্রস্থ দেখাচ্ছিল। স্থির করলাম, স্যুটকেস দুটি এখানে ছেড়ে রেখে, ন্যাপস্যাক কিনে নেব। অনেক হাল্কা হয়ে চলতে পারব। জায়গাটা হিচ্‌হাইকারে ভর্ত্তি। ন্যাপস্যাক নিলে সহজে ওদের মধ্যে মিশে যেতে পারব। এক সপ্তাহের আগাম হোটেল ভাড়া চুকিয়ে দিলাম।

পরদিন বেরোলাম। রাতে বর্ডারের অদূরে একটি পরিষ্কার জায়গায় লুকিয়ে রইলাম। প্রথম রাত মশার কামড় খেয়ে এবং পুকুরপাড়ে একটি স্যালামান্ডারকে পর্য্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দিলাম। ওর মাথায় ঝুঁটি। এক একবার ও পুকুরের ধার বেয়ে বাইরে আসার চেষ্টা করছিল। ওর হলদে সবুজ বুক নজরে পড়ছিল। পুকুরটা ওর দুনিয়া। পুকুরেই ওর জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আফ্রিকা, জাপান আরও সব। গ্রীষ্মের আনন্দে ও মেতে উঠেছিল।

অল্প কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস। হঠাৎ দশ মিনিট পরে একটি কাস্টমস্‌ গার্ড আমার পাশে যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হল। ও হেঁকে বলল, "দাঁড়াও! নড়ো না! ওখানে কী করছ?"

ও নিশ্চয় আড়াল থেকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছে। বললাম, আমি নির্দ্দোষ হিচ্‌-হাইকার। তাতে ফল হল না। বলল, "ওকথা আমাদের অফিসে বলবেন।" আমার পিছনে বন্দুক বাগিয়ে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে এগিয়ে নিয়ে চলল।

হতাশায় প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। তবু মস্তিষ্কের একটি কোণ তখনো সজাগ ছিল। পালানোর রাস্তা খুঁজছিলাম। কিন্তু গার্ডটি মাত্র পাঁচ কদম পিছনে। গুলি করতে ওর হাত কাঁপবে না।

কাস্টমস্‌ অফিসে একটি ছোট কামরায় বসতে দিল। বলল, "যান। ভিতরে অপেক্ষা করুন।"

"কতক্ষণ?"

"যতক্ষণ আপনাকে না জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।"

"সেটা এখনই করতে পারেন না ? আমি ত' কিছু করিনি।"

"কিছু না করে থাকলে আপনার দুশ্চিন্তাও নেই।"

"আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। এখনই শুরু করুন না।" ন্যাপস্যাক খুলে নামিয়ে রাখলাম।

ও হেসে বলল, "আমাদের সময় হলেই শুরু করব।" ওর দাঁতগুলি অসাধারণ চকচকে, যেন একটি শিকারী। ও আবার বলল, "সকালে এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আসবেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। ততক্ষণ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। হিটলারের জয় হোক।"

কামরার চারদিকে দেখলাম। জানলায় মোটা শিক লাগানো। খুব ভারী মজবুত দরজা। বাইরে তালা লাগানো। লোক চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পালানোর সম্ভাবনা নেই। ধীরে আকাশের রঙ ধূসর থেকে নীল হল। পরে উজ্জ্বল আলো দেখা দিল। গলার আওয়াজ শুনলাম। কফির গন্ধও পেলাম। দরজা খুলে গেল। ইচ্ছা করে হাই তুললাম, যেন সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। লাল মুখ, আঁটসাঁট চেহারা অফিসার এলেন। মনে হল, গার্ডটির থেকে সহজ পাত্র। বললাম, "আপনাদের অফিস ঘুমের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা।"

আমার ন্যাপস্যাক খুলে, উনি প্রশ্ন করলেন, "বর্ডারে কি করছিলেন ? স্মাগিলং ? পালানোর মতলব ?"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ কখনো ছেঁড়া শার্ট প্যান্ট স্মাগল্ করে ?

"হয়ত করে না। কিন্তু আপনি ওখানে কি করছিলেন ?" উনি ন্যাপস্যাকটি সরিয়ে রাখলেন। হঠাৎ লুকানো টাকার কথা মনে পড়ল। ধরতে পারলে, রক্ষা নেই। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, যেন আমাকে না সার্চ্চ করা হয়।

হেসে উত্তর দিলাম, "আমি টুরিস্ট। রাতে রাইনের শোভা দেখছিলাম। অপূর্ব লাগছিল।"

"কোথা থেকে আসছেন ?"

মুনস্টারের নাম করলাম। বললাম, "মুনস্টারের হোটেলে জিনিষপত্র রাখা আছে। এক সপ্তাহের আগাম ভাড়াও চুকানো আছে। ইচ্ছা ছিল, আজ সকালে ফিরব। এখনো আমার আচরণ স্মাগ্লারের মত মনে হয় ?"

"এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আপনার হোটেলে রাখা জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হবে।"

"দীর্ঘ পথ হেঁটে চললাম। সঙ্গে কাস্টমস্ অফিসার। উনি একটি সাইকেল সাথে নিয়ে হাঁটছিলেন। ভাবভঙ্গী সন্ধানী কুত্তার মত সতর্ক। আমরা মুনস্টারের হোটেলে পৌঁছালাম।

হোটেলের জানলা থেকে একজন বলে উঠল, "ঐ ত' উনি।" মালিকানী এগিয়ে

এলেন। খুব উত্তেজিত। জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ত' ভাবছিলাম, আপনার কিছু হয়েছে। কোথায় ছিলেন ?"

বিছানা শূন্য দেখে উনি চিন্তায় পড়েছিলেন, হয়ত আমি খুন হয়েছি। ইদানীং ঐ অঞ্চলে খুন জখম বেড়েছিল। তাই পুলিশে খবর দিয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, "আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। এমন সুন্দর রাত। শৈশবের পর গত রাতে প্রথম খোলা আকাশের নিচে শুয়েছিলাম। অপূর্ব লাগছিল। তবে, খারাপ লাগছে, আপনাদের ঝন্‌ঝাটে ফেলেছি। ভুল করে বর্ডারের অত্যন্ত কাছে শুয়েছিলাম। আপনি কি অনুগ্রহ করে এই অফিসারকে বললেন যে, আপনার হোটেলেই ক'দিন ধরে আছি ?"

মালিকানী অনুরোধ রাখলেন। অফিসারও সন্তুষ্ট হল। কিন্তু পুলিশ-পুঙ্গব মানল না। ও বলল, "আপনি তাহলে বর্ডারের কাছাকাছি ছিলেন। কাগজপত্র আছে ? আপনার কী পরিচয় ?"

মনে হল, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। হেলেনের দেওয়া টাকা গোপন পকেটে আছে। ধরলে, প্রমাণিত হবে, আমি সুইজারল্যান্ডে পালানোর চেষ্টা করছিলাম। অতএব, গ্রেফতার। তারপর ?

নাম বললাম। পাসপোর্ট দেখালাম না। নিজের দেশে জার্মান এবং অস্ট্রিয়ানকে পাসপোর্ট দেখাতে হয় না। পুলিশটি বলল, "কি করে জানব, যে ডাকাতটিকে খুঁজছি, আপনি সে লোক নন ?"

আমি হাসলাম। ও রেগে বলল, "এটা হাসবার কথা নয়।" ও ব্যাগ সার্চ করতে শুরু করল।

যেন বিরাট তামাশা দেখছি, এই ভান করলাম। কিন্তু আমাকে সার্চ করে টাকা পেলে কী বলব ? বলব, এই অঞ্চলে সম্পত্তি কেনার চেষ্টা করছি।

পুলিশ স্যুটকেসের সাইড পকেট থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করল। খুব আশ্চর্য হলাম। চিঠির কথা আদৌ মনে পড়ল না। স্যুটকেসটি অস্‌নাব্রুক থেকে এনেছিলাম। অনেক টুকিটাকি ওতে ভরেছিলাম। হেলেন নিজে স্যুটকেসটি গাড়িতে রেখেছিল। পুলিশ চিঠি পড়তে লাগল। কিছুতেই চিঠির আদ্যোপান্ত মনে পড়ল না। শুধু প্রার্থনা করলাম, ওতে যেন গোলমেলে কিছু না থাকে। পড়া শেষ করে পুলিশ প্রশ্ন করল, "আপনিই জোসেফ্ শোয়ার্থস্ ?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। ও জিজ্ঞেস করল, "আগে বলেননি কেন ?"

"আমি বলেছি।"

কাস্টমস্ অফিসার বললেন, "হ্যাঁ, উনি বলেছেন।" পুলিশ জিজ্ঞেস করল, "তাহলে চিঠিটি আপনারই সম্বন্ধে ?"

আমি হাত বাড়ালাম। একটু ইতস্ততঃ করেও চিঠিটি দিল। চিঠির উপর দিকে মুদ্রাঙ্কিত : "ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি হেড কোয়ার্টার। অস্‌নাব্রুকের পার্টি কর্ম-কর্তারা এতদ্দ্বারা জানাচ্ছেন যে পার্টির সভ্য জোসেফ শোয়ার্থস্ জরুরী গোপন কাজে

ভ্রমণরত। মিঃ শোয়ার্থসকে যেন সকল রকম সহায়তা দেওয়া হয়। স্বাক্ষর, জর্জ জুর্গেন্স, স্থানীয় পার্টি অধিনায়ক।" বলা বাহুল্য, সব হেলেনের লেখা।

পুলিশটি সম্ভ্রমভরে জিজ্ঞেস করল, "আপনিই তাহলে মিঃ শোয়ার্থস্ ?"

পাসপোর্টে লেখা নামটি ভাল করে মেলে ধরলাম। পাসপোর্ট রেখে বললাম, "অতি গোপনীয় সরকারী কাজের ভার আমার উপর।"

"তাই দেখছি।"

ভারিক্কি চালে বললাম, "আশা করি আপনাদের কৌতূহল মিটেছে ?"

পুলিশটি উত্তর দিল, "অবশ্যই মিটেছে। এখন বুঝতে পারছি, আপনি বর্ডার পর্যবেক্ষণ করছিলেন।"

ডান হাত তুলে ওকে থামিয়ে বললাম, "অনুরোধ করব, এই ঘটনা পাঁচ কান করবেন না। গোপনীয়তা মেনে চলবেন। সে জন্যই আগে খুলে বলতে চাইনি। এভাবে চেপে না ধরলে বলতাম না। আপনি পার্টির সভ্য ?"

পুলিশটি উত্তর দিল, "অবশ্যই।" ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, "সাবাস। তোমরা অনেক পরিশ্রম করলে ভাই। এই নাও, দু-গ্লাস মদ খেয়ে নিও।" অল্প কিছু টাকা ওর হাতে গুঁজে দিলাম।

শোয়ার্থস্ মৃদু হেসে বললেন, "যাদের চাকরিই হল অপরকে সন্দেহ করা, তাদের ঠকানো কত সহজ! কখনো এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে ?"

বললাম, "হয়েছে, কিন্তু আপনার মত পাসপোর্ট বিনা হয়নি। আপনার স্ত্রীর তারিফ করতে হয় ঠিক ভেবেছিলেন, চিঠিটি কাজে লাগতে পারে।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "হেলেন নিশ্চয় ভেবেছিল আমাকে জানালে, নৈতিক কারণেই চিঠিটি নিতাম না। অথবা নিতে ভয় পেতাম। কিন্তু, আমি নিতাম। যা হোক চিঠিটি সে যাত্রা রক্ষা করেছিল।"

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শোয়ার্থসের কাহিনী শুনছিলাম। এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। জার্মান কূটনীতিক এবং এক ইংরেজ ফক্সট্রট্ নাচছে। ইংরেজ ভাল নাচে। জার্মানের বেশী জায়গা লাগে। ও প্রায়ই সামনে এগিয়ে যায়। নাচেও আগ্রাসনের ভঙ্গী। ও ইংরেজকে প্রায়ই সামনে ঠেলে দিচ্ছে। যেন দাবার ছকে দুটি রাজা—ইংরেজ এবং জার্মান – ভয়ানক কাছাকাছি হয়ে পড়ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিবার ইংরেজ পাশ কাটাচ্ছে। শোয়ার্থস্কে জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কি করলেন ?"

হোটেলে আমার ঘরে গেলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিছু চিন্তা ভাবনাও করতে হবে। হেলেন এমন অচিন্তনীয়ভাবে সেবার বাঁচিয়েছে, যেন মিইয়ে যাওয়া নাটকে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু পুলিশটি ঘটনা সম্পর্কে বেশী কিছু আলোচনা করার আগেই পালানো শ্রেয়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সুইজারল্যান্ড-গামী ট্রেন এক ঘণ্টা পরে ছাড়বে। মালিকানীকে বললাম, জরুরী কাজে একদিনের জন্য জুরিখ যেতে হবে। একটি স্যুটকেস নিয়ে যাব। অন্যটি তাঁর জিম্মায় থাকবে। তারপর

স্টেশনে গেলাম। কখনো এমন কাণ্ড করেছেন? বহুদিন সাবধান থাকার পর একদিন সমস্ত সতর্কতা জলাঞ্জলি দিয়েছেন?

বললাম, "আমিও করেছি। মানুষ কখনো কখনো ভুল করে। আমিও ভুল করেছি। ভেবেছি, অনেক কষ্ট করেছি। এবার ভাগ্যের উচিত কিছু আমাকে প্রত্যার্পণ করা। ভাগ্য তখনো বিরূপ।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "মোটেই না। কখনো মানুষ পুরানোয় আস্থাহীন হয়ে নতুন রাস্তা ধরে। হেলেন চেয়েছিল, ওর সাথে ট্রেনে চেপে বর্ডার পেরোই। তা করিনি। ওর চিঠির চাতুরীতে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে ভাবলাম, ওর কথামত কাজ করব।"

"করেছিলেন?"

"শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে বললেন, "একটি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলাম। বিলাস মানুষকে আত্মপ্রত্যয় দেয়। ট্রেন ছাড়ার আগে লুকানো টাকার কথা ভাবিনি। তখন গোণাও সম্ভব নয়। পাশে এক ফ্যাকাশে, সদা উৎকণ্ঠিত সহযাত্রী বসে। কামরার দুটি বাথরুমই ভর্ত্তি। ইতিমধ্যে বর্ডার স্টেশন এসে গেল। সহজাত বুদ্ধি আমাকে ডাইনিং কারে ঠেলে নিয়ে গেল। এক বোতল দামী মদ অর্ডার দিয়ে, মেনু দেখতে চাইলাম।

ওয়েটার জিজ্ঞেস করল, "আপনার মালপত্র আছে?"

"আছে। পাশের কামরায়।"

"আগে কাস্টমসের ঝামেলা মিটিয়ে নেবেন? আমি ততক্ষণ জায়গা রাখছি।"

"তার অনেক দেরী। প্রথমে কিছু খাবার আনো। অত্যন্ত খিদে পেয়েছে। কিছু আগাম টাকাও দিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে যে, আমি ফিরব।"

"আশা করেছিলাম, বর্ডার গার্ড ডাইনিং কারে নজর দেবে না। কপাল মন্দ। ওয়েটার সবে মদের বোতল আর স্যুপ এনেছে, এমন সময় দুটি ইউনিফরম গায়ে মানুষের আবির্ভাব হল। তার আগেই লুকানো টাকা টেবিলক্লথের নিচে সরিয়ে রেখেছিলাম। হেলেনের চিঠি রাখলাম পাসপোর্টের মধ্যে।

একটি গার্ড হাঁকল, "পাসপোর্ট।" ওর হাতে পাসপোর্ট তুলে দিলাম। পাসপোর্ট না দেখেই জিজ্ঞেস করল, "মালপত্র নেই?"

"উত্তর দিলাম, শুধু একটি স্যুটকেস আছে। পাশের ফার্স্টক্লাস কামরায়।"

অপর গার্ডটি বলল, "খুলে দেখাতে হবে।"

উঠে পড়লাম। ওয়েটারকে বললাম, "জায়গা রেখো।"

"নিশ্চয় রাখব, স্যার। আপনি আগাম বিল চুকিয়েছেন।"

কাস্টমস্ গার্ড দুটি আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আগাম বিল চুকিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। তা না করলে সুইস বর্ডার পার হয়ে যেতাম। আমার সুইস ফ্রাঁ নেই।"

ওরা হেসে বলল, "মন্দ বুদ্ধি নয়।" ওদের একজন বলল, "আপনি এগিয়ে যান। অন্য প্যাসেঞ্জারদের মাল চেক করতে করতে আপনার কাছে পৌঁছাব।"

"পাসপোর্টের কি হবে।"

"চিন্তা করবেন না। আমরাই আপনাকে খুঁজে বার করব।"

নিজের কামরায় গেলাম। সহযাত্রীটি যথাস্থানে বসে। আগের থেকে উৎকণ্ঠিত। থেকে থেকে রুমাল দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ আর হাত মুছছে। পাশের জানলা খুলে দিলাম। যদিও ওখান দিয়ে পালানো অসম্ভব, জানলাটি খোলা থাকায় আশ্বস্ত হলাম।

একটি গার্ড কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার ল্যাগেজ ?"

স্যুটকেস খুলে দেখালাম। ও সহযাত্রীর লাগেজও দেখল। তারপর 'ঠিক আছে' বলে অন্য কামরার দিকে পা বাড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, "আমার পাসপোর্ট কই ?"

"আমার পার্টনারের কাছে আছে।"

কিছুক্ষণ পরে অপর গার্ডটি দেখা দিল। এর গায়ে নাজি পার্টির ইউনিফরম। চোখে চশমা। পায়ে ভারী বুট। শোয়ার্থস্ হেসে বললেন, "জার্মানরা খুব বুটের ভক্ত।"

উত্তর দিলাম, "নিজেদের তৈরী নোংরার স্তূপের উপর চলবার জন্য বুট দরকার।"

শোয়ার্থস্ মদের গ্লাস শূন্য করে ফেলেছিলেন। অবশ্য, খুব বেশী মদ খাচ্ছিলেন না। হাতঘড়িতে দেখলাম, রাত সাড়ে তিনটে। শোয়ার্থস্‌ও দেখলেন। উনি বললেন, "আর বেশী বাকি নেই। জাহাজ ধরার অনেক সময় পাবেন। কাহিনীর বাকিটুকু শুধু আনন্দেরই বলা চলে। সত্যি কথা, এটুকু না বললেও চলে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে বর্ডার পার হলেন ?"

পার্টির সভ্য কাস্টমস্ গার্ডটি হেলেনের চিঠি পড়েছিল। পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, সুইজারল্যান্ডে কোন পরিচিত লোক আছে কিনা ? ঘাড় নেড়ে জানালাম, আছে। জানতে চাইল, "কে ?"

"আমের আর রটেনবার্গ।"

আমের এবং রটেনবার্গ সুইজারল্যান্ডের দুই কুখ্যাত নাজি দালাল। রিফিউজিরা ওদের কুকীর্ত্তির কথা জানত। গার্ডটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আর কেউ আছে ?"

"বের্ণ শহরে পার্টির লোকজন আছে। আশা করি, তাদের নাম জানতে চাইবেন না।"

ও স্যালুট করে বলল, "আপনার যাত্রা শুভ হোক। হিটলার দীর্ঘজীবি হোন।"

সহযাত্রীর কপাল অত ভাল নয়। ওর সব কাগজপত্র পরীক্ষা হল। ওকে বিস্তর প্রশ্নও করা হল। বেচারা আগেই ঘামছিল। এবার তোতলা হয়ে গেল। ওর দুর্দ্দশা সইতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "ডাইনিং কারে ফিরে যেতে পারি ?"

"পার্টির কমরেড বলল, নিশ্চয়ই। আরামে লাঞ্চ খান গিয়ে।"

"ডাইনিং কার ইতিমধ্যে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। আমার টেবিলে এক আমেরিকান পরিবার বসে। ওয়েটারকে বললাম, "আশা করেছিলাম, তুমি জায়গা রাখবে ......"

ও অসহায়ের মত উত্তর দিল, "চেষ্টা করেছিলাম, স্যার। আমেরিকানরা আমাদের ভাষা বোঝে না। যেখানে খুশি বসে পড়ে। আপনি আর একটি টেবিলে বসুন না। আগেই আপনার মদ ঐ টেবিলে সরিয়ে রেখেছি।"

মহা দুর্ভাবনায় পড়লাম। চারজন মানুষের এক আমেরিকান পরিবার আমার আগের টেবিলে বসে। ওদের একটি ষোল বছরের ফুটফুটে মেয়ে আমার টাকার পাশে বসে। ঐ টেবিলে বসবার জিদ করে লাভ নেই। অকারণ সোরগোল হবে। আমরা তখনো জার্মান বর্ডার পেরোইনি।

ভাবছিলাম, কী করা যায়। ওয়েটার সমস্যার সমাধান করে দিল, "আপনি আপাততঃ এই টেবিলে বসুন, স্যার। আমেরিকানরা উঠে গেলেই ঐ টেবিলে বসিয়ে দেব। ঘাবড়াবেন না। ওরা খুব তাড়াতাড়ি খায়। নিয়েছে ত' স্ট্যান্ডউইচ আর অরেঞ্জ জুস। শেষ হতে দেরী লাগবে না। তারপর আপনাকে আগের টেবিলেই উপাদেয় লাঞ্চ সার্ভ করব।"

আর কোন উপায় ছিল না। নতুন টেবিলে বসে টাকার উপর লক্ষ্য রাখতে থাকলাম। অবাক লাগছিল, কয়েক মিনিট আগে জার্মান বর্ডার পার হওয়ার জন্য সব সঞ্চয় দিতে প্রস্তুত ছিলাম। বর্ডার পার হতে না হতেই আমি টাকা পুনরুদ্ধার করতে ব্যগ্র। তার জন্য আমেরিকান পরিবারটির সাথে মারামারি করতেও কুণ্ঠিত নই। নিজের উপর বিরক্তি জন্মাল: কিন্তু উপায় নেই। আমার ইচ্ছা, নিরাপদে বর্ডার পার হওয়া। টাকাগুলিও খোয়াতে রাজী নই। কেবল টাকাই নয়, আমার কাম্য হেলেন এবং আগামী দিনের নিরাপত্তা। তবু টাকাও চাই। টাকা দৈহিক সুখের পথ সুগম করবে। টাকার হাত এড়ানোর উপায় নেই। তবু আমরা ভান করি, টাকা না হলেও চলে। ফলে, ভানটাও নিখুঁত হয় না।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি টাকা ফেরত পেয়েছিলেন?"

সেই কথাতে আসছি। সুইস কাস্টমসের ক'জন অফিসার ডাইনিং কারে উঠল। লাগেজ কারে আমেরিকান পরিবারটির অনেক মালপত্র ছিল। ওদের উঠতেই হল। ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। টেবিল পরিষ্কার হতেই পুরানো জায়গায় ফিরে গেলাম। প্রথমে দেখে নিলাম, টেবিলক্লথ মোটা লাগছে কিনা। ওয়েটার মদ এনে জিজ্ঞেস করল, "কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়েছেন?"

বললাম, "নিশ্চয়। মুর্গী রোস্ট নিয়ে এসো। সুইজারল্যান্ড এসে গেছে?"

ও উত্তর দিল, "এখনো আসেনি। একটু পরেই আসবে।"

ও রান্নাঘরে ফিরে গেল। আমি ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে দুঃসহ অধৈর্য। জানলা দিয়ে লোকজন দেখছিলাম। বেখাপ্পা প্যান্ট পরা একটি বামন প্ল্যাটফরমের উপর ঠেলাগাড়ি করে মদ আর চকোলেট বিক্রির আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। ভীত সহযাত্রীটি নিজের কামরায় ফিরলেন। খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব। ওয়েটার ফিরে এল। আমাকে বলল, "অত তাড়াতাড়ি মদ খাচ্ছেন কেন?"

"তার মানে?"

"আপনি যেন মদ দিয়ে আগুন নেভাচ্ছেন।"

দেখলাম, আধ বোতল শেষ করে ফেলেছি, অথচ খেয়াল নেই। এমন সময় ডাইনিং কার দুলে উঠল। বোতল নড়ল। বোতলটা শক্ত করে ধরলাম। ট্রেন চলতে শুরু করল।

হুকুম করলাম, "আর এক বোতল মদ আনো।" এই ফাঁকে টেবিলক্লথের নিচ থেকে টাকা পুনরুদ্ধার করে পকেটে পুরলাম। খানিক বাদে আমেরিকান পরিবারটি ফিরে এল। আমার ছেড়ে আসা টেবিলে বসে কফির অর্ডার দিল। ওদের মেয়েটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলছিল। লক্ষ্মী মেয়ে। পৃথিবীতে অমন সুন্দর দৃশ্যও বিরল। ওয়েটার মদ নিয়ে ফিরে জানাল, "আমরা এখন সুইজারল্যান্ডে।"

মদের দাম এবং তৎসহ কিছু টিপস্ দিয়ে বললাম, "তুমি মদটা নিয়ে নাও। একটি বিশেষ উপলক্ষ স্মরণ করে আনিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম বোতলই আমার পক্ষে বেশী হয়ে গেছে।"

"খালি পেটে খাচ্ছিলেন, তাই।"

"হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।" আমি উঠে পড়লাম।

ও জিজ্ঞেস করল, "আজ আপনার জন্মদিন?"

"না, বিয়ের রজত জয়ন্তী।"

"আমার ছোটখাট সহযাত্রীটি চুপচাপ বসেছিল। ও নতুন করে ঘামছিল না বটে, ওর জামাকাপড় থেকে তখনো ঘাম ঝরছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "সুইজারল্যান্ডে এসে গিয়েছি?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

ও আবার চুপ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। স্টেশনে একটি গাড়ি এল। স্টেশনমাস্টার ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছিলেন। দুটি পুলিশ লাগেজকারের পাশে দাঁড়িয়ে। একটি লোক চকোলেট আর সসেজ ফিরি করছে। সহযাত্রী একটি সুইস খবরকাগজ কিনে কাগজওলাকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি এখন সুইজারল্যান্ডে?"

"নিশ্চয়। দশ সেন্ট দিন।"

"কি বললেন?"

"দশ সেন্ট দিন। কাগজের দাম।"

"সহযাত্রী এত আনন্দে কাগজের দাম চুকাল যেন, সবে লটারী জিতেছে। সুইস মুদ্রা ওকে স্বস্তি দিয়েছে। আমার কথায় তত বিশ্বাস হয়নি। কাগজটি আদ্যোপান্ত পড়ে রেখে দিল। নবলব্ধ মুক্তির আনন্দে আমিও এমন মশগুল যে চাকার শব্দ মনে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছিল। সহযাত্রীর কথা শুনতেই পাইনি। ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝলাম, ও কিছু বলছে।

ও শাণিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "অবশেষে শয়তানে পাওয়া দেশ থেকে বেরোতে পেরেছি। মিঃ পার্টি কমরেড, আপনাদের মত শুয়ারের বাচ্চারা দেশটাকে ব্যারাক আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করেছে। এ সুইজারল্যান্ড। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পীঠস্থান। এখানে আপনাদের হুকুম কেউ তামিল করবে না। সত্যি কথা বলার অপরাধে দাঁতও উপড়ে নেবে না। আপনারা চোর, খুনে, জল্লাদ,—জার্মানীর সর্ব্বনাশ করছেন।"

ওর ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে যাচ্ছিল। এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন, বাতিকগ্রস্ত

স্ত্রীলোক ব্যাঙ দেখেছে। জার্মান বর্ডার গার্ডদের সাথে কথাবার্তা শুনে ও ধরে নিয়েছিল, আমি নাজি পার্টির সভ্য। নীরবে গালাগাল হজম করা ছাড়া উপায় ছিল না।

ওকে বললাম, "আপনার সাহসের তারিফ করি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার চেয়ে অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি লম্বা, ওজনে বিশ পাউন্ড ভারী। সুতরাং গালাগাল থামান। শান্তি পাবেন।"

ও আরও ক্ষেপে, চেঁচিয়ে বলল, "আপনার ব্যঙ্গ সহ্য করব না। মনে রাখবেন, আমরা আর নাজি-ভূমিতে নেই। আমার বাপ মাকে আপনারা কী করেছেন? বুড়ো বাবা কী ক্ষতি করেছিল? এখন··· এখন আপনারা গোটা পৃথিবী পুড়িয়ে মারতে চাইছেন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কি মনে হয়, যুদ্ধ বাধবে?"

"যেন নিজে জানেন না! সহস্র বর্ষব্যাপী নাজি-রাজের অঢেল সমরসম্ভার আর কোন কাজে লাগবে? যতসব খুনে! যুদ্ধ না হলে আপনাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে।"

উত্তর দিলাম, "আমারও তাই মত। কিন্তু জার্মানী জিতলে কি হবে?" তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ আমার গালে নরম হাত বোলাতে শুরু করেছে।

সহযাত্রী একটি ঢোক গিলে, কষ্টে জবাব দিল, "জানব ভগবান নেই।"

ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "আমি সম্পূর্ণ একমত।"

ও কিন্তু ফোঁস করে বলল, "আমাকে ছোঁবেন না। এমারজেন্সি চেন টানব। আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব। স্পাই কোথাকার!"

উত্তর দিলাম, "সুইজারল্যান্ড ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ। অভিযোগ করলেই গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা নেই। জার্মানী থেকে কিছু বদ ধারণা নিয়ে এসেছেন দেখছি। ওগুলি ত্যাগ করুন।"

"হিস্টিরিয়াগ্রস্থ লোককে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে লাভ নেই। ঘৃণা আত্মাকে কুরে কুরে খায়। ঘৃণা করা বা ঘৃণিত হওয়ার ফল একই। অতএব, স্যুটকেস নিয়ে অন্য কামরায় গেলাম। অল্প পরেই জুরিখ এসে গেল।

নবম

কিছুক্ষণ বাজনা থেমে গেল। নাচমঞ্চ থেকে গরম গরম কথা শোনা গেল। যা অনিবার্য্য তাই ঘটেছে। জার্মান ইংরেজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। একে অপরকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ করছে। ম্যানেজার এবং দুটি ওয়েটার জাতিপুঞ্জের ভূমিকায় বিবদমান পক্ষকে শান্ত করতে ব্যস্ত। কিন্তু ফল হচ্ছে না। ব্যান্ডবাদকরা অপেক্ষাকৃত চালাক। ওরা নতুন সুর ধরল। এবার ট্যাঙ্গো বাজছে। বাদী এবং বিবাদীর মুস্কিল। ইংরেজ তবু ঠেকা দিতে জানে, জার্মান একটুও ট্যাঙ্গো নাচতে পারে না। অন্য জুড়িরা

প্রায় ওদের ধাক্কা দিয়ে নেচে চলেছে। বেচারাদের মুখ কালো করে নিজের টেবিলে ফিরতে হল। হলদে পোষাক আর নকল হীরার মালা পরা একটি মেয়ে গান ধরল। শোয়ার্থস্ ঘৃণাভরে প্রশ্ন করলেন, "হীরোরা ডুয়েল লড়ছে না কেন ?"

উত্তর দিলাম, "আপনি জুরিখ পেঁছিলেন। তারপর ?"

উনি হাল্কা হেসে বললেন, "এই বার থেকে উঠলে কেমন হয় ?"

"সারারাত খোলা বার আরও নিশ্চয় আছে। এই জায়গাটা শবদেহ, নাচ আর লড়াই এর মহড়ায় ভরে উঠেছে।" উনি বারের বিল চুকিয়ে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের যাওয়ার মত জায়গা ওর জানা আছে কিনা। ওয়েটার স্লিপে একটি ঠিকানা লিখে, পেঁছিনোর নির্দ্দেশও দিয়ে দিল।

বাইরে পা দিয়ে দেখলাম আকাশ আর একটু পরিষ্কার হয়েছে। তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে। ভোর হতে দেরী নেই। বাতাসে সমুদ্রের নোনা গন্ধ আর ফুলের সুবাস মিশেছে। মনে হয় আগামীকাল আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দিনের লিসবনের এক নাট্যময় ভঙ্গী, যা সবাইকে আকৃষ্ট করে। রাতের লিসবন রূপকথার সুন্দরী। রেশমী পোষাক গায়ে আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে নিচে কালো সমুদ্রের সাথে মিলতে চলে। সমুদ্র ওর প্রেমিক। খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। শোয়ার্থস্ বললেন, "জীবন সম্পর্কেও কি আমাদের এই ধারণা নয় ? অগণিত বাতি আর রাস্তা মহাশূন্যে মিলছে······"

উত্তর দিতে পারলাম না। নদীর মোহনায় দাঁড়ানো জাহাজটিই আমার জীবন। ওর গন্তব্যস্থল মহাশূন্য নয়, আমেরিকা। জীবনে অনেক এ্যাডভেঞ্চার করেছি। আর করতে চাই না। বস্তুতঃ পচা ডিমের মত এ্যাডভেঞ্চার আমার গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। যে এ্যাডভেঞ্চার কামনা করছিলাম তার রূপ হল, একটি ভিসা সহ পাসপোর্ট আর জাহাজের টিকিট। যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভবঘুরে হতে হয়েছে, তার কাছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই সর্ব্বাধিক রোমাঞ্চময় স্বপ্ন। এ্যাডভেঞ্চার শুকনো ঝঞ্ঝাট ছাড়া কিছু নয়।

শোয়ার্থস্ বললেন, "এই শহর আজ আপনার যেমন লাগছে, জুরিখ সেদিন আমার এই রকম লেগেছিল। মনে হয়েছিল যা হারিয়েছি, ফিরে পাব। কালের মধ্যেই অল্প অল্প মাত্রায় মৃত্যুর বীজ লুকানো থাকে। তাতে আমরা প্রথমে উদ্দীপ্ত হই। এমন কি ভাবি, অমরত্ব লাভ করেছি। কালের সাথে বিষক্রিয়া বাড়ে। পলে পলে রক্ত দূষিত হয়। বাকি জীবনের বিনিময়ে যদি হৃত যৌবন ফিরে পেতে চাই, তা হবে না। এমনই কালের রাসায়নিক ক্রিয়া। একমাত্র দৈব তা রোধ করতে পারে। জুরিখে তাই হয়েছিল।"

আলোকমালায় সজ্জিত লিসবনের দিকে তাকিয়ে শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "এই রাতটি আমার সবচেয়ে অদ্ভুত রাত। সবচেয়ে সুখের রাত বলে স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চাই। স্মৃতি একে ধরে রাখতে পারবে না ? পারতেই হবে। দৈব রহস্য কখনো নিখুঁত হয় না। কিন্তু একবার ঘটার পর তার পুনরাবৃত্তি হবে না। ত্রুটিগুলি তাই শুধরে নেওয়া অসম্ভব। একমাত্র স্মৃতি সে ত্রুটি শুধরাতে পারে। একবার স্মৃতিতে গাঁথলে সে আনন্দ কি চিরকাল রয়ে যাবে না ?"

বিলীয়মান রাতের ছায়া আর উদীয়মান ভোরের অস্ফুট আলোয় শোয়ার্থস্‌কে মনে হচ্ছিল রাতের আঁধার থেকে রয়ে যাওয়া এক দুর্ভাগ্য চরিত্র। উনি তখনো সমুদ্রাবতরণের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। যেন পাগল হয়ে গেছেন। ওঁকে শান্ত করার জন্য বললাম, "সত্যিই ত' কী করে জানব কতটা সুখী হলাম, যদি না জানতে পারি সুখের কতটা আমাদের কাছে রয়ে যাবে?"

শোয়ার্থস্‌ উত্তর দিলেন, "একমাত্র রাস্তা, সম্যকভাবে জানা যে আমরা সুখের কিছুই ধরে রাখতে পারব না। সে চেষ্টাও করব না। অপটু হাতে ধরতে গেলে ও ভয়ে পালাবে। আমরা হাত না বাড়ালে, ওর পালানোর দরকার নেই। হয়ত চোখের আড়ালে থাকবে। তবু আমাদের চোখ যত দিন থাকবে, ততদিনই ও টিকে থাকবে।"

শোয়ার্থস্‌ শহরের দিকে মুখ ফেরালেন,- যে শহরের বাইরে একটি নোঙ্গর করা জাহাজ, ভিতরে কাঠের কফিন। ওঁর মুখ বেদনায় কালো এবং কঠিন হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটি পাথরের মত নিস্পন্দ। ধীরে মুখের ভাব একটু স্বাভাবিক হল। আমরা ঢালু রাস্তা ধরে বন্দরের দিকে হাঁটছিলাম। একটু পরে উনি বলে উঠলেন, "আমরা কারা? আপনি কে? আমি কে? যারা আর ইহজগতে নেই, তারা কারা? যারা আজও বেঁচে আছে, তারাই বা কারা? কোনটা আসল, মানুষ না আয়নায় তার প্রতিবিম্ব? জীবন্ত মানুষ, না তার স্মৃতিটাই আসল? জীবন্ত আমি আর মৃত স্ত্রী কি মিলেমিশে একটি মানুষ হয়ে গিয়েছি? অথবা এও কি সম্ভব যে, আমার স্ত্রী কখনো সম্পূর্ণভাবে আমার ছিল না, মৃত্যুর রাসায়নিক ক্রিয়াই ওকে আর আমাকে এক করে দিয়েছে? ও আমার মাথার খুলির নিচে ধূসর আলোকদ্যুতির সাথে মিশে গিয়েছে। শুধু আমি চাইলে, ও কথা বলবে। এখন কি ও সম্পূর্ণভাবে আমার হয়েছে? অথবা একবার হারিয়ে, ওকে দ্বিতীয়বার হারাতে বসেছি? অর্থাৎ ওর স্মৃতি যত ফিকে হয়ে আসবে, ততই ওকে হারাব?" আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে উনি বললেন, "ওকে ধরে রাখতেই হবে। বুঝতে পারছেন."

আমরা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে যাওয়া সিঁড়ির কাছে পেঁছলাম। ক'দিন আগে ওখানে কোন উৎসব হয়েছে। লোহার শিক থেকে শুকনো ফুলের মালা, রঙীন কাগজের লণ্ঠন আর বৈদ্যুতিক আলোর পাঁচমাথাওলা তারা ঝুলছে সারা রাস্তা জুড়ে। ফুলের মালাগুলি কবরখানার কথা মনে করাল। উৎসব শেষ হয়েছে, ফেলে গেছে বিশ্রী উচ্ছিষ্ট। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য অদূরে একটি তারা অত্যন্ত বেশী জ্বলজ্বল করছিল।

শোয়ার্থস্‌ একটি বন্ধ দরজায় হাত রেখে বললেন, "এই যে, এই জায়গা।" একজন রোদেপোড়া শক্তিমান লোক দরজা খুলে সাদর অভ্যর্থনা করল। দেখলাম, একটি বেশ বড় ঘর। উপরের ছাদ সাধারণ বাড়ি থেকে নিচু। এক দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটি মদের পিপে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে কয়েকটি টেবিল। এক টেবিলে এক যুগল বসে। আমরা মাছভাজা আর মদ অর্ডার দিলাম। অন্য খাবার ফুরিয়ে গেছে। শোয়ার্থস্‌ জিজ্ঞেস করলেন, "জুরিথ দেখেছেন?"

উত্তর দিলাম, "দেখেছি। আমি সুইজারল্যান্ডে গ্রেফতার হয়েছিলাম। সুইস জেল-গুলি সুন্দর। ফরাসীর থেকে অনেক ভাল। বিশেষতঃ শীতকালে। কিন্তু আপনার থাকতে ইচ্ছা হলেও, ওরা দু সপ্তাহের বেশী রাখে না? তারপর সুইজারল্যান্ড থেকে বহিষ্কার করে। তখন বর্ডারের সার্কাস শুরু হয়।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "খোলাখুলি বর্ডার পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মানসিক মুক্তি ফিরে পেয়েছিলাম। ভয়ও অনেক কমেছিল। রাস্তায় পুলিশ দেখে আর ভয়ে পাথর হয়ে যেতাম না। তবু সামান্য ভয়ের ভাব ছিল, যার জন্য নবলব্ধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেরেছিলাম।"

আমি বললাম, "বিপদে জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা বজায় থাকে। কিন্তু বিপদ খুব কাছে এলে, হিসেব গুলিয়ে যায়।"

শোয়ার্থস্ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন, "মনে হয় বিপদ শুধু জীবন সম্পর্কে সচেতন করে না, মৃত্যু এবং তারপরও তার ব্যাপ্তি। আপনি চলে গেলে কি শহরের অস্তিত্ব মুছে যাবে? সে শহর কি ধ্বংস হয়েও আপনার মধ্যে বেঁচে থাকবে না? মৃত্যুর স্বরূপ কে জানে? হয়ত আমাদের পরিবর্ত্তনশীল মুখের উপর ধীরে অপসৃয়মান আলোকরেখার নামই জীবন। কে বলতে পারে ইহজন্মের পূর্বে যে মুখ ছিল, এই পরিবর্ত্তনশীল মুখের বিলুপ্তির পর সে অমরত্ব লাভ করবে না?"

একটি বিড়াল চোরের মত টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। এক খণ্ড মাছ ছুঁড়ে দিলাম। ও মাছ মুখে নিয়ে, ল্যাজ তুলে পালাল। সাবধানে প্রশ্ন করলাম, "জুরিখে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "ওর সঙ্গে হোটেলে দেখা হল। অস্নাব্রুকে আমার যে লজ্জার বাধা ছিল তা কেটে গিয়েছিল। হেলেনেরও দুঃখ বেদনা ছিল না। ওর সঙ্গে দেখা হতে মনে হল, অপরিচিতা প্রেয়সীর দেখা পেলাম। যেন নয় বছরের এক বর্ণহীন অতীত আমাদের বন্ধনগ্রন্থি, তবু সে বন্ধন ওর দিকে অনেকটা আলগা হয়ে গিয়েছে। বর্ডার পার হওয়ার সাথে সাথে ও কালের বিষক্রিয়া মুক্ত। আমরা দু'জন অতীতের দয়ার দানের প্রত্যাশী নই। সাধারণতঃ অতীত হল বিগত বছরগুলির বিমর্ষ প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আমাদের অতীতের আয়নায় শুধু আমাদেরই প্রতিবিম্ব। অতীতের বাঁধন ছিঁড়েছি, তাই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছিলাম।

পুনর্জ্জন্মের আনন্দ বেশ কিছুদিন টিকেছিল। হেলেনই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দের রেশ টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিল। আমি শেষের দিকে আর পারিনি। ও ত' পেরেছে, তাতেই আমি খুশি। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন? কিন্তু আমার পালা; হারিয়ে যাওয়া আনন্দের রেশ পুনরুদ্ধার করতেই হবে এখনই। হ্যাঁ, এখনই। তাই রাত জেগে এই কাহিনী শোনাচ্ছি।

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা জুরিখে অনেকদিন ছিলেন?"

শোয়ার্থস্ অনেক স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিলেন, "এক সপ্তাহ ছিলাম। সুইজার-

ল্যান্ডে বেশীদিন থাকিনি। থাকতে পারলে ভাল হত। সুইজারল্যান্ড তখন একমাত্র দেশ যার শিরঃপীড়া ধরেনি। কয়েক মাস চালানোর মত টাকাও ছিল। হেলেন কিছু জড়োয়া গয়না এনেছিল। এ ছাড়া, ক্রান্সে মৃত শোয়ার্থসের থেকে পাওয়া ছবিগুলি ছিল। প্রয়োজন হলে ওগুলি বিক্রি করা চলত।

হায় সেই ১৯৩৯ সালের মধুর গ্রীষ্ম। ঈশ্বর যেন পণ করেছিলেন, শেষবারের মত পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবেন, শান্তি কী এবং পৃথিবী কী অমূল্য সম্পদ হারাতে বসেছে। জুরিখ ছেড়ে যখন দক্ষিণে লেক ম্যাগিওর-এ চললাম, মনে হচ্ছিল অসম্ভবের রাজ্যে সোনার তরী বেয়ে চলেছি।

জুরিখে হেলেন বাপের বাড়ির চিঠি এবং টেলিফোন পেয়েছিল। ও জানিয়েছিল, জুরিখ থেকে দূরে এক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে যাবে। কিন্তু ওরা চালাকি ধরে ফেলেছিল। সুইস বৈদেশিক রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ। তারা প্রশ্নবান এবং বোঝানোর ঠেলায় অস্থির করে তুলল। বার বার জার্মানীতে ফিরতে বলছিল। অতএব, আমার সিদ্ধান্ত স্থির করতে হল।

আমরা একই হোটেলে, আলাদা ঘরে থাকতাম। কারণ, পাসপোর্টে আমাদের ভিন্ন পদবী। ঐ রকম সময়ে কয়েক টুকরো কাগজই জীবনের নিয়ামক হয। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এক নিয়মে আমরা স্বামী স্ত্রী। আর এক নিয়মে তা নয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নতুন পরিবেশ, বিশেষতঃ সুইজারল্যান্ডে হেলেনের মানসিক পরিবর্ত্তন. সব মিলে এমন অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে ভাবতাম সব শূন্য, অপরপক্ষে রূঢ় বাস্তবও বটে। উপরন্তু আমাদের এই নতুন জগৎ তখনো প্রায় ভুলে যাওয়া এক স্বপ্নের বিলীয়মান কুহেলি আবরণে ঢাকা ছিল। প্রথমে এই সহানুভূতির উৎস খুঁজে পাইনি। মনে করেছি এক অচিন্তনীয় আশীর্ব্বাদ। জীবনের যে অংশ মূর্খের মত হেলাফেলা করেছি ভগবান যেন তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আর একবার নতুন করে বাঁচতে দিয়েছেন। এবার একে সর্বাঙ্গসুন্দর করব। বর্ডারেব আশে পাশে যে ইঁদুর গর্ত খুঁজে বেড়াত, সে তখন অসীম আকাশের পাখী।

* * * *

"একদিন সকালে হেলেনের ঘরে গিয়ে দেখি, ও এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। ও আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ ক্রাউস জার্মান দূতাবাসের কর্ম্মী। হেলেন আমাকে ফরাসী ভাষায় মিঃ লেনোয়ার বলে সম্বোধন করল। ক্রাউস ওর কথা না বুঝে, অপটু ফরাসীতে জিজ্ঞেস করলেন আমি বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর লেনোয়ারের সন্তান কিনা। হেলেন হেসে উত্তর দিল, "মিঃ লেনোয়ার জেনেভার অধিবাসী, কিন্তু জার্মান ভাষায় কথা বলেন। উনি অবশ্য রেনোয়াঁর চিত্রকলার অনুরাগী।"

ক্রাউস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকলা পছন্দ ?"

হেলেন বলল, "উনি চিত্রকলার সংগ্রহের অধিকারীও।"

আমি বললাম, "আমার অল্প কটি ছবির সংগ্রহ আছে।" মৃত শোয়ার্থসের সামান্য

ক'টি ছবির সমষ্টিকে চিত্রকলা সংগ্রহ বলে চালিয়ে দেওয়া হেলেনের নতুন ফন্দি। এক ফন্দির গুণে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের হাত এড়াতে পেরেছি। সুতরাং এ ফন্দির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম।

ক্রাউস নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "অস্কার রাইনহার্টের চিত্রসংগ্রহ দেখেছেন ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "রাইনহার্টের সংগ্রহে ভ্যানগগের আঁকা একটি ছবি আছে, যার পরিবর্তে আমি জীবনের একমাস দিয়ে দিতে রাজী।"

হেলেন, "কোন মাস ?"

ক্রাউস, "ভ্যানগগের কোন ছবিটা ?"

আমি, "উম্মাদ আশ্রমের ভিতর বাগান" ছবিটা।

ক্রাউস মৃদু হেসে বললেন, "অপূর্ব ছবি।" উনি আরও চিত্রকলার কথা বলতে লাগলেন। যখন ল্যুভর চিত্রশালার প্রসঙ্গে এলেন, আমিও যোগ দিলাম। অবশ্য পরলোকগত শোয়ার্থসের শিক্ষকতার গুণেই তা করতে পারলাম। এতক্ষণে হেলেনের ফন্দি বুঝলাম। ও চাইছিল, ক্রাউস যেন আমাকে ওর স্বামী বা রিফিউজি না ভাবেন। জার্মান দূতাবাসের লোককে ভরসা নেই। হয়ত সুইস পুলিশকে সব জানিয়ে দেবে। গোড়াতেই বুঝেছিলাম, ক্রাউস আমাদের সম্পর্কে সন্দীহান। সেজন্য হেলেন আবিষ্কার করল ঃ আমার স্ত্রী লুসিয়েন, দুটি সন্তান, বড়টি মেয়ে, খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে।

ক্রাউসের চোখ খুঁটিয়ে দেখছিল। আমাদের তিনজনেরই শিল্পানুরাগ লক্ষ্য করে আর একটি বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন,—লেকের ধারে রেস্তোরাঁ তিনটির একটি কেমন ? ইত্যাদি। যা হোক ও রকম শিল্পানুরাগীর সাথে সচরাচর আলাপ হয় না।

ওর প্রস্তাবে সোৎসাহে রাজী হলাম। চার বা ছ' সপ্তাহ পরে আমি সুইজারল্যান্ডে ফেরার পর হলে ভাল হয়। উনি অবাক। আমি কি জেনেভার লোক নয় ? বললাম জেনেভার লোক ঠিকই, কিন্তু থাকি বেলফোর্টে। বেলফোর্ট ফ্রান্সে, সেখানে তাঁর পক্ষে খোঁজখবর করা অসম্ভব। বিদায় নেবার আগে উনি শেষ প্রশ্নটি করার লোভ সামলাতে পারলেন না ঃ আমাদের কোথায় দেখা হয়েছিল ? দুটি এমন সমধর্ম্মী মানুষের মিলন বিরল।

হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "ডাক্তারখানায়।" ও দুষ্টু হেসে যোগ করল, "অসুস্থ মানুষ বেশী সমধর্ম্মী হয়, মিঃ ক্রাউস। সুস্থ লোকেব মাথায় স্নায়ুর পরিবর্তে থাকে সবল মাংসপেশী।"

হেলেনের ঠাট্টা হজম করে, খুব চালাক হেসে ক্রাউস বললেন, "বুঝলাম, মহাশয়া।"

পাছে হেলেনের কাছে হেরে যাই, তাই জিজ্ঞেস করলাম, "জার্মানরা কি অধুনা রেনোয়াঁর শিল্পকে পচনশীল বলে না ? ভ্যানগগের শিল্পকে ত' নিশ্চয়ই বলে……"

ক্রাউস আর একবার চালাক হেসে উত্তর দিলেন, "আমাদের শিল্পবোদ্ধারা ও কথা বলেন না।" উনি চলে গেলেন।

"হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি করতে এসেছিল ?"

স্পাইগিরি করতে। তোমাকে খবর পাঠাচ্ছিলাম, "যেন না আসো। কিন্তু ততক্ষণে তুমি রওনা হয়েছ। আমার ভাই ওকে পাঠিয়েছে।"

"জার্মান গেস্টাপো সীমান্ত পার করে অদৃশ্য হাত বাড়িয়েছে একথা স্মরণ করাতে যে, আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই। ক্লাউস বলে গেছে, হেলেন যেন তার সময় মত জার্মান দূতাবাসে দেখা করে। কোন তাড়া নেই। ওর পাসপোর্টটি আর একবার শীলমোহর করা বাকি। শীলমোহর হল ভিসার বিকল্প।

হেলেন বলল, "এ একটা নতুন নিয়ম হয়েছে।"

আমি উত্তর দিলাম, "মিথ্যা কথা। আমি তা হলে জানতে পারতাম। রিফিউজিরা এসবের গন্ধ পায়। মনে হয়, দূতাবাসে গেলে ওরা তোমার পাসপোর্ট কেড়ে নেবে।"

হেলেন, "আমি এখানেই থাকব। দূতাবাস বা জার্মানী, কোথাও যাব না।"

আমরা আগে এ সম্পর্কে আলোচনা করিনি। হেলেনের সিদ্ধান্ত শুনলাম, উত্তর দিলাম না। জানলা দিয়ে হেলেনের পিছনে আকাশ, লেকের এক অংশ আর গাছের সারি দেখতে পাচ্ছিলাম। উজ্জ্বল পটভূমিকায় ওর মুখ বেশ কালো লাগছিল। ও বলল, "এতে তোমার দায় নেই। তোমার কথায় জার্মানী থেকে অ্যাসিনি। তুমি যদি এখানে না থাকতে, তবুও এখানে থেকে যেতাম। বুঝলে?"

"যুগপৎ বিস্মিত এবং লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলাম, "বুঝেছি। আমি কিন্তু ও কথা ভাবছিলাম না।"

"জানি, জোসেফ্। ও বিষয়ে আর কথা বলো না।"

"হয়ত ক্লাউস আবার আসবে, অথবা কাউকে পাঠাবে।"

হেলেন, "ওরা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেই ঝামেলা করবে। দক্ষিণে কোথাও চল না।"

"ইটালিতে যাবার উপায় নেই। মুসোলিনির পুলিশ জার্মান গেস্টাপোর বড় বন্ধু।"

হেলেন, "আর কোথাও যাওয়া যায় না?"

"হ্যাঁ।" যাওয়া চলতে পারে সুইস টিসিনো, লোকার্নো অথবা লুগানো।"

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "সে দিন বিকালে ট্রেন ধরলাম। পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা এাস্কোনার রেস্তোরাঁয় বসলাম। জুরিখ থেকে মাত্র ঘন্টা কয়েকের পথ। ওখানকার দৃশ্যাবলী ইতালীয় ধরনের। প্রচুর টুরিস্টের ভিড়। কারুর মনে রোদে শুয়ে থাকা, সাঁতার কাটা আর জীবনের সবটুকু আনন্দ ছেঁকে নেওয়া ছাড়া চিন্তা নেই। শেষ শান্তির মাসগুলির কথা মনে আছে? ইউরোপের আকাশ বাতাসে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। সবাই ভাবছিল, কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে। দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় মিউনিখ চুক্তি হবে।"

শোয়ার্থস্ আবার বললেন, "সে এক আশা নিরাশার গোধূলি বেলা। কাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আসন্ন বিপর্যয়ের ছায়ায় সব অবাস্তব মনে হচ্ছিল। যেন মধ্য যুগের

কোন অতিকায় ধূমকেতু সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে। সব কেন্দ্রচ্যুত। সবই তখন সম্ভব।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা ফ্রান্সে গিয়েছিলেন ?"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন। সব কিছু তখন ক্ষণস্থায়ী। ফ্রান্স সেদিন গৃহচ্যুতের ঝোপড়া। সব রাস্তার গতি ফ্রান্স অভিমুখে। এক সপ্তাহ পরে হেলেন ক্রাউসের চিঠি পেল। চিঠিতে জুরিখ বা লুগানোর জার্মান দূতাবাসে দেখা করার জরুরী নির্দেশ।"

পালাতে বাধ্য হলাম। সুইজারল্যান্ড অত্যন্ত ছোট, সুসম্বন্ধ রাষ্ট্র। ওখানে যেখানেই লুকাই, ধরা পড়ব। যে কোনদিন ওরা পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখবে, ওটি ভুয়া। দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। আমরা লুগানো গেলাম। কিন্তু জার্মান দূতাবাসের ধারেও গেলাম না। গেলাম ফরাসী দূতাবাসে। ভেবেছিলাম তিন মাসের টুরিস্ট ভিসা পাব। পেলাম, ছ'মাসের। হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কখন রওনা হব ?"

"কাল।"

পাহাড়ের কোলে পাখীর বাসার মত ছোট্ট একটি গ্রাম্য (গ্রামের নাম রঙকো) রেস্তোরাঁর বাগানে বসে ডিনার খেলাম। গাছে গাছে রঙ্গীন জাপানী লন্ঠন ঝুলছিল। বুনো গোলাপ আর যুঁই-এর গন্ধ ভেসে আসছিল। পাহাড়ের গায়ে লেকের জল স্থির। উজ্জ্বল আকাশের নিচে চারপাশের পাহাড়গুলি নীল মাথা তুলে আভিজাত্য ঘোষণা করছিল। আমরা স্প্যাঘেটি আর পিকাতা খেলাম। মদও খেলাম। সন্ধ্যাটি বিষন্ন মধুর লাগল। হেলেনকে বললাম, "যেতে খারাপ লাগছে। ভেবেছিলাম গ্রীষ্মটা এখানে কাটাব।"

"ওকথা বলার অনেক সুযোগ পাবে।"

"আর কী বলব বল ? ওর উল্টো যে অনেকবার বলেছি।"

হেলেনের হাত তুলে নিলাম। রোদে পুড়ে রঙ আরও বাদামী হয়েছে। আশ্চর্য, ক'দিনের রোদ লেগেই ওর রঙ কেমন বদলে যায় ! ওর চোখদুটি আরও চকচক করছিল। বললাম, "তোমার প্রেমে পড়েছি, হেলেন। আমি তোমাকে ভালবাসি। এই মনোরম পরিবেশ, যা ছেড়ে যেতে হবে এবং তার কেন্দ্রবিন্দুতে তুমি—এ সুখের অনুভূতি ভুলব না। হেলেন আমি আরশি। সে আরশিতে তোমার প্রতিবিম্ব। তাই একসাথে দুটি হেলেনকে পাই। দু'জনকেই আমার সব সত্তা দিয়ে ভালবেসেছি। ভগবান, এই সন্ধ্যার স্মৃতি চির জাগরূক রেখো। আমাদের আশীর্বাদ করো।"

হেলেন যোগ করল, "ভগবান, আজকের সব কিছুকে আশীর্বাদ করো। এসো, এই খুশিতে আরও মদ খাই। ভগবান সবচেয়ে বেশী তোমাকে আশীর্বাদ করুক। কারণ এখন যা বলেছ, অন্য সময় তা বলতে তুমি লজ্জায় রাঙা হয়ে যেতে।"

আমি বললাম, "এখনো লজ্জায় রাঙা হয়েছি, কিন্তু তা ভিতরে। কোন কুণ্ঠা নেই আজ। শুঁয়াপোকা দিনের আলোয় চোখ মেলে তাকানোর পরই প্রজাপতির রঙীন পাখা

পায়। এখানকার মানুষের কী সৌভাগ্য! বাতাস বুনো যুঁই আর গোপাপের গন্ধে ভরপুর। ওয়েট্রেস বলছিল, এখানকার জঙ্গল ফুলে ভরা।"

শোয়ার্থস্ বলছিলেন, "মদ শেষ করে আমরা সরু পথ ধরে গ্রাম্য কবরখানায় পেঁছিলাম। কবরখানা ফুল আর ক্রসে ঢাকা। এবার পাহাড়ের গা দিয়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরলাম। পথে আবার এ্যাস্কোনা পড়ল। মায়াবিনী দক্ষিণ ইউরোপ! পাম আর করবীর ছায়া মানুষের চিন্তা মুছে কল্পনার রাশ খুলে দেয়। অনেক তারা বেরোল। আকাশ যেন পৃথিবীর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা মেলে ধরেছে। এ্যাস্কোনার রাস্তার ধারের কাফেগুলি লেকের জলে নানা রঙের আলোর তীর ছুঁড়ে দিচ্ছিল। শীতল বাতাস পথের শ্রান্তি মুছে নিল।

লেকের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠলাম। ছোট্ট বাড়ি, দুটি বেডরুম। হেলেন জিজ্ঞেস করল, "যে টাকা আছে তাতে কতদিন চলবে?"

"হিসেব করে চললে, এক বছর। দেড় বছরও চলতে পারে।"

"হিসেব না করলে?"

"এই গ্রীষ্মের শেষ অবধি।"

"তবে হিসেব করে কাজ নেই," হেলেন বলল।

"গ্রীষ্ম খুবই ক্ষণস্থায়ী।"

ও হঠাৎ রেগে উত্তর দিল, "গ্রীষ্ম, জীবন কেন এত ক্ষণস্থায়ী? কাবণ আমরা জানি, ওরা কত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রজাপতি? ওদের গ্রীষ্ম চিরস্থায়ী। কেউ ওদেব বলোন, গ্রীষ্ম ক্ষণস্থায়ী। তাহলে আমাদেরই বা বলে কেন?"

"এ প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে।"

"অন্ততঃ একটা উত্তর দাও।"

আমরা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে। ঘরের জানালা দরজা খোলা। বললাম, "একটি উত্তর হ'ল এভাবে দীর্ঘকাল চললে জীবন অসহ্য হয়ে পড়বে।"

হেলেন বলল, "আমরা বিরক্ত হয়ে পড়ব? ভগবানের মত? এটা ঠিক নয়। অন্য উত্তর দাও।"

"পৃথিবীতে দুঃখ বেশী। তাই একবার জীবনাবসান হলে বলতে পারব, কপাল ভাল।"

হেলেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বলল, "ওকথা আদৌ সত্যি নয়। ওকথা বলি তার কারণ, আমরা জানি যে এখানে থাকতে আসিনি। আমাদের কোন অবলম্বনও নেই। ওতে দয়ার লেশমাত্র নেই। তবু দয়া আবিষ্কার করি কারণ, দয়াই আমাদের শেষ আশ্বাস।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তবুও কি আমরা ওতেই বিশ্বাস করি না?"

"আমি করি না।"

"তোমার আশায় বিশ্বাস নেই, হেলেন?"

"আমার কিছুতে বিশ্বাস নেই। একদিন নম্বর আসবে, সেদিন সব শেষ। সকলের

বেলায় এক কথা। বন্দী পালাতে চায়। হয়ত পালাতে সফল হয়। কিন্তু পরের বার আর হবে না।"

"ঐ ত' তার আশা। নিশ্চিত সফলতার আশা।" আমি আবার বললাম, "হয়ত যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব। মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য।"

ও রাগ করে বলল, "হেসো না শুধু শুধু।" ওকে ধরতে গেলাম। ও পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। দেখলাম, ওর মুখ অশ্রুতে ভরে গেছে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কী হয়েছে?" ও বলল, "মাতাল হয়েছি, বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"অনেক বেশী খেয়ে ফেলেছি।"

"খুব বেশী খাওনি, হেলেন। এখনো আর এক বোতল রয়েছে।"

আমি ঘর থেকে মদের বোতল আর দুটি গ্লাস নিয়ে এলাম। লেকের গায়ে মাঠের মধ্যে একটি শ্বেতপাথরের টেবিল। হেলেন ততক্ষণে সেই টেবিলে বসেছে। গ্লাসে মদ ঢাললাম। লেকের মৃদু আলোয় মদের রঙ কালো। মদ শেষ করে হেলেন, পাম আর করবীর সারির ভিতর দিয়ে লেকের ধারে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ও যেন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে,—অলৌকিক দর্শন বা কণ্ঠস্বর। ওকে আশ্চর্য্য শান্ত এবং সমাহিত লাগছিল। ওর পাশে নীরবে দাঁড়ালাম। আমি শঙ্কিত, পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়। ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও সিধে দাঁড়াল। তারপর জলের দিকে পা বাড়াল। ও সাঁতার কাটতে লাগল। ওর তোয়ালে আর জামাকাপড় নিয়ে জলের ধারে একটি গ্রানাইট শিলাখণ্ডের উপর বসলাম। দূর থেকে চুলের কুণ্ডলী পাকানো মাথাটি খুব ছোট দেখাচ্ছিল। পৃথিবীতে হেলেন আমার সব। মনে হল, ওকে ফিরিয়ে আনি। আবার ভাবলাম, হয়ত আমার অজ্ঞাত কোন বিষয়ে ওর নিজের সাথে বোঝাপড়া প্রয়োজন। এই তার প্রকৃষ্ট সময়। জল ওর প্রশ্ন, উত্তর এবং ভাগ্য। এ লড়াইএ ও একাকী সৈনিক। আমি সামান্য প্রেরণা যোগাতে পারি।

হেলেন সাঁতার কেটে জলে অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করল। তারপর সোজা পাড়ে ফিরতে লাগল। জল থেকে উঠে যখন আমার কাছে দৌড়ে এল, ওকে রোগা আর উজ্জ্বল লাগছিল। ও বলল, "খুব ঠাণ্ডা। জলটা ভৌতিক লাগছিল। ঝি বলেছে, জলে অক্টোপাস আছে।"

হেসে উত্তর দিলাম, "লেকের জলে সবচেয়ে বড় মাছ যা আছে তা হল পাইক। অক্টোপাস আছে জার্ম্মানীর ডাঙ্গায়। তবে রাতে জল ভৌতিক মনে হওয়া স্বাভাবিক।"

তোয়ালে তুলে নিয়ে হেলেন বলল, "অক্টোপাসের কথা ভাবলে, তা থাকতই। যা বর্ত্তমানে নেই তার সম্বন্ধে ভাবাও যায় না।"

"ঐভাবে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজতর হবে।"

"তুমি বিশ্বাস কর না?"

"এই রাতে সব বিশ্বাস করি।"

ভিজে কাপড় বদলিয়ে,হেলেন আমার গায়ে ঘন হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "পুনর্জন্মে বিশ্বাস কর।"

বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, "করি।"

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এখন আর ও আলোচনা ভাল লাগছে না। ঠাণ্ডা লাগছে, ক্লান্তিও লাগছে।"

গ্রাপ্পা নামে আঙ্গুর রসের মিঠেকড়া ব্র্যান্ডি কিনেছিলাম। এরকম সময় উপকারী। ওকে এক গ্লাস দিলাম। ও আস্তে চুমুক দিতে দিতে বলল, "এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কাল ভুলে যাবে, হেলেন। কাল আমরা প্যারী যাব। প্যারী পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নগরী।

"সেই নগরীই সবচেয়ে সুন্দরী, যেখানে তুমি আমি সুখী।"

ওকে আর একটু গ্রাপ্পা ঢেলে দিলাম। গ্লাস নিয়ে নিজেও একটু ঢেলে নিলাম। হেলেন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে পাঁজাকোলা করে ঘরে তুলে নিয়ে বিছানায় শোয়ালাম। আমিও পাশে শুলাম। ও গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল। আমার ঘুম আসছিল না। খোলা দরজা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়েছিলাম। মাঠের রঙ প্রথমে নীল, তারপর রুপালী হল। এক ঘণ্টা পরে হেলেন উঠে রান্নাঘরে গেল। চিঠি হাতে ফিরে এল। বলল, "মার্টেন্স লিখেছে।" পড়া শেষ করে চিঠি রেখে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, "মার্টেন্স তোমার ঠিকানা জানে?"

হেলেন ঘাড় নেড়ে জানাল, মার্টেন্স জানে। তারপর বলল, "মার্টেন্স লিখেছে, ও বাপের বাড়িতে জানিয়েছে যে আমি বিশেষজ্ঞ দেখাতে আবার সুইজারল্যান্ডে গিয়েছি। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরব।"

"তুমি মার্টেন্সের কাছে চিকিৎসা করাতে?"

"হ্যাঁ। প্রায়ই যেতাম।"

"কী অসুখ হয়েছিল?"

"বিশেষ কিছু না।" হেলেন চিঠিটি ব্যাগে পুরল। আমাকে পড়তে দিল না।

ওর তলপেটে একটি সাদা রেখা দেখলাম। আগে দেখিনি। ক'দিনে ওর চামড়া আরও বাদামী হওয়ায় দাগটা স্পষ্ট হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের দাগ?"

"একটা মামুলি অপারেশনের।"

"কি ধরণের অপারেশন?"

"স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অপারেশন। আর প্রশ্ন করো না, লক্ষ্মীটি।" বাতি নিভিয়ে দিয়ে ও কানে কানে বলল, "তুমি ফিরে এলে, তাই বাঁচলাম। অসহ্য লাগছিল। আমাকে ভালোবাসো। আমার সঙ্গে শুধু প্রেম করো, লক্ষ্মীটি। কোন প্রশ্ন করো না। কখনো করো না......"

দশম

শোয়ার্থস্ বলছিলেন, সুখ ! স্মৃতিতে সুখের রঙ কেমন ছড়িয়ে যায় ! ধোবা বাড়িতে কাচা সস্তা শার্টের মত । মানুষ তাই দুঃখ গুণেতে বসে । প্যারীতে সেন নদীর বাঁ পারে গ্র্যান্ড অগাস্টিন এলাকায় ছোট্ট একটি হোটেলে উঠলাম । সে হোটেলে লিফ্‌ট্ নেই । জরাজীর্ণ সিঁড়ি । ঘরগুলি ছোট ছোট । কিন্তু ঘর থেকেই রাস্তার বইয়ের দোকান, আইন মন্ত্রণালয় এবং বিখ্যাত নতরদাম্ গীর্জা দেখা যেত । আমাদের দুজনেরই পাস-পোর্ট ছিল । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মানুষের জীবন ফিরে পেয়েছিলাম । পাসপোর্ট যত ভুয়াই হোক, যুদ্ধ বাধার আগে অসুবিধা হয়নি ।

একদিন হেলেন জিজ্ঞেস করল, "আগে যখন প্যারীতে ছিলে, কাজ করার অনুমতি পেতে ?"

"অবশ্যই নয় । বাঁচার অনুমতিটুকুও পাইনি । যার বাঁচার অনুমতি নেই, সে কাজ করার অনুমতি পাবে কি করে ?"

"কি করে পেট চালাতে ?"

ঠিক মনে নেই । তবে অনেক পেশাই তখন নিয়েছি । কোনটা বেশী দিন টেকেনি । ফরাসীরা অত আইনের ধার ধারে না । কম মজুরিতে করতে চাইলে, কাজ জুটত । জাহাজে মাল ওঠানো কুলি থেকে হোটেলের বেয়ারার কাজও করেছি । কখনো মোজা, টাই, শার্ট ফিরি করেছি । কিছুদিন জার্মান শিখিয়ে রোজগারও করেছি । মাঝে মাঝে রিফিউজি সমিতি অল্প কিছু দিত । ঠেকায় পড়ে নিজের জিনিসপত্র বেচেছি । কয়েক-বার সুইস খবরকাগজে প্রবন্ধ লিখে উপার্জ্জন করেছি ।

হেলেন, "কাগজের অফিসে কাজ পাওনি ?"

না । তার জন্য পাসপোর্ট/ভিসা এবং বসবাসের অনুমতি প্রয়োজন । শেষ কাজ জুটেছিল, চিঠিপত্রে ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দেওয়া । তারপর শোয়ার্থসের আবির্ভাব এবং আমার নতুন ছদ্মজীবন ।"

হেলেন, "ছদ্মজীবন কেন বলছ ?"

"কারণ তখন থেকে আসল নাম গোপন করে মৃত ব্যক্তির নাম নিলাম । আমি আর সেই আমি রইলাম না ।"

হেলেন, "তবু ছদ্মনাম না বলে, অন্য কিছু বল ।"

তাতে কিছু আসে যায় না, হেলেন । যে নামেই ডাক, আমার দ্বিতীয়,ধার করা অথবা দ্বৈত জীবন তখন শুরু হল । আমরা দুনিয়ার আবর্জ্জনা । আবর্জ্জনার দুঃখ নেই, শোক নেই । কারণ, তার স্মৃতিশক্তি নেই । স্বাভাবিক মানুষের সাথে এখানে প্রকৃত প্রভেদ ।

হেলেন প্রশ্ন করল, "আমরা তাহলে আসলে কী? মিথ্যা নামধারী শবদেহ, না প্রেত ?"

আইনত আমরা টুরিস্ট। আমাদের কম্প্রাসের অনুমতি আছে। কাজ করার অনুমতি নেই।

হেলেন, "চমৎকার! তাহলে আমরা কাজ করব না। চল, সেন্ট লুইয়ের বোঁণ্ডতে বসে রোদ পোয়াই। বেলা হলে, কাফেতে কিছু খেয়ে নেব। কেমন প্রোগ্রাম?"

"চমৎকার!" আমি বলে উঠলাম।

ঐ প্রোগাম মত কাজ করলাম। ছোটখাট কাজ খোঁজা ছেড়ে দিলাম। কত সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধ্যা দুজনে এক সাথে কাটালাম! বাইরে কাল তার দুর্দম গতিতে তুফান ওড়াচ্ছিল। ফরাসী লোকসভার ঘন ঘন জরুরী বৈঠক বসত। সৈন্য সামন্তের আনাগোনা অবিশ্বাস্য রকম বাড়ল। কিন্তু তাতে আমাদের ভ্রূপেক্ষ ছিল না। আমরা তখন অনন্ত-কালের অংশীদার। নিজের দুনিয়া আনন্দে ভরপুর থাকলে, বহির্দুনিয়ার খবর দরকার নেই। আমরা অন্য পারের বাসিন্দা, কালের নাগালের বাইরে। আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অধৈর্য্য লাগছিল। অন্যের সুখের কাহিনীতে তেমন আগ্রহ ছিল না। শোয়ার্থসের প্রকৃত এবং কল্পনার জাল আর আমাকে টানতে পারছিল না। আনমনা উত্তর দিলাম, "ঠিক বুঝলাম না। হয়ত ইহজীবন যখন থেমে যায়, আমাদের যাত্রা যখন শেষ হয়, তখনই আনন্দের এবং অনন্তের যাত্রা শুরু। কাল স্তব্ধ, ক্যালেন্ডারও থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমরা ইহজগতে থাকতে তা হবার উপায় নেই। কারণ, আমাদের হাসি-কান্না কালের অন্তর্গত। কাল গতিশীল, ছুটে চলেছে··· ·"

শোয়ার্থস্ হঠাৎ অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, "যেতে দেব না। আমি চাই, মর্ম্মর মূর্ত্তির মত কাল অচঞ্চল হোক। বালির কেল্লার মত ঢেউয়ে ভেঙ্গে চুরমার হলে চলবে না। কাল গতিশীল হলে মৃত প্রিয়জনদের কী হবে? তারা কি বারংবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে না? আমাদের স্মৃতি থেকে স্থানচ্যুত হয়ে ওরা কোথায় লুকাবে? ওর মুখ! কেবল আমি এখনো মনে রেখেছি। তা কি কালের হাতে সঁপে দিতে পারব? কী করে পারব? জানি, এমন কি আমার মনেও ধীরে ধীরে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, বিকৃত হবে, হয়ত মিথ্যা ছায়া হয়ে যাবে যদি··· ···যদি কালের বাইরে, আমার বাইরে ওর আসন না পাতি। মনের মিথ্যা এবং স্বপ্নবিলাস আইভিলতার মত ওকে জড়িয়ে ধরবে। ক্রমে ওকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বেঁচে থাকবে আইভিলতার মায়াজাল। এ সব জানি। আর জানি বলেই ত' সুখস্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। নতুবা আমার অহং ওকে ঝাঁঝরা করে দেবে। ওকে ভুলে, আমি বেঁচে থাকব। আপনি বুঝতে পারছেন?"

অত্যন্ত নম্রভাবে বললাম, "বুঝেছি, মিঃ শোয়ার্থস্। তাই ত' আপনি এ কাহিনী শোনাচ্ছেন, যেন স্মৃতি আপনার বাইরে এসে বেঁচে থাকে······"

একটু আগে ওঁর সাথে নরমভাবে কথা না বলার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার সামনে এক যুক্তিপরায়ণ অর্দ্ধোন্মাদ ডন কুইকজোট্ যিনি কালের উইন্ডমিলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং গভীর সমবেদনার জন্য ইতিপূর্বে ওঁর মনোবিশ্লেষণের কথা ভাবিনি। উনি আবার বললেন, "যদি ··· যদি সফল হই, ওর

স্মৃতি আমার সব ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে, নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকবে। আমাকে বিশ্বাস করুন ....."

নিশ্চয় মিঃ শোয়ার্থস্। স্মৃতি কোন ধূলিমলিন সংগ্রহশালায় রাখা নক্সাদার হাতির দাঁতের বাক্স নয়। অন্য সব প্রাণীর মত স্মৃতিও জীবন্ত, প্রাণবন্ত। সেও খেতে এবং হজম করতে পারে। কিন্তু কিংবদন্তীর ফিনিক্সের মত স্মৃতি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে বাঁচে, শেষে ধ্বংস হয়। আপনি স্মৃতির ধ্বংস রোধ করতে চান।"

শোয়ার্থসের চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। উনি বললেন, "ঠিক করেছেন। আপনি বললেন, কেবল মরণের পরই স্মৃতি প্রস্তরীভূত হওয়া সম্ভব। আমি তা ই করতে চলেছি।"

ক্লান্ত হয়ে বললাম, "আমি অবাস্তব কথা বলেছি।" ঐ ধরনের প্রসঙ্গ আমার আদৌ ভাল লাগে না। স্নায়ুরোগগ্রস্ত লোক দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত যুদ্ধপূর্ব গৃহহীনদের মধ্যে স্নায়ুরোগীর সংখ্যা ছিল অগণিত।

শোয়ার্থস্ আমার মন বুঝলেন। মৃদু হেসে বললেন, "আমি আত্মহত্যা করব না। মানুষের জীবনের এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু জোসেফ্ শোয়ার্থসের মৃত্যু হবে। সকালে যখন বিদায় নিয়ে যাব, জোসেফ্ শোয়ার্থসের তখন জীবনাবসান হবে।"

শঙ্কিত হলাম। কোন উন্মাদসুলভ বিপজ্জনক কর্ম্মপন্থা মাথায় নেই ত'? জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী করবেন?"

"গা ঢাকা দেব।"

"জোসেফ্ শোয়ার্থস্ হিসাবে?"

'হ্যা।"

"শুধু জোসেফ্ শোয়ার্থস্ নামটা গা ঢাকা দেবে?"

"জোসেফ্ শোয়ার্থস্ সম্পর্কিত সব কিছুই অন্তর্ধান করবে। অর্থাৎ আমার পূর্ব্ব সত্তা"

"আপনার পাসপোর্ট কী করবেন?"

"আর দরকার হবে না।"

"আপনার আর একটি পাসপোর্ট আছে?"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে বললেন, "আমার পাসপোর্ট দরকার নেই।"

"পাসপোর্টের সঙ্গে আমেরিকান ভিসাও আছে?"

"আছে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "পাসপোর্ট এবং ভিসা আমাকে বিক্রি করবেন?" আমার কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি ছিল না।

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন।

"কেন বিক্রি করবেন না?"

শোয়ার্থস্, "বিক্রি করতে পারব না। আমি উপহার হিসাবে পেয়েছিলাম, আপনাকে অমনি দিতে পারি। কাল সকালে দেব। আপনি ব্যবহার করতে পারবেন?"

রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিলাম, "ব্যবহার করতে পারব।" ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচবে। আমার পাসপোর্টে আমেরিকান ভিসা নেই। কাল সকালে কি করে জোগাড় করব, জানি না।

বিষণ্ণ হেসে শোয়ার্থস্ বললেন, "কী অদ্ভুতভাবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়! আপনার কথা শুনে শোয়ার্থসের মৃত্যু সময় মনে পড়ছে। আমি তখন ওঁর ঘরে বসে। শুধু চিন্তা, কি করে মৃত্যুপথযাত্রীর পাসপোর্টটি পেয়ে আবার মানুষের মত বাঁচব। বেশ, আপনাকে আমার পাসপোর্ট দেব। কেবল ছবিটা পাল্টাতে হবে। বয়স প্রায় মিলে যাবে।"

বললাম, "আমার এখন উনচল্লিশ বছর।"

"আমার পাসপোর্টে আপনার বয়স পাঁচ বছর বেশী হবে। পাসপোর্ট জাল করতে পারে এমন কাউকে জানেন?"

জবাব দিলাম, "জানি। একজন লোক আছে এখানে। ছবি পাল্টে দিলে অসুবিধা হবে না।"

শোয়ার্থস্, "হ্যাঁ, ব্যক্তিত্ব পাল্টানোর থেকে সহজ।" কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যদি শোয়ার্থস্ এবং আমার মত চিত্রানুরাগী হন, বড় অদ্ভুত মিল হয়। তাই না?"

শরীরের উপর দিয়ে শিহরণ বয়ে গেল। জবাব দিলাম, "পাসপোর্ট একটি কাগজ মাত্র, যাদুমন্ত্র নয়।"

শোয়ার্থস্, "সত্যি কি তাই?"

আমি, 'যাকগে, ওকথা থাক। আপনারা কতদিন প্যারীতে ছিলেন?"

শোয়ার্থসের পাসপোর্টের উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। আমার প্রশ্নের জবাবে উনি কি বললেন, মনে ঢুকছিল না। ভাবছিলাম, কি করে রুথের জন্য ভিসা জোটাব। বোন, এই পরিচয় কেমন? না, তাতে সুবিধা হবে না। আমেরিকান দূতাবাস খুব চালাক। যদি দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা না ঘটে, অন্য কোন ফন্দি করতে হবে। এমন সময় শোয়ার্থসের কথা শুনতে পেলাম।

অবশেষে একদিন ও হাজির হ'ল। ছ' সপ্তাহের চেষ্টায় আমাদের খুঁজে পেয়েছে। এবার জার্মান দূতাবাসের কাউকে পাঠায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য ছাপের পোষাক গায়ে হোটেলের কামরায় সশরীরে হাজির হল জর্জ জুর্গেন্স, নাজি পার্টি অধিনায়ক এবং গোয়েন্দা পুলিশ অধিকর্তা হেলেনের ভাই। লম্বা, বৃষস্কন্ধ, ওজনে দু'শ পাউন্ডের উপর। অসামরিক পোষাক সত্ত্বেও দশগুণ বেশী জার্মান। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তাহলে সবই মিথ্যা? অবশ্য গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম, কিছু গোলমাল আছে… … ."

আমি বললাম, "তাতে তোমার অবাক হওয়ার কথা নয়। কেন জানি না, তুমি যেখানে যাও সেখানেই পচা ডিমের গন্ধ পাও।"

হেলেন হেসে ফেলল। জর্জ্জ গর্জ্জে উঠল, "হাসি থামাও।"

আমি বললাম, "তুমি চিল্লানো থামাও, না হলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

জর্জ্জ, "চেষ্টা করে দেখ না ?"

আমি, "তুমি বিপদ কেটে গেলেই হীরো সাজো নাকি ? যাকগে, কী চাও ?"

জর্জ্জ, "তোমার তাতে দরকার নেই, বিশ্বাসঘাতক। ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি আমার বোনের সঙ্গে কথা বলব।"

হেলেন আমাকে বলল, "তুমি এখানেই থাকবে।" ও রাগে কাঁপছিল। ধীরে চেয়ার থেকে উঠে, একটি শ্বেতপাথরের এ্যাশট্রে হাতে নিয়ে, জর্জ্জকে বলল, "ঐ সুরে আর একটি কথা বললে, এই বস্তুটি তোমার মুখে ছুঁড়ে মারব। ভুলো না, এটা জার্ম্মানী নয়।"

জর্জ্জ, "দুর্ভাগ্যক্রমে এটা এখনো জার্ম্মানী নয় বটে, কিন্তু তার আর দেরী নেই।"

হেলেন, "কোনদিন হবে না। তোমাদের অস্ত্রধারী পশুগুলি কিছুদিনের জন্য দখল করলেও, এদেশ ফ্রান্সেই থেকে যাবে। আর কিছু বলতে চাও ?"

জর্জ্জ, "বলতে চাই, তুমি বাড়ি ফের। জান না, যুদ্ধ বাধলে এখানে তোমার কী হবে ?"

হেলেন, "বিশেষ কিছু হবে না।"

জর্জ্জ, "তোমাকে জেলে পুরবে।"

হেলেন সামান্য ঘাবড়িয়ে গেল। আমি বললাম, "হয়ত আমাদের ক্যাম্পে রাখবে। সে ক্যাম্প জার্ম্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নয়।"

জর্জ্জ ভেঙ্গিয়ে বলল, "তুমি কী জান ?"

আমি, "ভালই জানি। তোমাদের ক্যাম্পে থাকার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।"

জর্জ্জ ঘৃণাভরে জবাব দিল, "ঘৃণ্য কীট কোথাকার ! তুমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলে না। তুমি ছিলে রিহ্যাবিলিটেশন ক্যাম্পে। তবু তোমার সংশোধন হল না। ছাড়া পেতেই গা ঢাকা দিলে।"

আমি, "তোমার পরিভাষার তারিফ করি। কিন্তু কেউ যদি তোমাদের গ্রাস এড়াতে পারে, তাকে কি গা ঢাকা দিল বলা চলে ?"

জর্জ্জ, "আর কী বলা যায় ? নির্দ্দেশ ছিল, তুমি জার্ম্মানীর বাইরে যাবে না।"

বিরক্তি বোধের ভঙ্গী করলাম। আমাকে কয়েদ করার ক্ষমতা অর্জ্জনের আগেও জর্জ্জের সাথে এ ধরনের কথা অনেক বলেছি। লাভ হয়নি। হেলেন বলল, "জর্জ্জ চির-কালই একটি দুর্বল মূর্খ। স্থূলকায়া নারীর যেমন সেমিজ প্রয়োজন, ওর প্রয়োজন বর্ম্মধারী দার্শনিক তত্ত্ব। তর্ক করে লাভ নেই। ও অনেক কথা বলবে, কারণ নিজে দুর্বল।"

জর্জ্জ এবার আগের থেকে শান্তভাবে বলল, "চুপ করো, হেলেন। জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। আজ রাতের ট্রেন ধরব। অবস্থা খুব খারাপ।"

হেলেন, "কত খারাপ ?"

জর্জ, "যুদ্ধ বাধবে। আমি সেইজন্য এসেছি।"

হেলেন, "যুদ্ধ না বাধলেও আসতে, যেমন সুইজারল্যান্ডে এসেছিলে দু'বছর আগে। একজন অনুগত পার্টি-সভ্যের বোন জার্মানীতে থাকতে না চাওয়ায় তোমার শিরঃপীড়া হয়েছিল। আমাকে বুঝিয়ে জার্মানী ফিরতে বাধ্য করেছিলে সেবার। এবার ফিরছি না। এখানেই থাকব। আর কথা নিষ্প্রয়োজন।"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জর্জ উত্তর দিল, "এই জঘন্য শয়তানটা নিশ্চয় এসব শিখিয়েছে?"

হেলেন হেসে উত্তর দিল, "জঘন্য শয়তান! মনে হচ্ছে এক যুগ গালাগালটা শুনিনি। যেন মধ্যযুগের কোন গালি। না, এই জঘন্য শয়তান - আমার স্বামী—কিছু শেখায়নি। ও বরং ফিরে যেতেই বলেছে। অবশ্য ফিরে যাবার পক্ষে তোমার থেকে ভাল যুক্তি দেখিয়েছিল।"

জর্জ, "তোমার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাই।"

"কোন লাভ হবে না।"

"তুমি আমার বোন।"

"আমি বিবাহিতা নারী।"

"ওটা রক্তের সম্পর্ক নয়," জর্জ উত্তর দিল। পরে রুষ্ট বালকের মত বলল, "অস্নাব্রুক থেকে এতদূর এলাম, তুমি আমাকে বসতেও বলোনি।"

হেলেন হেসে বলল, "ঘর আমার নয়। আমার স্বামী ঘরভাড়া দেয়।"

আমি বললাম, "মহামান্য হিটলারের অনুচর এবং নাজি পার্টি অধিনায়কের বসতে কৃপা হোক। কিন্তু বেশীক্ষণ বসবেন না।"

জর্জ আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসল। জীর্ণ কোচটি ওর ভারে আর্তনাদ করে উঠল। ও বলল, "আমার বোনের সঙ্গে নিভৃতে ক'টা কথা বলতে চাই, বুঝলে?"

আমি উত্তর দিলাম, "যখন আমাকে গ্রেফতার করিয়েছিলে তখন কি হেলেনের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে দিয়েছিলে?"

জর্জ, "ওটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা।"

হেলেন, "জর্জ এবং ওর পার্টি কমরেডরা যা কিছু করে সবই আলাদা কথা। ওদের সাথে মতের অমিল হলে যখন ওরা কাউকে খুন বা গ্রেফতার করে, কিংবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠায়, সে শুধু পিতৃভূমির হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে। তাই না, জর্জ?"

"যথার্থ।"

হেলেন, "জর্জরা সব সময় নির্ভুল। কখনো দ্বিধা বা বিবেকের বালাই নেই। ওরা, ওদের নেতা হিটলারের মত, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিকামী মানুষ। অন্য সবাই কেবল অশান্তি সৃষ্টি করে। ঠিক বলেছি জর্জ?"

"আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

হেলেন, "কোন সম্পর্ক নেই, আবার আছেও। এই সহিষ্ণুতার নগরীতে আত্ম-

যাথার্থ্য-কীর্ত্তন কত হাস্যকর। তুমি সাধারণ নাগরিকের পোষাক পরা সত্ত্বেও এক-জোড়া বুট পায়ে দিয়েছ, যেন সকলকে বুটে পিষে মারবে। তবু এখনো তোমাদের সে ক্ষমতা হয়নি। যাক, আমাকে নাজি মহিলা সমিতির সভ্যা করার আশা ত্যাগ করো। এখন আমার সঙ্গে অন্ততঃ কয়েদীর মত ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে নিঃশ্বাস নিয়েও আমার শান্তি। আমি এখানেই থাকব।"

জর্জ্জ, "তোমার জার্মান পাসপোর্ট আছে। যুদ্ধ হবেই। তখন এরা তোমাকে জেলে পুরবে।"

হেলেন, "জার্মানীর থেকে এখানে কয়েদ হওয়া শ্রেয়ঃ। জার্মানীতে নিশ্চয় আমাকে তালাবন্ধ করে রাখবে। মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝেছি তোমাদের থেকে, তোমাদের ব্যারাক, মনুষ্য প্রজনন খামার এবং সর্ব্বোপরি তোমাদের বিকট হাঁকডাক থেকে দূরে থাকার কী আনন্দ। আগের মত আর নিজের মুখে হাত চাপা দিতে পারব না।"

আমি উঠে পড়লাম। নাজি বর্ব্বরের কাছে হেলেনের এত সাফাই গাওয়া,—যার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে চাইবে না—আমার অসহ্য লাগছিল। জর্জ্জ ফোঁস করে বলল, "সব দোষ ওর। ঐ বিশ্বনাগরিক তোমার মাথা খেয়েছে! একটু অপেক্ষা করো, তোমার খবর নেব।"

জর্জ্জ উঠে দাঁড়াল। সহজেই ও আমাকে মারতে পারত। ওর বপু এর্মানতে আমার দ্বিগুণ। তার উপর, জার্মান সংশোধনী শিবিরে থাকার ফলে আমার বাঁ হাতটি অবশ। হেলেন খুব শান্তভাবে ওকে বলল, "তুমি ওর গায়ে একটা আঙ্গুল লাগিয়ে দেখ?"

জর্জ্জ গর্জ্জে উঠল, "কাপুরুষ! তোমার জন্যই ও পার পেয়ে যায়।"

শোয়ার্থস্ একটু থেমে আবার বললেন, "নৈতিকশক্তির কাছে পশুশক্তি নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তবু পশুশক্তির মোকাবিলা পশুশক্তি দিয়েই করতে না পারার গ্লানি আছে। সে গ্লানিমুক্তির জন্য অনেক কৈফিয়ত খুঁজতে হয়। আপনি বুঝতে পারছেন?"

আমি সায় দিলাম, "বুঝতে পেরেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অযৌক্তিক। তবু সে গ্লানি আমাদের পীড়া দেবেই।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "জর্জ্জ মারলে, নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করতাম"

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ও কথা বলছেন কেন, মিঃ শোয়ার্থস্? আমার কাছে ত' কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই।"

উনি দুর্ব্বল হেসে উত্তর দিলেন, "তা ঠিক। তবু কৈফিয়ত না দিয়ে পারি না। এতে অন্ততঃ আমার আত্মগ্লানির গভীরতা আন্দাজ করতে পারবেন। পৌরুষের দম্ভ কাটিয়ে ওঠা বোধ হয় আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, কি বলেন?"

জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কি হল? মারামারি করলেন?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "না।" জর্জ্জের ভঙ্গী দেখে হেলেন আমাকে বলল, "ঐ আহাম্মকের দিকে তাকানোর দরকার নেই। ও ভাবছে, তোমাকে ঘা কতক লাগাতে পারলেই আমার চোখে তোমার কাপুরুষতা প্রমাণ হয়ে যাবে এবং আমি কাপুরুষকে ত্যাগ করে সেই

রাজ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হব যেখানে বজ্রমুষ্টির জয়-জয়কার।" তারপর জর্জের দিকে ফিরে বলল, "কাকে কাপুরুষ বলছ? ও যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তা তোমাদের কল্পনাতীত। ভাবতে পার, আমাকে নিয়ে আসার জন্য ও জার্ম্মানী গিয়েছিল?"

জর্জের চোখ বিস্ময়ে ঠেলে বেরোচ্ছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "কি বললে? জার্ম্মানী গিয়েছিল?"

হেলেন এবার ধাতস্থ হয়ে জবাব দিল, "ওসব ভুলে যাও। আমি এইখানে আছি, এখানেই থাকব।"

জর্জ আবার জিজ্ঞেস করল, "ও তোমাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল? কে সাহায্য করেছে?"

হেলেন, "কেউ না। তুমি অবশ্য ক'টি নির্দ্দোষ লোককে গ্রেফতার করতে পারলে খুশি হও।"

হেলেনের ঐ মূর্ত্তি কখনো দেখিনি। ঘৃণা এবং বিরক্তিতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। অপর পক্ষে জর্জের করাল গ্রাস এড়াতে পেরে বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত। আমারও অনুরূপ অনুভূতি হয়েছিল। তবু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল আর এক চিন্তা– প্রতিহিংসা। জর্জ একা। হুইসেল বাজালেও গেস্টাপো আসবে না। কিছু করতেই হবে। কী করব জানি না। ওর সাথে লড়াই করে পারব না। তবু ওকে পৃথিবী থেকে সবাতেই হবে। আইন আদালতের ঝামেলায় যাব না। শয়তানের অবতারের কোন বিচাবেব প্রয়োজন নেই। ওকে হত্যা করলে পাপ হবে না। ডজন ডজন নিবপরাধ মানুষ বাঁচবে। মাথা ঘুরতে লাগল। কেন জানি না, দরজার দিকে পা বাড়ালাম। হেলেন চেয়ে দেখল. কিছু বলল না। কিছুক্ষণ একা থাকতেই হবে। আমি চলে যাচ্ছি লক্ষ্য করে. জর্জ আবাব বসল। ঘৃণাভরে বলল, "অবশেষে " দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। অনেক ফ্ল্যাটে দুপুরে খাওয়ার জন্য মাছ ভাজা হচ্ছে। সিঁড়ির বাঁকে একটি নক্সাকাট বড় বাক্স রয়েছে। আগে কখনো নজর দিইনি। এবার নক্সাগুলি খুঁটিয়ে দেখলাম, যেন কিনতে চাই। তারপর প্রায় ঘুমচোখে চলতে লাগলাম। চারতলার একটি ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম, ঝি বিছানা পরিষ্কাব করছে। তিনতলাব একটি দরজায় থামলাম। ঐ ফ্ল্যাটে ফিশার নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। ওঁর রিভলভার আছে। ওঁর ধারণা রিভলভার থাকলে, জীবন একটু লঘুভাব হয়।

ফিশার ঘরে ছিলেন না. কিন্তু ঘর খোলা। ওঁর অবশ্য গোপন রাখার বিশেষ কিছু ছিল না। ওঁর অপেক্ষায বসে রইলাম। কোন স্থির পরিকল্পনা ছিল না। শুধু জানতাম, রিভলভারটি ধার নেব। জর্জকে হোটেলে খুন করলে শুধু আমাদের নয়, সব রিফিউজির বিপদ হবে। ভাবতে লাগলাম, কি করা যায়। কিছু মনে এল না। অবশেষে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। ক্যানারি পাখীর গানে ধ্যান ভাঙ্গল। ও জানালা থেকে ঝুলান একটি খাঁচায় বসে আছে। আগে দেখিনি। এমন সময় হেলেন এল। ও জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি করছ?"

"কিছু না। জর্জ কোথায় ?"

"চলে গেছে।"

কতক্ষণ ফিশারের ঘরে বসেছিলাম, জানি না। মনে হয় বেশীক্ষণ নয়। জিজ্ঞেস করলাম, "ও আবার আসবে ?"

হেলেন উত্তর দিল, "জানি না। ও কিন্তু খুব জিদ করছে। তুমি চলে এলে কেন ? যাতে আমরা নিভৃতে কথা বলতে পারি ?"

উত্তর দিলাম, "তা নয়, হেলেন। ওকে আর সহ্য করতে পারছিলাম না।"

ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হেলেন জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ ?"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "বিরক্ত, কেন ?"

জর্জ চলে যাওয়ার পর মনে হল, হয়ত আমার উপর বিরক্ত হয়েছ। আমাকে বিয়ে না করলে তোমার কপালে এ ঝঞ্ঝাট হত না।

আমি উত্তর দিলাম, "না করলেও হতে পারত। বরং তোমাকে বিয়ে করে কম কষ্ট সইতে হয়েছে। শুধু তোমার খাতিরে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমাকে ইলেকট্রিক কাঁটা-তারের বেড়ার উপর ঠেলে দেয়নি, বা মাংস ঝোলানোর হুক থেকে ঝুলিয়ে রাখেনি। তোমার উপর বিরক্ত ? কি করে একথা ভাবতে পারলে ?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "হঠাৎ দেখলাম, ফিশারের ঘরের জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের তাজা রোদ চেস্টনাট পাতার ছাঁকনি ভেদ করে মেঝেতে এসে পড়েছে। সন্ধ্যাবেলায় মাথা-ধরার মত, আমার হিস্টিরিয়া উবে গেল। অনেক স্বাভাবিক হলাম। বুঝলাম আমি গ্রীষ্মের প্যারীতে, গ্রীষ্ম যেখানে আনন্দের বেসাতি খুলে ধরেছে। এই প্যারীতে মানুষকে ইঁদুরের মত গুলি করে মারার চিন্তা একেবারে উদ্ভট। হেলেনকে বললাম, "আমি বরং ভাবছিলাম, আমার উপর বিরক্ত হওয়ার, এমন কি আমাকে ঘৃণা করার কারণও তোমার আছে।"

হেলেন, "তোমাকে ঘেন্না করব ?"

আমি, "হ্যাঁ, হেলেন। কারণ, তোমার ভাইকে তাড়াতে পারিনি, কারণ······"

দুজনে মিনিট কয়েক চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর আমি বললাম, "এই ঘরের মধ্যে বসে থেকে কি হবে ?"

উপরে আমাদের ফ্ল্যাটে গেলাম। আমি বললাম, "হেলেন, জর্জ যা বলেছে, সত্যি। যুদ্ধ বাধলে আমরা বিদেশী শত্রু বলে গণ্য হব। তোমার বেলায় সে সম্ভাবনা বেশী।"

হেলেন ঘরের জানালা খুলতে খুলতে জবাব দিল, "মিলিটারি বুট আর ত্রাসের দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেছে। মুক্ত বায়ু আসুক। দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো, বাইরে কোথাও খাব।"

আমি বললাম, "চলো। প্যারী থেকে যাওয়ার সময়ও হয়েছে।"

হেলেন, "কেন ?"

আমি, "জর্জ পুলিশকে জানিয়ে দেবে।"

হেলেন, "ও ত' তোমার ভুয়া পাসপোর্টের কথা জানে না ?"
আমি, "ঠিক ধরে নেবে। ও আবার আসবে।"
হেলেন, "আসুক। আমি ওকে সামলাব।"

*　　*　　*　　*

শোয়ার্থস্ বলছিলেন, "আমরা আইন মন্ত্রণালয়ের পিছনে একটি ছোট রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। গোমাংস, সালাদ এবং কফি দিয়ে খাওয়া সারলাম। এখনো পাঁউরুটি-গুলির মাথার সোনালী আর কফিপেয়ালার গায়ের রঙ স্পষ্ট মনে পড়ে। খুব পরিশ্রান্ত লাগছিল। তবু বিশ্বের কাছে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল গভীর, অন্ধকার, নোংরা নালায় পড়ে গিয়েছিলাম। এবার উঠে এসেছি। পিছনে তাকানোর সাহসটুকুও হারিয়েছি। কারণ, আমিও যে ঐ ময়লার অংশ। লাল-সাদা চেক কাটা টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিলে বসে মনে হচ্ছিল, স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছি। আর বীজাণুস্পর্শের ভয় নেই। মদের বোতলে সোনালী রোদ ঠিকরে পড়ছে। একরাশ ঘোড়ার বিষ্ঠার উপর শালিখ ঝগড়া করছে। রেস্তোরাঁ মালিকের পোষা বিড়ালটি পেটভর্তি করে খেয়ে ওদের দিকে অলসভাবে চেয়ে আছে। সামনের বাগান থেকে মৃদু বাতাস বইছে। স্বপ্নের মত সুন্দর জীবন।

খাওয়া শেষ করে মধুরঙের বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে একটি বড় জামাকাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। আগে কয়েকবার ওখানে দাঁড়িয়েছি। হেলেনকে বললাম, 'তোমাকে একটা জামা কিনে দিই ?"

হেলেন বলল, "যুদ্ধ বাধছে না ? এখন অত খরচ করবে ?"

আমি বললাম, "যুদ্ধ বাধছে বলে এখনই কিনব।"

"আচ্ছা।" হেলেন চুমু খেল।

দোকানে ঢুকে, রাস্তার দিকে চেয়ে বসলাম। একটু পরে দোকানদার পোষাকের রাশি হাজির করল। হেলেন একের পর আর এক পোষাক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অন্য মহিলাদের গলার আওয়াজ শুনছিলাম। চোখ ফিরিয়ে এক একবার হেলেনের নগ্ন বাদামী পিঠ দেখছিলাম। হেলেনকে পোষাক কিনে দেওয়ার আসল কারণ মনে পড়ায় ঈষৎ লজ্জা হচ্ছিল। এ যেন সে দিন, জর্জ এবং আমার অক্ষমতার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিদ্রোহ। নিজের সাফাই গাওয়ার বালসুলভ প্রচেষ্টা। অলস আত্মসমালোচনা বিঘ্নিত হল যখন দেখলাম, নতুন পোষাক পরে হেলেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট আর কালো রঙের খাটো টাইটফিটিং সোয়েটার গায়ে দিয়েছে। সানন্দে বললাম, 'চমৎকার ! এইটিই নাও।"

হেলেন বলল, "অত্যন্ত বেশী দাম।"

"দর্জি বলল পোষাকটি নামজাদা দোকানের মডেল অনুসারে তৈরী। বুঝলাম, এটি মোলায়েম মিথ্যা। তাতে কিছু আসে যায় না। নতুন পোষাক নিয়ে খুশি মনে

দোকান থেকে বেরোলাম। আর্থিক ক্ষমতার বাইরে, এমন কিছু কেনার তৃপ্তি আছে। সহজেই মন থেকে জর্জের ছায়া মুছে গেল। হেলেন সেই সন্ধ্যায় পোষাকটি পরল। পরদিন রাতেও পরেছিল। দুজনে জানালার পাশে বসে চন্দ্রালোকিত প্যারীর পানে চেয়ে রইলাম। রাত কেটে গেল।

একাদশ

শোয়ার্থস্ বলতে লাগলেন, "সে স্মৃতির কতটুকু আছে? এর মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে আসছে। কালের যতিরেখাও অস্পষ্ট। ল্যাণ্ডস্কেপগুলি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। শুধু পড়ে আছে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আলোকের নিচে একটি চিত্র। চিত্রটিও সুসম্বন্ধ নয়। স্মৃতির অন্ধকার নির্ঝরিণী থেকে উঠে আসা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছায়ামূর্ত্তি মাত্র ঃ হোটেলের জানালা, একটি নগ্ন পিঠ, বাতাসে ভাসা প্রেতের মত কয়েকটি ফিসফিস করে বলা কথা, সবুজ ছাদে আলোর প্রতিফলন, রাতে নদীর গন্ধ, নতরদাম্ গীর্জার ধূসর পাথরের উপর চাঁদের আলোর খেলা এবং ভক্তিমাখা ওর মুখ, পীরেনীজ পাহাড়ের কোলে আর এক মুখ, সব শেষে ওর শক্ত হয়ে যাওয়া মুখ, যা আগে কখনো ওরকম দেখিনি---আমার সব স্মৃতি আবছা করে দিচ্ছে, যেন বাকিগুলি মায়া আর ভুল।"

শোয়ার্থস্ মাথা তুললেন। বিষাদক্লিষ্ট মুখে জোর করে হাসি আনার চেষ্টা স্পষ্ট। নিজের মাথার দিকে দেখিয়ে বললেন, "কী আর আছে এখানে? মনটারও এখন ঘুণধরা আলমারির অবস্থা। কিছুই ওখানে অক্ষত থাকবে না। তাইত আপনাকে এ কাহিনী শোনাচ্ছি। আপনার কাছে এ কাহিনী সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে স্মৃতি একে মুছে দেবে। কিন্তু আপনার স্মৃতি আপনাকে বাঁচানোর জন্য একে মুছে দেবে না। আমি অযোগ্য, অপটু। এখনো সেই শক্ত হয়ে যাওয়া মুখ ক্যান্সারের মত অন্য স্মৃতিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু····· কিন্তু অন্য মুখগুলিও ত' আসল। ওরা আমাদের জীবন, আমাদের চেনা। সেই অচেনা, অসহ্য শেষ শক্ত মুখ ···· "

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা প্যারীতে রয়ে গিয়েছিলেন?"

শোয়ার্থস্ উত্তর দিলেন, "জর্জ আর একবার এসেছিল। আমি ঘরে ছিলাম না।" ও প্রথমে আবেগ দিয়ে, পরে ধমক দিয়ে চেষ্টা করেছিল। হোটেল থেকে বেরোবার মুখে আমাকে থামিয়ে বলল, "জঘন্য কীট কোথাকার! আমার বোনটাকে শেষ করে দিচ্ছে! আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমাদের দুজনকেই ধরব। তারপর বন্ধু, নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করবে। অবশ্য তখনো যদি তোমার বাক্‌শক্তি থাকে।"

আমি বললাম, "সেটা সহজেই অনুমেয়।"

জর্জ, "কিছুই অনুমান করতে পারছ না। যদি পারতে, সরে দাঁড়াতে। আর একটি সুযোগ দিচ্ছি। আমার বোন যদি তিন দিনের মধ্যে অস্‌নাব্রুকে ফিরে যায়,

তোমার সব অপরাধ ভুলে যাব। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে। আমার বক্তব্য মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি ?"

আমি, "কোনদিনই তোমার বক্তব্যের সূক্ষ্মতার অপবাদ ছিল না।"

জর্জ, "তাই নাকি ? যাক, ভুলো না, আমার বোনের ফিরতেই হবে। ও অসুস্থ। না জানার ভাণ করো না। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। বুঝলে শুয়ারের বাচ্চা ?"

ওকে ভাল করে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না, হেলেনকে দেশে ফেরাবার ছুতো হিসেবে ওকথা বলল, না সুইজারল্যান্ডে পালাবার যে অজুহাত হেলেন দেখিয়েছিল তার নির্দোষ পুনরাবৃত্তি করল। বললাম, "আমি সত্যিই ওর অসুস্থতার বিষয়ে কিছু জানিনা।"

জর্জ, "সত্যিই জান না ! মিথ্যুক ! ওকে শীগগির ডাক্তার দেখানো দরকার। মার্টেন্স জানে। ওকে লিখলেই জানতে পারবে।"

দুটি লোক হোটেলের লবির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে আসছিল। জর্জ বেরোতে বেরোতে বলল "মাত্র তিন দিন। অন্যথায় তোমার প্রাণনাশের দেরী হবে না। আমি শীগগির ফিরব। এবার আসব ইউনিফরম পরে।" ও লোক দুটির মধ্যে দিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল।

লোক দুটি লবিতে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আমার আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। হেলেন জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, "জর্জের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"হয়েছে। ওর মত, অসুস্থতার জন্য তোমার জার্মানী ফিরতেই হবে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে হেলেন উত্তর দিল, "অসম্ভব। কিছুতেই ফিরব না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার অসুখ করেছে ?"

ও বলল, "পুরো মিথ্যা। জার্মানী থেকে বেরোবার জন্য অসুস্থতার ছল করেছি।"

আমি বললাম, "জর্জ বলছিল, মার্টেন্সও তোমার অসুস্থতার কথা জানে।"

হেলেন হেসে জবাব দিল, "অবশ্যই জানে। মনে নেই, এ্যাস্‌কোনায় থাকতে মার্টেন্স একটা চিঠি লিখেছিল ? এ সমস্ত ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছিলাম।"

"তুমি তাহলে অসুস্থ নও ?"

"আমাকে অসুস্থ দেখায় ?"

"অসুস্থ দেখায় না বটে, কিন্তু সেটাই সব নয়। তুমি সত্যিই অসুস্থ নও ?"

হেলেন অধীর হয়ে উত্তর দিল, "না আমার অসুখ করেনি। জর্জ আর কি বলল ?"

"সেই পুরানো ধমক। তোমাকে কি বলল ?"

"একই কথা। মনে হয় না, আবার আসবে।"

"ও আসলে কি জন্য এসেছিল ?"

অদ্ভুত হেসে হেলেন উত্তর দিল, "জর্জ মনে করে আমি এখনো ওর সম্পত্তি। ও ভাবে ও যা বলবে, আমি তাই করতে বাধ্য। ছেলেবেলা থেকে ও ঐরকম, ভাইরা প্রায়ই ওরকম হয়। ওর ধারণা, পরিবারের মঙ্গলের জন্য ও এসব করছে। ওকে ঘৃণা করি।"

"ঐ জন্য ?"

"ঘৃণা করি, এই যথেষ্ট। ওকে ও বলেছি। তবে, ওর ধারণা, যুদ্ধ হবেই।"

দুজনে চুপ করে রইলাম। রাস্তায় যানবাহনের শব্দ ক্রমে তীব্রতর হল আইন মন্ত্রণালয়ের পিছনে একটি গীর্জা আকাশের দিকে মাথা তুলল। সমুদ্রের গর্জন সত্ত্বেও যেমন সামুদ্রিক পাখীর কলরব শোনা যায়, পথের কোলাহল ভেদ করে সান্ধ্য খবর-কাগজ-ওলাদের হাঁকাহাঁকি কানে এল। আমি বললাম, "তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই, হেলেন।"

"জানি।"

"ওরা হয়ত তোমাকে কয়েদ করবে, হেলেন।"

"তোমাকে কী করবে ?"

"হয়ত আমাকেও করবে। কিন্তু দুজনকে একসাথে রাখবে না।"

হেলেন মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি বললাম, "বুঝতেই পারছ, ফরাসী জেলগুলি আর যাই হোক, অবসর যাপনের শ্রেষ্ঠ স্থান নয়।"

"জার্মান জেল ?"

"জার্মানীতে তোমাকে জেলে পুরবে না। সেকথা তুমিও জান।"

অধৈর্য্য হয়ে হেলেন বলল, "আমি এখানেই থাকব। আমাকে সাবধান করে তুমি কর্ত্তব্য পালন করেছ। এখন এ ব্যাপারটা ভুলে যাও। এর পর এ ব্যাপারে তোমার কোন দায় নেই। সোজা কথা, কিছুতেই ফিরব না।" আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ও উদ্ধত-ভাবে বলল, "নিরাপত্তা চুলোয় যাক। অনেক আগেই আমার সাবধান থাকায় ঘেন্না ধরেছে।"

এক হাত দিয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে বললাম, "ওকথা বলা সহজ, হেলেন······"

আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে বলল, "আর জ্বালিও না। তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না, দায়িত্বও নিতে হবে না। নিজের দায় নিজেই বইতে পারব।" ও এমনভাবে তাকাল, যেন জর্জের সঙ্গে কথা বলছে। ও আবার বলল, "মুর্গী মায়ের স্বভাব ছাড়ো। কিছু বোঝ না! সব দুশ্চিন্তা, ভয় আর দায়িত্ববোধ নিজের উপর প্রয়োগ করো। আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি তোমার কথায় আসিনি। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এসেছি।"

"জানি, হেলেন।"

এবার ও খুব কাছে এসে বসল। অত্যন্ত নরম সুরে বলল, "বিশ্বাস করো, আর জার্মানীতে থাকতে পারছিলাম না। একাই পালাতাম। শুধু ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। বুঝতে চেষ্টা করো, লক্ষ্মীটি, নিরাপত্তাই জীবনের সব নয়।"

"ঠিক বটে, হেলেন, তবু যাকে ভালবাসি তার নিরাপত্তা চিন্তা এড়াতে পারি না।"

ও বলল, "নিরাপত্তা বলে সত্যি কিছু নেই। আমাকে বলতে দাও, লক্ষ্মীটি। আমি জানি···তোমার থেকে ভালই জানি। তুমি বুঝবে না, এ ব্যাপারে কত চিন্তা করেছি। দোহাই তোমার, এ প্রসঙ্গ ছাড়ো! চল, বাইরে প্যারীর সন্ধ্যা আমাদের ডাকছে।"

"একান্ত যদি জার্ম্মানী ফিরতে না চাও, অন্ততঃ সুইজারল্যান্ডে থাকতে পার?"

হেলেন উত্তর দিল, "জর্জ্জ বলেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের সৈন্য যেমন বেলজিয়ামে ঢুকেছিল, নাজিরা এবার সেইভাবে সুইজারল্যান্ডে ঢুকবে।"

"জর্জ্জ সব জানে না।"

হেলেন, "বরং এখানেই থাকা যাক। হয়ত যুদ্ধ বাধবে না। হাজার হোক, জর্জ্জ কি করে জানবে, ঠিক কখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে? আগেও যুদ্ধের সম্ভাবনা হয়েছিল। তারপরই মিউনিখ চুক্তি। দ্বিতীয় মিউনিখ চুক্তি হতে পারে না?"

বুঝতে পারলাম না, হেলেনের উক্তি বিশ্বাসপ্রসূত, না কেবল মনকে শান্ত করার জন্য বলা। আশার সাথে বিশ্বাস মিললে, বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। সেই সন্ধ্যায় আমার বিশ্বাসও দৃঢ়তর হয়েছিল। ভাবলাম, ফ্রান্সের কোন প্রস্তুতি নেই, যুদ্ধ কি করে করবে? তাছাড়া, যে ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্ম্মান আক্রমণের প্রতিবাদও করেনি, পোলদের পক্ষে সে কি করে লড়াই করবে?

"দশ দিন পর বর্ডার বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ শুরু হল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি যুদ্ধ বাধার সাথে সাথে গ্রেফতার হয়েছিলেন, মিঃ শোয়ার্থস্?"

"এক সপ্তাহ পর। নির্দ্দেশ পেলাম, যেন শহর ত্যাগ না করি। সে এক অদ্ভুত পরিহাস। বিগত পাঁচ বছর ওরা আমাদের শুধু তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। হঠাৎ পট পরিবর্ত্তনের ফলে ওরা আর কোথাও যেতে দেবে না। আপনি তখন কোথায়?"

উত্তর দিলাম, "প্যারীতে।"

"আপনাকেও ভেলড্রোমের জেলে আটকে রেখেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আমি, কিন্তু আপনার মুখ মনে করতে পারছি না।"

"ভেলড্রোমের হাজার হাজার রিফিউজির মধ্যে আমাকে চিনে রাখা সম্ভব নয়, মিঃ শোয়ার্থস্।"

"মনে পড়ে, যুদ্ধ শুরুর কয়েক দিন আগে প্যারী নিষ্প্রদীপ করা হয়েছিল?"

"মনে আছে, মিঃ শোয়ার্থস্। যেন গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "তখন রাস্তার ছোট ছোট নীল বাতি দেখে হাসপাতালের নৈশ আলোর কথা মনে পড়ত। মনে হত, গোটা শহর অসুস্থ। ভাবলাম, মৃত শোয়ার্থসের ছবিগুলির একটি বিক্রি করে হাতে কিছু নগদ টাকা রাখলে ভাল হয়। একজন চিত্রব্যবসায়ীর কাছে গেলাম। সে যৎসামান্য দাম দিতে চাইল। ওকে বেচলাম না। এক ধনী রিফিউজিকে বেচলাম। জার্ম্মানীতে থাকতে উনি চলচ্চিত্র-শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। উনি তখন নগদ টাকায় আস্থা হারিয়েছিলেন। তাই যা কিছু মূল্যবান দেখেন তাতেই টাকা লগ্নী করেন। আমার শেষ ছবিটি হোটেল মালিকের জিম্মায় রেখেছিলাম। তারপর একদিন বিকালে দুজন পুলিশ এল। ওরা হেলেনকে বিদায় জানাতে বলল।

হেলেন পাংশু মুখে, জলন্ত চোখে দাঁড়িয়েছিল। ও ফুঁসে উঠল, "এ অসম্ভব!" আমি বললাম, "এ রূঢ় বাস্তব। পরে ওরা তোমার খোঁজেও আসবে। পাসপোর্টগুলি সযত্নে রেখো। ফেলে দিও না।"

একটি পুলিশ পরিষ্কার জার্মান ভাষায় বলল, "হ্যাঁ। পাসপোর্টগুলি ঠিক রাখবেন।"

আমি বললাম, "ধন্যবাদ। অন্ততঃ বিদায় নেবার জন্য আমাদের একটু নিভৃতে কথা বলতে দেবেন?"

পুলিশটি দরজার দিকে তাকাল। বললাম, "ভয় নেই, পালাব না। সে মতলব থাকলে আগেই পালাতে পারতাম।" ও সম্মতি দিল। আমরা ঘরের ভিতর গেলাম। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, "বাস্তব আর স্বপ্ন কখনো এক হয় না, হেলেন।" ও ভেঙ্গে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "কি করে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব?"

"আমরা শেষ মুহূর্তের কয়েকটি জরুরী আলোচনা সেরে নিলাম। প্যারীতে যোগাযোগের নতুন ঠিকানা স্থির করলাম: আমাদের হোটেল, আর একটি ফরাসী বন্ধু। দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুললাম। পুলিশটি বলল, "দু এক দিনের ব্যাপার। একটি কম্বল আর সামান্য কিছু খাবার নিয়ে নিন।"

কিছু খাবার আর একটি কম্বল মুড়ে আমার হাতে দিয়ে হেলেন পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই কি দু-একদিনের ব্যাপার?"

ও উত্তর দিল, "বড় জোর এক কি দুই দিন। পরিচয়পত্রাদি পরীক্ষা করা হবে।"

"পরে ওকথা অনেকবার শুনতে হয়েছে।" শোয়ার্থস্ পকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললেন, "আশা করি এই পর্ব্বের সাথে আপনার পরিচয় আছে: থানার অপেক্ষা, ক্রমবর্দ্ধমান রিফিউজির ভিড়, তাদের সবাইকে বিপজ্জনক নাজির মত ঘিরে রাখা, ফসল বইবার গাড়িতে সদর পুলিশ দপ্তর যাত্রা, অবশেষে সেখানে অনন্তকাল অপেক্ষা। আপনাকে 'লেপিন হলে' যেতে হয়েছিল?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। 'লেপিন হল' প্যারীর পুলিশ সদর দপ্তরের একটি বিরাট হলঘর। ওখানে সাধারণতঃ পুলিশদের শিক্ষামূলক চলচিত্র দেখান হত। ঘরের ভিতর একটি সিনেমার পর্দা আর কয়েকশো লোক বসবার জায়গা আছে। আমি বললাম, "ওখানে আমার দুদিন থাকতে হয়েছিল। রাতে কয়লা রাখার একটা বড় জায়গায় বেঞ্চি পেতে শুতে দিত। সকালে ভূতের মত সারা গায়ে কালি মেখে উঠতাম।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "বেশ কয়েক রাত চেয়ারে বসে কাটাতে হয়েছিল। খুব নোংরা দেখাত। ওরা অবশ্য আগেই আমাদের জঘন্য অপরাধের আসামী ধরে নিয়েছিল। জর্জ শেষ পর্য্যন্ত জব্দ করলই। প্যারীর পুলিশ সদর দপ্তরের কোন কর্ম্মীর মাধ্যমে আমাদের ঠিকানা জুটিয়েছিল। তাকে আমাদের সাথে ওর সম্পর্ক এবং নিজের নাজিপার্টি সভ্যপদের কথাও বলে দেয়। ফলে, ওরা আমাকে নাজি গুপ্তচর মনে করল। দিনে চারবার

জর্জ' এবং নাজি পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতাম, আমার সাথে ওদের সম্পর্কের প্রসঙ্গটাই উদ্ভট। পরে বুঝলাম, উদ্ভট বলে কোন কিছু উড়িয়ে দেওয়া কত শক্ত। যুদ্ধ এবং আমলাতন্ত্রের চাপে, মুক্তির দেশ ফ্রান্সও তখন পাগল হয়ে গিয়েছে। মানুষ আর মানুষ নেই। মিলিটারির সাথে সম্পর্ক হিসাবে তখন মানুষের শ্রেণীবিভাগ হত: সৈনিক, সৈনিক হবার যোগ্য, শত্রু ইত্যাদি।

'লোপিন হলে' তৃতীয় দিন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের কয়েকজনকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হল। বাকি সবাই ঘুমানো, খাওয়া আর চাপা কথাবার্তা বলতেই ব্যস্ত। জীবনের অর্থ দাঁড়িয়েছিল, অতিপ্রয়োজনীয় কয়েকটি বস্তুমাত্র। তবু ভেঙ্গে পড়িনি। কারণ জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের তুলনায় ও কোন কষ্টই নয়। এখানে উত্তর দিতে দেরী করলে বড় জোর লাথি মারত বা জোরে ধাক্কা দিত। যা হোক, পুলিশ সব দেশেই প্রায় এক ধরনের হয়।

"জিজ্ঞাসাবাদের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়িছিলাম। সিনেমা দেখানোর উঁচু মঞ্চে পর্দার নিচে পাহারাদাররা সার বেঁধে বন্দুক হাতে, পা ছড়িয়ে বসে। মঞ্চের নিচে আমরা। জীবনের আর এক ভয়াবহ প্রতিকৃতি: আপনি হয় পাহারাদার, নয় বন্দী। শুধু শূন্য পর্দায় কি ধরনের ছবি দেখবেন, বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে: শিক্ষামূলক, মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত। অবশেষে রয়ে যাবে শূন্য পর্দা, তৃষিত হৃদয় এবং রাজশক্তির মূর্খ পাহারাদার – যারা নিজেদের মনে করে সদা নির্ভুল এবং অমর। এ পট কোনদিন পাল্টাবে না। হয়ত আমি একদিন নিঃশেষ হয়ে যাব, তবু তাতে কোথাও ইতর বিশেষ হবার সম্ভাবনা নেই। আপনারও বোধ করি অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে –যখন আশার মৃত্যু ঘটেছে……"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, "বরং বলুন নীরব আত্মহত্যার মুহূর্ত। সব প্রতিরোধ-শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। চিন্তা করে কাজ করা চলে না। মানুষ শেষ পদক্ষেপটিও তখন বিনা বিচারে, প্রায় দুর্ঘটনার মত করে ফেলে।"

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "হঠাৎ দরজা খুলে গেল। হলদে রোদ গায়ে মেখে একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। ওর এক হাতে ঝুড়ি, বগলে মোড়ক করা কিছু কম্বল, অপর হাতের কনুইতে চিতাবাঘের চামড়ার কোট। চলার ধরন দেখে চিনলাম। একটু স্থির হয়ে, দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিয়ে মানুষের সারির মধ্যে দিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে এগোল। পাশ দিয়ে চলে গেল, তবু আমাকে দেখতে পেল না। অস্নাব্রুকের গীর্জাতেও এই রকম হয়েছিল। আমি ডাকলাম, "হেলেন!"

ও পিছন ফিরল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ও রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল, "ওরা তোমার কী দশা করেছে?"

"বিশেষ কিছু করেনি। কয়লা রাখার জায়গায় ঘুমাতে হয়, তাই রঙ কালো হয়েছে। তুমি কি করে এলে?"

ও গর্বভরে বলল, "আমিও গ্রেফতার হয়েছি। অবশ্য অন্য মেয়েদের আগেই হয়েছি। জানতাম, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ·····"

"তোমাকে কেন গ্রেফতার করল ?"

"তোমাকে কেন করল ?"

"এরা আমাকে গুপ্তচর মনে করে।"

"আমাকেও মনে করে। কারণ, আমার চালু পাসপোর্ট আছে।"

"কি করে জানলে ?"

"একটু আগেই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ওরাই বলেছে। ওদের মধ্যে মাথায় পমেড মাখা একজন পুলিশ বলেছে, ওরা আমাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ পাসপোর্ট অনুযায়ী আমি প্রকৃত রিফিউজি নই।"

"যাক, কম্বলগুলি এনে বুদ্ধির কাজ করেছ, হেলেন।"

হেলেন হাতের ঝুড়ি খুলে বলল, "যে ক'টা কম্বল পেয়েছি, এনেছি। দু বোতল কগন্যাকও সঙ্গে এনেছি। কাজে লাগবে। এখানে খাবারের কী ব্যবস্থা ?"

"কিছু নেই বললেই হয়। কাউকে দিয়ে স্যান্ডউইচ আনালে,এরা আপত্তি করে না।"

হেলেন একটু ঝুঁকে আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "তোমাকে এক জাহাজ চালানি নিগ্রো ক্রীতদাসের একজন মনে হচ্ছে। স্নান করে পরিষ্কার হতে পারনি ?"

"এখনো পারিনি। তবে, তার জন্য এদের অব্যবস্থাই দায়ী। তা ও কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত নয়।"

ঝুড়ি থেকে এক বোতল কগন্যাক বার করে হেলেন বলল,"এসো, খাওয়া যাক। বুদ্ধি করে একটি গ্লাসও এনেছি— সভ্যতার প্রতি আমার আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। সভ্যতার জয় হোক !"

"হেলেন গ্লাসে কগন্যাক ঢালল। দুজনে খেলাম। আমি বললাম, "তোমার গায়ে গ্রীষ্ম আর মুক্তির গন্ধ লেগে আছে। বাইরে কি অবস্থা ?"

"শান্তির দিনগুলির মতই। কাফেগুলিও ভর্তি। আকাশ তেমনি নীল।" হেলেন এবার মঞ্চের উপর বসা বন্দুকধারী পাহারাদারদের দেখিয়ে বলল, "মেলায় 'বন্দুক-তাক করা, খেলা মনে পড়ল। একটি খড়ের তৈরী মানুষকে গুলি লাগাতে পারলে এক বোতল মদ বা একটি সুন্দর এ্যাশট্রে লাভ।"

"এক্ষেত্রে তফাত, খড়ের মানুষগুলির হাতেই বন্দুক।"

ঝুড়ি থেকে হেলেন একটি চিঠি বার করল। বলল, "হোটেলের মালিকানী শুভেচ্ছা জানিয়েছে !" তারপর কয়েকটি ছুরি এবং কাঁটা হাতে নিয়ে আবার বলল, "সভ্যতার জয় হোক।" হেলেনকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হল। তখনো যুদ্ধ বাধেনি। হয়ত আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে।

পরদিন বিকালে শুনলাম, আমাদের দুজনকে ভিন্ন জায়গায় রাখা হবে। আমাকে পাঠাবে কোলমবের ক্যাম্পে, হেলেনকে রোকেট জেলে। অন্য বিবাহিত নারী এবং পুরুষ বন্দীদেরও আলাদা রাখা হবে। একটি দয়ালু প্রহরীর অনুমতি নিয়ে আমাদের প্রকোষ্ঠে

দ'জন সারা রাত জেগে কাটালাম। ইতিমধ্যে অনেক বন্দীকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। আমাদের নিয়ে কয়েক শ' তখনো রয়েছে। কী নিদারুণ পরিহাস! ফ্যাসীবিরোধী ফ্রান্সে তখন অন্য ফ্যাসীবিরোধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল। ফ্যাসী জার্মানীর কথা মনে পড়ল।

হেলেন জিজ্ঞেস করল, "ওরা আমাদের দুজনকে আলাদা রাখবে কেন?"

"বলতে পারব না। মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত নিষ্ঠুরতাপ্রসূত নয়। এ এক ধরনের বোকামি।"

একজন স্পেনীয় বন্দী মাঝখানে বলল, "নারী এবং পুরুষ একসাথে রাখলে ঝগড়া, মারামারি বাড়বে। তাই আলাদা রাখবে।"

"চিতাবাঘের চামড়ার কোট পরে হেলেন আমার পাশে ঘুমাল। কয়েকটি গদি আঁটা বেঞ্চি ছিল। বয়স্ক মহিলারা তাতে শুয়েছিলেন। ওঁদের একজন হেলেনকে জায়গা দিলেন। ও শুতে চাইল না। ও বলল, "এর পর একা ঘুমোবায় সুযোগ অনেক পাব।"

সে এক অদ্ভুত রাত। ধীরে ধীরে কথাবার্তা থেমে গেল। বুড়িরাও হা হুতাশ থামাল। এক আধজন মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদেই ঘুমে তলিয়ে গেল। একে একে সব মোমবাতি নিভে গেল। হেলেন আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরছিল। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে আমাকে কানে কানে কিছু বলল। কখনো শিশুর মত, কখনো নতুন প্রেমিকার মত কথা বলছিল, যেকথা দিনে এমনকি অন্য অবস্থায় রাতেও কোন স্ত্রীলোক বলতে চায় না ঃ বিচ্ছেদ বেদনা, রক্তমাংসের কথা—যে রক্তমাংস বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় বিদ্রোহী হয়েছে। জগতের আদিম আর্তি—আমরা কেন একসাথে থাকতে পারব না, একজনকে আগে কেন যেতে হবে, মৃত্যু কেন আমাদের হাত ধরে টানছে, আমরা যখন অত্যন্ত ক্লান্ত, মৃত্যু তখনো কেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?

ক্রমে ওর মাথা আমার কাঁধ থেকে গড়িয়ে কোলের উপর পড়ল। ওর মাথার নিচে দুহাত পেতে দিলাম। নিভন্ত মোমবাতির আলোয় ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। শুনতে পাচ্ছিলাম, প্রস্রাবাদির জায়গা খুঁজে বার করার জন্য বন্দীদের কয়েকজন প্রায়ান্ধকারে ঠাহর করে করে কয়লার স্তুপের মধ্যে দিয়ে চলছে। অল্প আলোয় ওদের ছায়া অতিকায় দানবের আকার নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল। আলোর শেষ শিখাটি নিভে গেলে সর্ব্বগ্রাসী চাপা অন্ধকার নেমে এল। হেলেন একবার চমকে উঠে বলল, "আমি এখানে।" ওর কানে কানে বললাম, "ভয় নেই। সব ঠিক আছে।"

ও আমার হাতে চুমু খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, তুমি ত' আছ।" তারপর অস্ফুটে বলল, "সব সময় আমার সঙ্গে থেকো।"

ওর কানে কানে বললাম, "সব সময় তোমার সাথে থাকব। কখনো আলাদা হয়ে গেলেও, তোমাকে খুঁজে নেব।"

প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হেলেন জিজ্ঞেস করল, "আমাকে খুঁজে নেবে?"

"তোমাকে সব সময় খুঁজে নেব, হেলেন। যেখানেই থাক, তোমায় খুঁজে নেব।"

"আচ্ছা।" ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। কিন্তু ঘুমাল না। মাঝে মাঝে হাতের আঙুলের উপর ঠোঁটের ছোঁয়া পাচ্ছিলাম। একবার মনে হল, আমার হাতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু পড়েছে। ওকে কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না। ভাবলাম, ওকে আগে কখনো এত ভালবাসিনি। আমি নিশ্চুপ বসেছিলাম। প্রেম আমার সত্তা ছেয়ে দিয়েছিল। তারপর ফ্যাকাশে ধূসর ভোরের আলোয় হেলেনের মুখ দেখে মনে হল, ও মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। বাঁচানোর জন্যই ওকে জাগাতে হবে। ও চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কফি আর পাঁউরুটি পাওয়া যায়?"

মহানন্দে বললাম, "একটি পাহারাওলাকে ঘুষ দিয়ে দেখছি, যোগাড় করা যায় কিনা।"

"হেলেন চোখ খুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কি? রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে, লটারি জিতেছ? এবার আমাদের ছেড়ে দেবে নাকি?"

আমি বললাম, "ওরা ছেড়ে দেবে কিনা জানি না, আমি নিজেকে মুক্তি দিয়েছি।"

হেলেনের মাথা তখনো আমার হাতের চেটোর উপর রয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, "ঐ ভাবে কিছু শান্তিও পেতে পার না?"

উত্তর দিলাম, "ঠিক বলেছ। ঐ ভাবেই বেশ কিছুকাল শান্তি পেতে হবে। আমার মন দিয়ে যদি দেখতে চেষ্টা করো, তাতে কিছু স্বস্তি পাবে সন্দেহ নেই।"

হেলেন হাই তুলে বলল, "স্বস্তি খুঁজলে সব কিছুতেই সারা জীবন স্বস্তি পাওয়া যায়। ওরা আমাদের গুপ্তচর হিসাবে গুলি করে মারবে?"

"না। আপাততঃ বন্দী করে রাখবে।"

"যেসব রিফিউজিকে গুপ্তচর মনে করেনি তাদেরও বন্দী করে রাখবে?"

"এরা যাকে ধরতে পারবে তাকেই গ্রেফতার করবে। ইতিমধ্যে পুরুষ রিফিউজিদের গ্রেফতার শেষ হয়েছে।"

হেলেন এবার প্রায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে গুপ্তচরের সঙ্গে অন্য রিফিউজির কী তফাত?"

"অন্য রিফিউজিদের হয়ত আগে ছেড়ে দেবে।"

"তা বলা যায় না। হয়ত গুপ্তচর বলেই আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।"

"এ দুরাশা, হেলেন।"

হেলেন সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "দুরাশা নয়, অভিজ্ঞতা। তুমি কি জান না, এই শতাব্দীতে নিরপরাধই জঘন্যতম অপরাধী এবং কঠিনতম সাজা পায়? ভেবেছিলাম, দুটি দেশে গ্রেফতার হয়ে চৈতন্য হয়েছে? হয়ত তোমার সুবিচারের স্বপ্ন! আর কগন্যাক আছে?"

"কগন্যাক আর কেক আছে।"

হেলেন বলল, "দুইই দাও। মনে হচ্ছে, আমাদের কপালে অনেক এ্যাভভেঞ্চার আছে।"

ওকে কগন্যাক দিয়ে বললাম, "তোমার জীবনদর্শন মন্দ নয়।"

"ঐটিই একমাত্র রাস্তা। তুমি কি বিরক্তি সয়ে মরতে চাও? সুবিচারের স্বপ্ন দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে, সব যন্ত্রণা এ্যাডভেঞ্চার মনে করা সম্ভব। আমার কথা মানছ?"

কগন্যাকের মদিরা এবং কেকের মিষ্টি সুবাস হেলেনকে ঘিরে আনন্দের বৃত্ত রচনা করল। ও মহানন্দে খাচ্ছিল। আমি বললাম, "ভাবতে পারিনি, এ অত্যাচার তুমি এত সহজভাবে নেবে।'

ঝুড়ি থেকে কিছু পাঁউরুটি তুলে নিয়ে, ও উত্তর দিল, "আমার জন্য ভেবো না। আমি ঠিক চালিয়ে যাব। তোমার এবং স্ত্রীলোকের কাছে ন্যায় বিচারের অর্থ এক নয়।"

"তা হলে কিসের মূল্য স্ত্রীলোকের কাছে সর্ব্বাধিক?"

"এই জিনিষের",—ও আঙ্গুল দিয়ে পাঁউরুটি, কেক এবং কগন্যাকের বোতল দেখিয়ে বলল, "খেতে থাকো, প্রিয়তম। আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। দশ বছর পর চলার যোগফলের নামকবণ হবে এ্যাডভেঞ্চার। তার প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনা পরে বন্ধু-বান্ধবের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারবে। এখন যদি প্রাণভরে খেয়ে নাও। প্রিয়তম, যা খেয়ে নেবে, তা বয়ে বেড়াতে হবে না।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "আপনাকে যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে বলছি। সে সময় রিফিউজিদের দুর্গতির কথা আপনি ভালই জানেন। কোলমবের শিবিবে আমার অল্পদিন থাকতে হয়েছিল। হেলেনকে ওরা রোকেট বন্দীশালায় পাঠাল। কোলমবের শিবিরেব শেষ দিনে প্যারীর হোটেলমালিক হাজির হল। ওকে দূর থেকে দেখলাম। আমাদেব কথা বলার অনুমতি ছিল না। ও একটি কেক এবং এক বোতল কগন্যাক রেখে গেল। কেকের মধ্যে একটি চিঠি: "আপনার স্ত্রী সুস্থ এবং ফুর্তিতে আছেন। উনি বিপদমুক্ত। আশা করছেন ওঁকে পীরেনীজ্ পাহাড়েব কোলে নির্ম্মীয়মান নারীবন্দী শিবিরে পাঠানো হবে। আমাদের হোটেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।" হেলেনের চিঠিও পেলাম: "চিন্তা করো না। বিপদ কেটে গেছে। এখনো এ্যাডভেঞ্চার মনে হয়। শীগগির দেখা হবে। ভালবাসা নাও।"

"অনেক বাধা অতিক্রম করে ও চিঠিটি পাঠিয়েছে। আন্দাজ করতে পারলাম না, ও কি করে পারল। পরে জেনেছিলাম: ও পুলিশ সদর দপ্তরে বলেছিল, হোটেলে কিছু অতিপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলে এসেছে। একটি পুলিশের পাহাবায় ওকে কাগজপত্র আনতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ও তখন হোটেল মালিকের হাতে চিঠিটি এবং আমার কাছে পৌঁছাবার নির্দেশ তার কানে কানে বলে দেয়। পুলিশটির মনে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি দুর্ব্বলতা ছিল। তাই, সে ইচ্ছা কবেই পিছন ফিরে রইল ততক্ষণ। হেলেন হোটেল থেকে ফিরল কাগজপত্রের বদলে সেন্ট, কয়েক বোতল কগন্যাক এবং ঝুড়ি-ভর্ত্তি খাবারদাবার নিয়ে। বড় খেতে ভালবাসত। অবাক লাগত, এত খেয়েও কি করে স্লিম থাকত। আমাদের সুদিনে, রাতে ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় ওর জায়গা ফাঁকা দেখলেই বুঝতাম, হেলেন কোথায়। ও তখন ঘরের এক কোণে মহা তৃপ্তিতে মাংসের হাড় চিবুচ্ছে

আর মদ দিয়ে গলা ভেজাচ্ছে। চাঁদনী রাতে ওর হাসিমুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। বিড়ালের মত ওর খিদে পেত গভীর রাতে।

মিথ্যা অছিলায় হোটেলে ফেরার দিন পুলিশটি ওকে অত্যন্ত তাড়া দিচ্ছিল। হোটেলের মালিকানী তখন সুস্বাদু কেক সেঁকছিল। হেলেন সেই গরম গরম কেক না নিয়ে কিছুতেই ফিরবে না। শেষে পুলিশকে অপেক্ষা করতে হল। হেলেন ক'টি গরম কেক নিয়ে ফিরল। সঙ্গে কিছু কাগজের গামছাও নিতে ভোলেনি।

পরদিন আমাদের গাড়িভর্ত্তি করে পীরেনীজ্ পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলল। শুরু হল ত্রাস, আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা, হতাশা, পলায়ন, মিলন এবং প্রেমের মহাকাব্য।

দ্বাদশ

শোয়ার্থস্ বলছিলেন, "ভবিষ্যতে হয়ত বর্ত্তমান যুগ পরিহাসের যুগ বলে অভিহিত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস নয়। অপরিশোধিত শিল্পোন্নতি এবং সাংস্কৃতিক অবনতির মূঢ় কুটিল পরিহাস। এ যুগে হিটলার শুধু মুখেই বলেন না তিনি শান্তির পয়গম্বর, এবং অন্য দেশগুলি তাঁর দেশের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, - একথা তিনি বিশ্বাসও করেন। তাঁর সাথে পাঁচ কোটি জার্ম্মান একথা বিশ্বাস করে। সারা ইউরোপে একমাত্র জার্ম্মানীই যে সমরসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে, তাতে জার্ম্মান জাতির বিশ্বাসের ব্যত্যয় হয় না। অপর পরিহাসটি হল আমরা যারা জার্ম্মান ক্যাম্প থেকে পালাতে পেরেছিলাম শেষে পেঁছিলাম ফরাসী ক্যাম্পে। তাতে অবশ্য নালিশের বিশেষ কিছু নেই। কারণ, যে দেশ মরণপণ করে লড়ছে, রিফিউজিরা সুবিচার পেল কিনা সে বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার ছিল না। আমাদের অত্যাচারও করেনি, গুলি করে কিংবা গ্যাস চেম্বারে খুনও করেনি। কেবল কয়েদ করে রেখেছিল। আর কি চাই?"

জিজ্ঞেস করলাম, "কতদিন পরে আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা হল?"

"অনেকদিন দেখা হয়নি। আপনাকেও কি লে ভেরনে আটকে রেখেছিল?"

"না। আমাকে ওখানে রাখেনি। কিন্তু আমি জানি, লে ভেরন ছিল ফরাসী ক্যাম্প-গুলির মধ্যে জঘন্যতম।"

শোয়ার্থস ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "ওটা একটা মাত্রার কথা। লে ভেরন অবশ্য সর্বোত্তম জার্ম্মান ক্যাম্প থেকে অন্ততঃ হাজারগুণ ভাল ছিল,— যেমন আমরা গ্যাস-চেম্বারওলা থেকে গ্যাসচেম্বারবিহীন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ভাল বলি।"

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কি হল?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "অল্পদিনের মধ্যেই শীতকাল এল। যথেষ্ট কম্বল ছিল না, কয়লা মোটেই ছিল না। জমাট বাঁধা শীতে কষ্ট সহ্য করা আরও কঠিন। আমি অবশ্য ক্যাম্পে শীত-কষ্টের উপাখ্যান শুনিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। বরং কিছু পরিহাসের বৃত্তান্ত শোনাব।

"আমি এবং হেলেন নিজেদের নাজি বলে স্বীকার করলে দুর্ভোগ কম হত—আমাদের বিশেষ ক্যাম্পে পাঠাত। আমরা যখন অর্দ্ধাশনে, উদরাময়ে ভুগতাম এবং শীতে জমে যেতাম, তখন খবরকাগজে জার্মান বন্দীদের ছবি দেখতে পেতাম। ওরা রিফিউজি নয়। ওদের কাঁটা চামচ, চেয়ার টেবিল, খাট এবং কম্বল দেওয়া হত। এমন কি তাদের পৃথক খাবার মেসও ছিল। কাগজগুলি গর্বভরে বলত, দেখ ফ্রান্স শত্রুদের সাথে কত ভাল ব্যবহার করছে। আমাদের অত আরামে রাখার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরা ত' বিপজ্জনক নই।

ধীরে ধীরে মানিয়ে নিলাম। হেলেনের পরামর্শমত সুবিচারের আশা জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যায় নিজের বাঙ্কে বসতাম। বাঙ্ক আসলে তিন ফুট চওড়া এবং ছয়ফুট লম্বা খড়ের গদি। সমস্ত ব্যাপারটি জীবনের পরিবর্ত্তনের এক পর্ব্ব বলে ধরে নিয়েছিলাম, যার সাথে আমার সত্তার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু পারিপার্শ্বিক ঘটনা অনুসারে চতুর জন্তুর মত প্রতিক্রিয়ার তারতম্য হত। সুবিচারের আশা তখন বিলাসিতার স্বপ্ন। ভগ্ন হৃদয় যে কোন রোগ থেকে সহজে মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি তখন বিশ্বাস করতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "কষ্ট করে অভ্যাস করতে হয়েছিল। ছোটখাট অবিচারগুলি—যেমন আমার ভাগে পড়ত ছোট রুটি, বেশী ভারী কাজ ইত্যাদি—অধিকতর পীড়া দিত। তবু এসব দৈনন্দিন অবিচার বার বার ভুলতে চেষ্টা করেছি, নচেৎ বৃহত্তর অবিচারের কথা ভুলে যেতাম।"

"সুতরাং ধীরে ধীরে চতুর জন্তুর মত প্রাণধারণ করতে শিখলেন?"

হেলেনের প্রথম চিঠি পাওয়ার আগে পর্য্যন্ত তাই করেছি। অর্থাৎ দুই মাস। প্যারীর হোটেল মারফৎ চিঠিটি পেয়েছিলাম। পেয়ে মনে হল, চাপা অন্ধকার ঘরের একটি জানালা কেউ খুলে দিয়ে গেল। বুঝলাম, অন্ততঃ ক্যাম্পের বাইরে জীবন নামে একটি বস্তু তখনো বিরাজমান। ওর চিঠিগুলি অনিয়মিতভাবে আমার হাতে পৌঁছাত। কখনো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটিও পেতাম না। বিশ্বাস করুন, চিঠিগুলি পেয়ে হেলেনের ভাবমূর্ত্তির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটত। ও জানিয়েছিল, ভাল আছে। ওকেও একটি ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। প্রথমে ক্যাম্পের রসুইঘরে, পরে দোকানে কাজ পেয়েছে। দুবার কিছু খাবারও পাঠিয়েছে। অবশ্য তার জন্য কী চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছিল, জানি না। চিঠিতে নতুন নতুন মুখ দেখতে পেতাম। অল্প কয়েকটি চিঠিই যদি বন্দীর সাথে পৃথিবীর একমাত্র যোগসূত্র হয়, তার বাণী তখন অনৈসর্গিক আকার ধারণ করে। স্বাভাবিক সময় যে চিঠির কোন বিশেষ অর্থ নেই, ঐ অবস্থায় তাই হয় বহু সপ্তাহের উত্তাপের ভাণ্ডার। তখন পত্রলেখকের লেখা অলেখা খুঁটিনাটি রোমন্থনের পালা শুরু হয়। একটি চিঠির সাথে ওর ফটো পেলাম। হেলেন একটি পুরুষের সাথে ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়ে। লিখেছে, লোকটি ফরাসী, ক্যাম্পের দোকানে কাজ করে।

কত সন্দেহভরে লোকটির ছবি দেখলাম ! একজন বন্দী ঘড়িওলার আতসী কাঁচ ধার করে দেখলাম ! বুঝলাম না, হেলেন কেন ছবিটা পাঠাল। হয়ত কিছু না ভেবেই পাঠিয়েছে। তাই কি ? কিছু বুঝতে পারলাম না। কখনো এমন সমস্যায় পড়েছেন ?"

উত্তর দিলাম, "এ হল মার্কামারা বন্দীর মনোবিকার। সব বন্দীকেই ভুগতে হয়েছে।

বারের মালিক ইতিমধ্যে বিল নিয়ে হাজির হল। আমরাই শেষ অতিথি। শোয়ার্থস জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের যাওয়ার মত আর কোন রেস্তোরাঁ খোলা আছে, কিনা।" ও একটি ঠিকানা দিয়ে বলল, "সেখানে অনেক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরীও পাওয়া যায়। খরচা বেশী নয়।"

শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোন জায়গা খোলা আছে ?"

এত রাতে আর কোন বার বা রেস্তোরাঁ খোলা নেই। যদি ঐখানে যান, নিয়ে যেতে পারি। আমার হাতে কোন কাজও নেই। তবে, ওদের মেয়েগুলি বড় শয়তান। আমি অবশ্য চোখ রাখব, ওরা যাতে ঠকাতে না পারে।

শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে মেয়ে ছাড়া বসতে দেয় না ?"

"মেয়ে ছাড়া !" ও হতভম্ব। তারপর একগাল হেসে বলল, "মেয়ে ছাড়া বসবেন : ঠিক আছে। কিন্তু ওদের ওখানে শুধু মেয়েই আছে।"

বিল চুকিয়ে রাস্তায় পা দিলাম। তখন প্রাক্ ঊষা। সূর্য্য ওঠেনি, তবু বাতাসে সমুদ্রের নোনা গন্ধ তীব্রতর হয়েছে। খোলা জানালা থেকে ঘুম এবং কফির গন্ধ সমুদ্রের বাতাসে মিশছে। রাস্তার বাতিগুলি নিষ্প্রয়োজন বোধে নিভিয়ে দিয়েছে অল্প কয়েকটি মোটর গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে সমুদ্রের বুকে জেলে ডিঙিগুলি ঢেউয়ের তালে নাচছে। সামনে নদীর মোহানায় জাহাজটি নোঙ্গর করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার শেষ আশার তরী। ভোরের ইশারায় ওর বাতিগুলিও নিভে গেছে।

আমরা গন্তব্যস্থলে পেঁছিলাম। এটি একটি ন্যক্কারজনক বেশ্যালয় বলা চলে পাঁচটি নোংরা ধূমশো ধূমশো মেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে তাস খেলছিল। ওরা কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে অবশেষে আমাদের রেহাই দিল। আমি ঘড়ি দেখছিলাম শোয়ার্থস্ বললেন, "আমার কাহিনী আর বিশেষ বাকি নেই। তাছাড়া দূতাবাসগুলিও ন'টার আগে খোলে না।" ওকথা আমিও জানতাম। কিন্তু তখন প্রায় ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পেঁছেছি।

শোয়ার্থস্ শুরু করলেন, "এক এক সময় এক বছর সময় মনে হয় অনন্তকাল বছর কাটলে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, কত তাড়াতাড়ি কেটে গেল ! ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে আমরা ক্যাম্পের বাইরে কাজ করছিলাম। প্রথম পালানোর চেষ্টা করে দুদিন পরে ধরা পড়লাম। ফলে, কুখ্যাত লেফটেন্যাণ্ট জীন শাস্তিস্বরূপ ঘোড়া চড়ার চাবুক দিয়ে মুখের উপর ঘা কতক দিলেন। তার উপর জল আর পাঁউরুটি বরাদ্দ নিয়ে নির্জন ঘরে তিন সপ্তাহ বন্দী হলাম। দ্বিতীয় চেষ্টায় প্রায় সাথে সাথে ধরা পড়লাম। অতঃপর

পালানোর আশা ত্যাগ করলাম কারণ, রেশন কার্ড এবং পরিচয়পত্রাদি বিনা বাইরে ঘোরাফেরা তখন অসম্ভব। আর, হাজার চেষ্টাতেও ত' হেলেনের ক্যাম্পে পৌঁছতে পারব না!"

এর পরই অবস্থার পরিবর্তন হল। ১৯৪০-এর মে মাসে আসল যুদ্ধ শুরু হয়ে চার সপ্তাহে শেষ হল। আমাদের ক্যাম্প জার্মান অনধিকৃত এলাকায়। তবু গুজব রটল, জার্মান মিলিটারি কমিশন, এমন কি গেস্টাপোর দল ক্যাম্প পরিদর্শন করতে আসবে। ফলে, ক্যাম্পে অবর্ণনীয় ত্রাসের সঞ্চার হল। আশা করি, আপনারও সেকথা মনে আছে।

বললাম, "হ্যাঁ। ভালই মনে আছে। ঐ খবর রটার সাথে সাথে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেল। বন্দীদের থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে গাদা গাদা দরখাস্ত পড়ল। দরখাস্তে, আমাদের আগে মুক্তি দেওয়ার আবেদন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শ্লথতার দরুন সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হল। তবে, এক আধজন ক্যাম্প পরিচালক নিজ দায়িত্বে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু বেচারারা হয় মার্সাই বা অন্য কোন বর্ডারে আবার ধরা পড়ল।"

"মার্সাই!" শোয়ার্থস্ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন, "ততক্ষণে আমি এবং হেলেন ছোট ছোট বিষভর্ত্তি শিশি পেয়ে গিয়েছি। ক্যাম্পের এক কম্পাউন্ডার আমাকে শিশিদুটি বেচেছিল। ওতে কোন বিষ ছিল জানি না। কিন্তু ও যখন বলল, এক শিশি খেলেই প্রায় বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হবে, ওর কথা বিশ্বাস করে দু'শিশি কিনলাম। পাছে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে ও নিজে খেয়ে ফেলে, এই ভয়ে কম্পাউন্ডার শিশিদুটি বেচেছিল।"

কেউ আশা করেনি, ফ্রান্স অত তাড়াতাড়ি হারবে। মনে হল, যা কিছু ছিল সব জার্মানীর কাছে খোয়া গেছে। আমরা যেন সমুদ্রের দিকে পিছন করে জার্মানদের সাথে লড়ছিলাম। যুদ্ধে হেরে, আমাদের ভরসা কেবল সমুদ্র।

ভাবছিলাম, আমারও ভরসা সমুদ্র। সেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জাহাজ আমেরিকা পেঁছয়।

দরজার সামনে আগের বারের মালিক একটু হেসে মিলিটারি কায়দায় ছদ্ম স্যালুট করল। তারপর একটি মোটাসোটা বেশ্যার কানে কানে কি যেন বলল। এইবার অতিকায় স্তনযুগলের অধিশ্বরী আমাদের টেবিলে এসে জিজ্ঞেস করল, "বলুন, কি ভাবে করব?"

শোয়ার্থস্, "কি?"

বারমালিক হেসে বেশ্যাটিকে বলল, "এমনভাবে করো যাতে খুব ব্যথা লাগে।"

শোয়ার্থস্ তেমনি আনমনাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কি?"

"যেভাবে নাবিকরা সমুদ্রের মধ্যে করে, সেইভাবে করো না," এই বলে বার মালিক স্থূল হাসি হাসতে লাগল।

ভাবলাম, ব্যাপারটা আর গড়াতে দেওয়া ঠিক নয়। বেশ্যাটিকে ডেকে বললাম, "প্রফেসর শুধু শুধু তোমাকে খেলাচ্ছেন। আমরা কেউ মুনি ঋষি নই। দুজনেই ইথিওপিয়ার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ওখানে আমাদের খোজা করে দিয়েছে।"

বেশ্যাটি জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ইটালিয়ান?"

আমি "এক কালে ছিলাম। বর্ত্তমানে খোজা, যাদের কোন দেশ নেই। আমরা বিশ্ব-নাগরিক।"

ও একটু চিন্তা করে, বিড়বিড় করে বলল, "খোজা, খোজা আবার ব্যাটাছেলে নাকি ?" শেষে বিশাল নিতম্বের ঢেউ তুলে দরজার কাছে ফিরে গেল। বার মালিক ওর হাতে হাত মিলাল।

শোয়ার্থস্ আবার শুরু করলেন, "হতাশায় মানুষের সব গরিমা ধূলিস্যাৎ হয়। সে আত্মপরিচয় ভুলে যায়। তবু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা পরিস্থিতিতেও বাঁচতে তাগিদ দেয়,—নগ্ন প্রাণধারণের তাগিদ। তুফানের কেন্দ্রে শান্তির মত মানুষ নিরাশার মাঝে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে থাকে। সে কিন্তু অলীক শান্তি, বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি। তাই দেখি, যার চারপাশে তুফান বইছে, সে নিজে শান্ত, সমাহিত। ভয় তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারছে না। পারিপার্শ্বিক আবিলতার মাঝে সে স্বচ্ছতার কেন্দ্রবিন্দু। সেই সময় আমার নিজেকে মনে হত, অহংত্যাগী এক যোগী……"

অর্দ্ধ বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলাম, "ভগবানকে খুঁজতে ?"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, "ভগবানকে পেতে। আমরা পোষাকের বোঝা গায়ে, অমন কি পূর্ণ সমর সম্ভারে সজ্জিত হয়ে সাঁতার কাটার মত, ভগবানকে খুঁজে বেড়াই। নিরাপদ প্রবাসজীবন ছেড়ে বিপজ্জনক স্বদেশে ফিরবার পথে রাইন নদ পেরোতে যেমন উলঙ্গ হয়েছিলাম, ভগবানকে পেতে হলে সেই রকম উলঙ্গ হতে হয়। রাইন নদই তখন আমার ভাগ্যস্বরূপ, চন্দ্রালোকিত এক ফালি জীবন।"

"ক্যাম্পে থাকাকালীন প্রায়ই ঐ রাতটি মনে পড়ত। তাতে শক্তি ফিরে পেতাম। কারণ, রাইন পার হয়ে আমি জীবনের দাবি মিটিয়েছি। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদস্বরূপ হেলেনের সাথে দ্বিতীয় জীবন ফিরে পেয়েছি। ক্যাম্প জীবনে যে মাঝে মাঝে অত মরীয়া হয়ে উঠতাম, প্রায়ই রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত, তারও মূলে ঐ রাইন অতিক্রমণ। আপন মনে ভাবতাম, প্যারীর দিনগুলি এবং হেলেনের কথা। একাকীত্বের অস্বস্তি দূর হয়ে যেত। মনে হত, হেলেন নিশ্চই বেঁচে আছে। হয়ত আবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তবু, ও বেঁচে আছে এটুকু ভেবে শান্তি পেতাম। জীবন যখন পায়ের নিচে পিঁপড়ের মত অনিশ্চিত, যাকে ভালবাসি সে বেঁচে আছে এটুকু ভাবতে পারাও কত বেশী মনে হত।"

শোয়ার্থস্ একটু চুপ করলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলেন ?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "আয়নায় মুখ দেখেছি।"

"কার মুখ ?

শোয়ার্থস্ বললেন, "আপনি নিজের মুখ চেনেন ? ইহজন্মের আগের মুখ চিনতে পারবেন ?"

বিস্ময়ে শোয়ার্থসের দিকে তাকালাম। উনি আবার বললেন, "আয়নায় যখন মুখ দেখেন, একটি দুটি করে অনেক মুখ উঁকি দেয়। শেষে দেখা যায় রয়ে গেল আয়না,

আপনি আর আয়নায় আপনার মুখেরই অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। না, আমি ভগবানের দেখা পাইনি। কিন্তু, পেলে কী করতাম? দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বাদ দিতে হত।"

একটু হেসে শোয়ার্থস্ আবার শুরু করলেন, "তা ছাড়া, ভগবানকে দেখতে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং সময়ের অভাব ছিল। আমি ছিলাম অতি নগন্য। যা ভালভাসতাম সে সম্পর্কে ভাববার ক্ষমতাটুকুই আমার ছিল। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঐটুকুই যথেষ্ট। ভগবান এবং সুবিচারের চিন্তা ক্রমে ত্যাগ করলাম। ঐ অবস্থায় অধিক চিন্তা নিষ্প্রয়োজন, অসম্ভবও বটে। ঘটনা প্রবাহ তখন স্বয়ংচালিত হয়ে আপন পথ ঠিক করে নেয়। হাস্যকর নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিনিধিত্ব থেকে মানুষ তখন বেনামা ঘটনাস্রোতের শরিকে রূপান্তরিত। অদৃশ্য হাত পিঠে চাপ দিয়ে বলবে "ভাসতে শুরু করো," সেই মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তখন নির্দেশ মানার পালা, জিজ্ঞাসাবাদ শেষ। হয়ত ভাবছেন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি ”

মাথা নেড়ে বললাম, "আপনার ঐ ভাবটির সাথে আমি পরিচিত। দুরূহ বিপদে মানুষের ঐ ভাব স্বাভাবিক। সৈন্যদের মুখেও এরকম কথা শুনেছি। ওরা বলে, কোন অদৃশ্য হাত হাতছানি দিয়ে তাদের পরম নিরাপদ ট্রেঞ্চের বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। পর মুহূর্তেই গোলার আঘাতে ট্রেঞ্চটি কবরখানায় পরিণত হয়।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "শেষে এক অসম্ভব কান্ড করলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিছু করছি। আগে দুবার রাতের অন্ধকারে পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়েছিলাম। সুতরাং প্ল্যান পাল্টালাম। জিনিষপত্র গুছিয়ে একটি প্যাকেট করলাম। একদিন সকালে প্যাকেটটি সাথে নিয়ে মেন গেটে গেলাম। গেটে দুজন পাহারাদার ছিল। ওদের বললাম, "আমি মুক্তি পেয়েছি।" মৃত শোয়ার্থসের পাসপোর্ট মেলে ধরলাম। তার সাথে পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, "আমার মুক্তির আনন্দে মদ্যপান করো।" ওরা পরোয়ানা দেখতে চাইল না। জোয়ান চাষাদুটি কি করে বা ভাববে, যার মুক্তি পরোয়ানা নেই সে লোক কোন সাহসে মেন গেট দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পের বাইরে পা বাড়াতে চাইবে?

বাইরে এসে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, ক্যাম্পের গেটটি অতিকায় ড্রাগনের মত চোয়াল মেলে ধরতে আসছে। তবু দৌড়ালাম না। শোয়ার্থসের পাসপোর্টটি মুড়ে পকেটে রেখে দিয়ে শান্তভাবে চলতে লাগলাম। বাতাসে তখন রোজ্‌মেরী আর থাইম্ ফুলের গন্ধ,—মুক্তির গন্ধ। কিছুদূর গিয়ে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধার অছিলায় পিছন ফিরে দেখলাম। না, কেউ পিছু নেয়নি। জোর পায়ে হাঁটা শুরু কবলাম।

সেই সময় আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ছিল না। ভরসা, ভাল ফরাসী ভাষা জানি। আমাকে ফ্রান্সের কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী মনে করা সম্ভব। গোটা দেশই তখন পালাতে ব্যস্ত। শহরগুলিতে জার্মান-অধিকৃত এলাকার আশ্রয়প্রার্থী গিজগিজ করছে। রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের দৌড়াদৌড়ি। তাদের মাথায় মোট বোঝাই: বিছানা, বাসনপত্র এমন কি যুদ্ধপালানো সৈনিক।

একটি সরাইখানায় পেঁছিলাম। সরাইখানার বাইরে এক ফালি ফল আর তরকারির বাগান। খাবার ঘরের মেঝেতে চলকে পড়া মদ এবং তাজা রুটি আর গরম কফির গন্ধ মিশে একাকার। একটি মেয়ে আমাকে পরিবেশন করল। প্রথমে টেবিলে টেবিলক্লথ বিছিয়ে কফিপাত্র, কাপপ্লেট, রুটি এবং মধু সাজাল। এমন বিলাস প্যারী ত্যাগের পর আর উপভোগ করিনি!

বাইরে ভেঙ্গে দুমড়ে যাওয়া দুনিয়া কোন রকমে গড়িয়ে চলেছে। সরাইখানায় গাছের নিচে ছোট্ট ছায়ায় শুধু মৌমাছির গুঞ্জন, গ্রীষ্মশেষের সোনালী রোদের কম্পন আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। আমি সে শান্তি আকণ্ঠ পান করলাম, মরুপথ অতিক্রম করতে উট যেমন গলায় জল সঞ্চয় করে রাখে।

ত্রয়োদশ

স্টেশনে একটি পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে পিছন ফিরলাম। যদিও ক্যাম্প থেকে অন্তর্ধান তখনো হয়ত কারো নজরে পড়েনি, তবু রেল স্টেশন থেকে তফাতে থাকা শ্রেয় মনে হল। কাঁটাতারের বেড়ার ভিতর থাকাকালীন বন্দীর প্রতি নজর দেওয়ার ফুরসৎ বিশেষ কারো নেই। বেড়া টপকালেই সে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা অর্জন করে। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে তার দৈনিক বরাদ্দ একটি মাত্র রুটি। অথচ পালানো বন্দীকে ধরতে যে কোন খরচাই অত্যধিক গণ্য হয় না। এমন কি একটি বন্দীকে ধরতে এক কোম্পানী সৈন্যও মোতায়েন করা হয়ে থাকে।

একটি চলতি ট্রাকে উঠে পড়লাম। ড্রাইভারের পাশে বসলাম। ও পালা করে যুদ্ধ, জার্মানী, ফরাসী সরকার, আমেরিকা এবং ভগবানকে গাল দিল। দুপুর বেলায় ওর খাবার দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম। তারপর এক সময় নেমে গেলাম।

এক ঘন্টা হেঁটে পরের স্টেশনে পেঁছিলাম। খুব স্বাভাবিক ভাবে কাউন্টারে একটি ফার্স্টক্লাস টিকিট চাইলাম। টিকিট ক্লার্ক ইতস্তত করছিল। মন্থরগতিতে কাজ করার জন্য চোটপাট করতে, ও অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে টিকিট দিল। কাগজপত্র দেখতে চাইল না। কফির দোকানে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক ঘন্টা পরে ট্রেন এল।

তিন দিনে হেলেনের ক্যাম্পে পেঁছিলাম। পথে একটি ফরাসী পুলিশ আমার গতি রোধ করতে, হেঁকে জার্মান ভাষায় কিছু বললাম এবং শোয়ার্থসের পাসপোর্টটি দূর থেকে খুলে দেখালাম। ও ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। শোয়ার্থসের পাসপোর্টে অস্ট্রীয় সরকারের শীলমোহর অঙ্কিত। সেই অস্ট্রিয়া তখন জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রীয় পাসপোর্ট আর গেস্টাপোর ভিজিটিং কার্ড সমান ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম।

হেলেনের ক্যাম্পে ঢুকতে হলে একটি পাহাড় পেরোতে হয়। পাহাড়ের গোড়ায় ছোটখাট বনজঙ্গল, অসংখ্য কাঁটাগাছ আর রোজমেরী গাছ। তার পর ঘন জঙ্গল। জঙ্গল

পার হয়ে কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা ক্যাম্প। বেড়ার ধারে যখন পেঁছিলাম, বিকাল প্রায় শেষ হয়েছে। ওখানে বেড়া লে-ভেরন ক্যাম্পের মত ঘন এবং ভয়াবহ নয়। বোধহয় স্ত্রীলোকের ক্যাম্প বলেই ঐ শিথিলতা। জঙ্গলে লুকিয়ে দেখছিলাম, মেয়েরা বর্ণাঢ্য পোষাক পরে ঘোরাফেরা করছে। সর্ব্বত্র একটা নিরুদ্বিগ্ন ভাব।

ঐ দৃশ্য দেখে একটু দমে গেলাম। আশা করেছিলাম, ঐটিও আমাদের ক্যাম্পের মত নিরানন্দ নির্ব্বাসন পুরী হবে এবং ডন কুইক্‌জোটের মত আমি সেই ক্যাম্প অভিযান করব। কিন্তু এমন সুন্দর জায়গায় হেলেনেব আর আমাকে কিজন্য দরকার হবে? ও নিশ্চয় বহুকাল আগেই আমাকে ভুলেছে!

বেড়ার কাছাকাছি লুকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যা হতে একটি স্ত্রীলোক বেড়ার কাছে এল। ক্রমে আরও কয়েকজন তার সাথে যোগ দিল। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে বেড়ার অপব পাবে কিছু খুঁজছিল। রাত হল। ঘোমটাপরা বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠল। রাতেব আঁধারে স্ত্রীলোকগুলি অবয়ব এবং বর্ণ বর্জ্জিত ছায়ার রূপ নিল। ধীরে ধীরে ওদেব দল হাল্কা হতে লাগল। ওরা ক্যাম্পে ফিরে চলল। একটি ছায়ামূর্তি তখনো বেড়ার ধাবে দাঁড়িয়েছিল। সাবধানে ওর কাছে গিয়ে ফরাসী ভাষায় বললাম, "ভয় পাবেন না।"

স্ত্রীলোকটি "ভয়! কিসের ভয়?"

আমি, "আপনাকে একটা কথা বলব?"

স্ত্রীলোকটি, "চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। তোর মাথায় ও ছাড়া কিছু নেই?"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী বলছেন, যা তা?"

স্ত্রীলোকটি, "ঢের হয়েছে! আর ন্যাকামি করতে হবে না। ঘরে মা বোন নেই। এখানে ঘুর ঘুর করছিস কেন?"

অবশেষে বুঝলাম। বললাম, "ভুল বুঝবেন না। আমি এই ক্যাম্পের একটি মহিলাব সাথে কথা বলতে চাই।"

স্ত্রীলোকটি, "তোরও এই মতলব। একটি কেন, সব ক'টি মেয়েলোকের সাথে কথা বল না?"

আমি, "দয়া করে শুনুন। এই ক্যাম্পে আমার স্ত্রী আছে। আর সাথে কথা বলতে চাই।"

স্ত্রীলোকটি এবার হেসে ফেলল। আর রাগ নেই, কিন্তু ক্লান্তি স্পষ্ট। এবার সুব পাল্টিয়ে বলল, "আপনিও ঐ দলে? রোজই আপনাদের মত মানুষ নতুন নতুন ফন্দি আর ছুতা নিয়ে হাজির হয়।"

আমি, "আমি আগে কখনো আসিনি।"

স্ত্রীলোকটি, "আগে না এসেও ও' ফন্দিগুলি চটপট শিখে নিয়েছেন দেখছি।"

"আমার কথা শুনবেন কিনা?" জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, "আমি শুধু চাই, আপনি ক্যাম্পের একটি মহিলাকে জানিয়ে দিন যে, আমি এসেছি। আমি জার্মান। এত-কাল লে-ভেরনের ক্যাম্পে বন্দী ছিলাম।"

স্ত্রীলোকটি এবার শান্তভাবে জবাব দিল, "আপনি আর একটু বেশী চতুর। আপনি আসলে আলসাস অঞ্চলের ফরাসী। ওরা সবাই জার্মান জানে। আপনাদের সিফিলিস রোগে মরণ হয় না কেন ? আপনাদের মত শুয়োরের মনে কি একটুও দয়া মায়া নেই ? আপনারা আর কী চান ? আমাদের বন্দী করে আশ মেটেনি ? দোহাই আপনাদের, আমাদের বিনা উপদ্রবে থাকতে দিন !" শেষের দিকে ও চেঁচাচ্ছিল।

আরও কিছু পায়ের শব্দ শুনে লাফিয়ে জঙ্গলে লুকোলাম। সেই রাতটা গাছের উপর শুয়ে কাটালাম। ক্রমে রুপালী চাঁদের আলো ফিকে হয়ে গেল। পাহাড়গুলি কুয়াশায় ঢেকে গেল। সকালে গ্রামে গিয়ে আমার একটি স্যুটকে মিস্তিরির আলখাল্লার সাথে বিনিময় করলাম।

মিস্তিরির আলখাল্লা পরে ক্যাম্পের গেটে হাজির হলাম। পাহারাদারকে বললাম, বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করতে এসেছি। ফরাসী ভাষাজ্ঞান এখানেও কাজে লাগল। ও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে ক্যাম্পে ঢুকতে দিল।

সযত্নে চারপাশের রাস্তাগুলি দেখে নিলাম। ব্যারাকগুলি দোতলা বাড়ি। প্রত্যেক বন্দীর একটি করে পৃথক ঘর। ঘরের সামনে পর্দা ঝুলছে। কোন কোন ঘরের পর্দা উঠানো। সেই সুযোগে ভিতরে উঁকি দিলাম। ঘরে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ছাড়া কিছু নেই। এক আধটি ঘরে টেবিলের উপর ফটো বা পোস্টকার্ড'ও রয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোন খবর আছে ?"

"হ্যাঁ, আছে, হেলেন নামে একজনের জন্য। হেলেন বোম্যান।"

স্ত্রীলোকদু'টি একটু চিন্তা করল। একজন জিজ্ঞেস করল, "দোকানে যে নাজি শুয়োরের বাচ্চাটা কাজ করে ও নয় ত' ? ক্যাম্পের ডাক্তারের সঙ্গে যে বেশ্যাগিরি করে ঐ নাজি মাগিটাই ত' হেলেন ?

আমি বললাম, "হেলেন নাজি নয় শুনেছি।"

প্রথম স্ত্রীলোকটি বলল, "দোকানে যে মেয়েলোকটি কাজ করে সেও নাজি নয়।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কেউ নাজি আছে ?"

নিশ্চয় আছে। সব মিলে মিশে আছে। জার্মানরা কতদূর এগিয়েছে ?"

আমি জার্মানদের দেখিনি।

স্ত্রীলোকটি বলল, "শুনেছি একটি জার্মান মিলিটারি মিশন এদিকে আসছে। আপনি কিছু শুনেছেন ?"

বললাম, "না, শুনিনি।"

ও আবার জিজ্ঞেস করল, "জার্মান মিলিটারি মিশন আসার কারণ, ওরা এখানকার নাজিদের মুক্ত করবে। ওদের সাথে গেস্টাপোও আছে। এ সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ?"

উত্তর দিলাম, "না, শুনিনি।"

স্ত্রীলোকটি এবার জিজ্ঞেস করল, "শোনা যাচ্ছে, জার্মান অনধিকৃত এলাকা নিয়ে মাথা ঘামাবে না ?"

উত্তর দিলাম, "এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।"

ও জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু শোনেননি ?"

আমি, "শুধু গুজব শুনেছি।"

স্ত্রীলোকটি, "হেলেন বোম্যানকে কে খবর পাঠিয়েছে ?"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "ওঁর স্বামী। তিনি মুক্তি পেয়েছেন।"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি হেসে বলল, "ওর দেখছি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আমি ক্যাম্পের দোকানে যেতে পারি ?"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি, "কেন পারবেন না ? আপনি ত' ফরাসী ?"

আমি, "হ্যাঁ। আমি আলসাসের অধিবাসী।"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি, "ভয় লাগছে ? আপনার কাছে গোপনীয় কিছু আছে নাকি ?"

আমি, "আজকাল কার কাছে থাকে না, বলুন ?"

প্রথম স্ত্রীলোকটি আমাকে আধ অন্ধকার ব্যারাকগুলির মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বারান্দার দুই পাশে স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে দেখল। যেন আমাজন নদীর মত বিশাল বক্ষশালিনীদের কলোনিতে বেড়াতে এসেছি। তারপর হঠাৎ চোখ ধাঁধানো রোদে রাস্তায় পড়লাম।

আগে কখনো হেলেনের সততা বা অসততার কথা ভাবিনি। ক্যাম্প জীবনে এ চিন্তা ছিল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সে সময় আসল সমস্যা ছিল প্রাণধারণ। লে ভেরনের ক্যাম্পে ও চিন্তা হয়ত ক্ষণিক অবসরের মাঝে উঁকি দিয়েছে, পাকাপাকি ভাবে মনে বসতে পারেনি। কিন্তু ক্যাম্পে ওব সঙ্গিনীদের দেখে মনে হল, বন্দীদশা ওদের নারীত্ব দমাতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত ওদের নারীত্ব আরও সজাগ হয়েছে। বন্দী হলেও ওরা নাবী, নারীত্ব একমাত্র সম্বল।

দোকানে পৌঁছলাম। একটি লাল চুল, ফ্যাকাশে স্ত্রীলোক কাউন্টারে খাবারদাবার বেচছিল। জনকয়েক ক্রেত্রীও আছে। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, "কী চাই ?" উত্তর না দিয়ে, ইশারায় জানালাম, ওর সাথে গোপনে কথা বলতে চাই। চট করে খরিদ্দারের হিসাব করে, ও উত্তর দিল, "পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ভাল, না মন্দ ?"

বুঝলাম, ও জানতে চায় কি ধরনের খবর আছে। বললাম, "ভাল।" দোকানেব বাইরে গেলাম।

একটু পরে ও বেরিয়ে এসে বলল, "খুব সাবধান ! কার জন্য খবর আছে ?'

আমি, "হেলেন বোম্যানের জন্য। উনি কি এখানে আছেন ?"

স্ত্রীলোকটি, "কেন ?"

আমি উত্তর দিলাম না। মেয়েটির চোখ মুখ কুঁচকে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, "উনি কি এই দোকানে কাজ করেন না ?"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী চান ? কে খবর পাঠিয়েছে ? আপনি কি ইলেকট্রিক মিস্তির ?"

হেলেন বোম্যানের স্বামী খবর পাঠিয়েছে।

স্ত্রীলোকটি, "বেশী দিন হয়নি একটি লোক আর একজন মহিলা সম্পর্কে এই ধরনের খোঁজখবর করেছিল। মহিলাটি কথা দিয়েছিল, কী হয় আমাদের জানাবে। তারপর সব চুপচাপ। আপনি নিশ্চয় ইলেকট্রিক মিস্তিরি নন।"

আমি, "আমি হেলেন বোম্যানের স্বামী।"

স্ত্রীলোকটি, "আপনি হেলেন বোম্যানের স্বামী হলে, আমি বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গারবো।"

আমি, "হেলেনের স্বামী না হলে, তার খোঁজ নেব কেন, বলুন ?"

স্ত্রীলোকটি, "এর আগেও অনেক অদ্ভুত লোক হেলেন বোম্যানের খবর নিতে এসেছে। সত্যি কথা শুনতে চান ? হেলেন আর ইহজগতে নেই। মারা গিয়েছে। দু' সপ্তাহ আগে ওকে কবর দেওয়া হয়েছে। মনে করেছিলাম, আপনি এ খবর জানেন।"

আমি, "ও মারা গেছে ?"

স্ত্রীলোকটি, "হ্যাঁ। এবার আমাকে যেতে দিন।"

আমি, "ও মারা যায়নি। ব্যারাকগুলিতে বলল না, হেলেন মারা গিয়েছে ?"

স্ত্রীলোকটি, "ব্যারাকে ওরা অনেক বাজে কথা বলে।"

স্ত্রীলোকটিকে এবার ভাল করে দেখে, বললাম, "যাবার আগে আপনার হাতে একটি চিঠি দিতে চাই। হেলেনকে দিয়ে দেবেন ?"

স্ত্রীলোকটি, "কি জন্য ?"

আমি, "কি জন্য আবার ? চিঠি ত' আপনাকে কামড়াবে না ! লেখবার কিছু দিতে পারেন ?"

স্ত্রীলোকটি, "টেবিলের উপর কাগজ পেনসিল রয়েছে। কিন্তু মৃত লোককে চিঠি লিখে কি লাভ ?"

আমি, "এটাই সর্ব্বাধুনিক ফ্যাশন।" এক খণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে বড় বড় করে লিখলাম, "হেলেন, আমি এসেছি। আজ রাতে বেড়ার ধারে অপেক্ষা করব।" চিঠিটা না মুড়েই স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়ে বললাম, "হেলেনকে দিয়ে দেবেন।"

স্ত্রীলোকটি, "পৃথিবীতে পাগলের সংখ্যা বেড়েছে দেখছি।"

আমি "চিঠিটা হেলেনকে দেবেন কি না ?"

স্ত্রীলোকটি, "আমি দিতে পারব না।"

চিঠিটি টেবিলের উপর রেখে বললাম, "অন্ততঃ ছিঁড়ে ফেলবেন না।" ও উত্তর দিল না। আমি আবার বললাম, "যদি জানতে পারি এ চিঠি হেলেনকে দেননি, ফিরে এসে আপনাকে খুন করব।" ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিলাম। পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, „হেলেন এখানে আছে, না নেই ?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল না। এবার বললাম, "আমি দশ মিনিট পরে আবার আসব। তখন উত্তর চাই।"

বলা বাহুল্য, ওকে একটুও বিশ্বাস করিনি। ক্যাম্পের রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ালাম। ভাবছিলাম, ওকে পরিচয় বলে ভুল করেছি। এখন লুকোবার উপায় নেই। রাস্তার উপর একটি দরজায় টোকা মারলাম। একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল "কি চাই ?"

আমি বললাম, "ইলেকট্রিক লাইন চেক করতে এসেছি। কোন গোলমাল আছে ?"

না। তেমন কোন ইলেকট্রিকের গোলমাল নেই।

স্ত্রীলোকটির পরনে নার্সের পোষাক দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি হাসপাতাল ?"

হ্যাঁ। আপনার হাসপাতালের ইলেকট্রিক লাইন চেক করার কথা ?

হ্যাঁ। মালিক আমাকে হাসপাতালের ইলেকট্রিক সারকিট চেক করতে পাঠিয়েছে।

ভিতরে আসুন।

ইতিমধ্যে একটি ইউনিফরম পরা লোক এসে স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি হচ্ছে ?"

স্ত্রীলোকটি ওকে আমার হাসপাতালে পদার্পণের কারণ জানাতে, ও বলল, "ইলেক-ট্রিক ত' ঠিকই আছে, কিছু ভিটামিন আর ওষুধ পাঠালে কাজ হত।" মাথার টুপি খুলে টেবিলের উপর রেখে, ও চলে গেল।

কয়েকটি তার পরীক্ষার অভিনয়ের পর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ ভদ্রলোক কে ?"

"এখানকার ডাক্তার।"

আমি, "এখানে কত রোগী থাকে ?"

"অনেক।"

আমি, "মৃত্যুর হার কি রকম ?"

"ওকথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

আমি, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম। এই ক্যাম্পে সবাই এত সন্দেহপ্রবণ কেন ?"

"সন্দেহপ্রবণ নয়, শুধু ঈর্ষা। এখানে গত চার সপ্তাহে কোন মৃত্যু হয়নি। তার আগে অবশ্য অনেক হয়েছে।"

চার সপ্তাহ আগে আমি হেলেনের চিঠি পেয়েছি। সুতরাং ও নিশ্চয় বেঁচে আছে। ওকে বললাম, "ধন্যবাদ।"

স্ত্রীলোকটি, "আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না ঈশ্বরকে দিন। কারণ তিনি আপনাদের এমন একটি দেশে জন্ম দিয়েছেন, যে দেশ বর্তমানে দুর্দশাগ্রস্ত হলেও চিরকাল ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। অথচ আপনারাই আমাদের মত হতভাগ্য মানুষগুলিকে এমন নেকড়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন যে এযাবৎ আপনাদের কেবল সর্বনাশ করেছে। আপনি নিজের কাজ করুন। বাতি জ্বালিয়ে যান। তাতে যদি আপনাদের কর্তাদের মগজে ছোট ছোট বাতিও জ্বলে !"

"জার্মান মিলিটারি কমিশন এখানে এসেছিল?" আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম।

"আপনি কি করে জানলেন?"

আমি, "শুনেছি জার্মান মিলিটারি কমিশন এখানে আসতে পারে।"

"আপনার আনন্দ হচ্ছে?"

আমি, "না। আমি একজনকে সাবধান করতে চাই।"

"কাকে?"

আমি, "তার নাম হেলেন বোম্যান।"

"হেলেনকে কি সম্পর্কে সাবধান করতে চান?"

আমি, "আপনি হেলেনকে চেনেন?"

"কেন?" ওর গলায় অবিশ্বাসের সুর।

আমি, "আমি তার স্বামী।"

"প্রমাণ করতে পারেন?"

পারব না। কারণ, পাসপোর্টে আমার অন্য পদবী আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, "আমি ফরাসী নই। আমি জার্মান এবং হেলেনের স্বামী।"

"আপনার কাছে হেলেনের চিঠি আছে?"

আমি, "না। লে ভেরনের ক্যাম্প থেকে পালানোর সময় ছিঁড়ে ফেলেছি।"

এমন সময় ডাক্তার ফিরে এল। স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে তোমার কাজ মিটেছে?"

হ্যাঁ।

তবে আমার সাথে এসো। ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাজ শেষ হয়েছে?"

না। কাল আসতে হবে।

ক্যাম্পের দোকানে ফিরে গিয়ে দেখলাম, লালচুল স্ত্রীলোকটি তখনো কাউন্টারে কিছু বিক্রি করছে। দুজন খদ্দের দাঁড়িয়ে। একবার ভাবলাম, কপাল মন্দ। এই বেলা ফিরে গেলেই মঙ্গল। দেরী করলে গেটের পাহারা বদল হবে। হয়ত তখন ঝঞ্ঝাট হবে। কিন্তু কোথাও হেলেনের চিহ্ন চোখে পড়ল না। স্ত্রীলোকটি আমাকে না দেখার ভাণ করল। ক্রমে খদ্দেরের ভিড় বাড়ল। একটি অফিসারকেও দোকানের পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম। তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। যেন গেটের পাহারা তখনো বদল হয়নি। ওরা আমাকে চিনতে পেরে, অসুবিধা সৃষ্টি করল না। রাস্তায় পা দিয়ে ভয় হতে লাগল, কেউ ধরে ফেলবে না ত'?

বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক আসছিল। ভাবলাম, লুকাই। কিন্তু কোন লুকানোর জায়গা নেই। মাটিতে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। ট্রাকটি আমার পাশ দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে থামল। দৌড়ে পালানোর ইচ্ছা অতি কষ্টে চেপে রাখলাম। পিছন থেকে

পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। নিশ্চয় ধরতে আসছে। একজন হেঁকে উঠল, "এই মেক্যানিক!"

পিছন ফিরলাম। ইউনিফরম পরা মাঝ বয়সী একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, "আপনি মোটর গাড়ির কাজ জানেন?"

আমি ইলেকট্রিক মিস্ত্রির।

মনে হচ্ছে গাড়িটার ইগনিশনের গোলমাল হয়েছে। একবার দেখুন।

"হ্যাঁ। আপনি একবার দেখুন"। ড্রাইভার এবার যোগ দিল। সৈনিকটির পাশে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারবেশী হেলেন! অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। ফুল প্যান্ট আর সোয়েটার পরেছে। ঠোঁটে তর্জনী রেখে আমাকে সাবধান করে দিল। আমরা দু'জন সৈনিকটিকে বেশ কয়েক পা পিছনে ফেলে গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। ও চাপা গলায় বলল, "ভাণ করবে, তুমি গাড়ির কাজ খুব ভাল জান। গাড়ির সব ঠিক আছে। কোথা থেকে এসেছ?"

আমরা দু'জনে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বেশ শব্দ করে বনেট খুলে উত্তর দিলাম, "পালিয়েছি। কোথায় দেখা হবে?"

হেলেন আমার পাশে ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। ও উত্তর দিল, "ক্যাম্পের দোকানের জন্য সামনের গ্রামে কেনাকাটা করতে যাব। গ্রাম থেকে ফিরতে, বাঁ দিকে প্রথম যে কাফে পড়ে, সেখানে পরশু সকাল ন'টার সময় থেকো।"

আমি, "আর ইতিমধ্যে?"

সৈনিকটি এতক্ষণে গাড়ির কাছে পেঁছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "আর কতক্ষণ লাগবে?"

হেলেন নিজের পকেট থেকে ওকে সিগারেট দিয়ে বলল, "কয়েক মিনিটেই ঠিক হয়ে যাবে।" ও রাস্তার ধারে বসে সিগারেট খেতে থাকল। ইঞ্জিন দেখতে দেখতে হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ বেড়ার ধারে আসতে পারবে?"

হেলেন একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে। আসব। কিন্তু দশটার আগে পারব না।"

"তার আগে পারবে না কেন?"

"না। তার আগে হবে না। অন্য মেয়েদের নজর পড়বে।"

"এখানকার পাহারাদারগুলি কেমন?"

"খুব খারাপ নয়।" সৈনিকটি তখন গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে লক্ষ্য করে হেলেন ফরাসী ভাষায় বলল, "কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে।"

"পুরানো গাড়ি ত' তাই একটু দেরী হল," আমি হেসে বললাম।

সৈনিকটি হেসে উত্তর দিল, "এখন শুধু মন্ত্রীরা আর কর্তারা নতুন গাড়ি চড়ে। আমাদের কপাল মন্দ। হয়েছে?"

"হ্যাঁ," হেলেন জবাব দিল।

সৈনিকটি বলল, "ভাগ্যে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল। না হলে বড় মুস্কিল হত। আমি জানি, পেট্রোল ঢাললেই গাড়ি চলে!"

প্রথমে সৈনিকটি, তারপর হেলেন চড়ল। ড্রাইভারের সীটে বসে স্টার্ট দিয়ে, জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হেলেন বলল, "আপনি ফার্স্ট ক্লাস মেক্যানিক। ধন্যবাদ।" গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ নীল ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আমিও চলতে শুরু করলাম।

সন্ধ্যাবেলা জঙ্গলে লুকিয়ে দেখলাম, অনেকগুলি স্ত্রীলোক ক্যাম্পের বেড়ার ধারে অনেকক্ষণ জটলা করল। ওদের সবার দৃষ্টি বেড়া পেরিয়ে,—ওদের আশার জগত। ধীরে ধীরে ওরা ক্যাম্পে ফিরে গেল। অনেক পরে একটি ছায়ামূর্তি দেখলাম। ছায়া চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় ?"

"এই যে, এখানে হেলেন।" অন্ধকারে ঠাহর করে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "বেরিয়ে আসতে পারবে ?"

"ওরা চলে গেলে পারব। একটু অপেক্ষা করো।"

আবার জঙ্গলে লুকালাম। মাটিতে শুয়ে রইলাম। বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দে মনে হচ্ছিল, হাজার খানেক গোয়েন্দা ধরতে আসছে। ক্রমে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হল। বেড়ার পাশে হেলেনের কালো ছায়া, ছায়ার উপর দিকে সাদা মুখ দেখতে পেলাম। হেলেনের অদূরে আর একটি ছায়ামূর্তি দেখলাম। আরও দূরে আর একটি। তিনটি ছায়া যেন তিনটি দেবশিশুর মত দুঃখ বেদনার চন্দ্রাতপ বহন করছে। আমি চোখ বুজলাম।

চোখ খুলে দেখি দুটি ছায়া সরে গিয়েছে। শুধু হেলেনের ছায়া পা দিয়ে নিচের বেড়া চেপে ধরেছে। হাত দিয়ে উপরের বেড়া ফাঁক করার চেষ্টা করছে। কাছে এগোতে, ও আমাকে বেড়াটি ফাঁক করে দিতে বলল। চাপা গলায় বলল, "একটু দাঁড়াও।"

জিজ্ঞেস করলাম, "অন্য মেয়েগুলি কোথায় গেল ?"

"ওরা চলে গেছে। ওদের একজন নাজি। ওর জন্যই আগে আসতে পারিনি।"

বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলবার আগে হেলেন জামাকাপড় খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, "এগুলি ছিঁড়লে চলবে না। আর নেই।" বেড়ার বাইরে আসতে ওর কাঁধ চিরে গেল। রক্তের ক্ষীণ ধারা কাঁধ বেয়ে ওর নগ্ন পিঠে গড়িয়ে পড়ল। ও উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি পালাতে পারবে ?"

"কোথায় ?"

"কোথায় যাব ঠিক করিনি। ধর, স্পেন কিংবা আফ্রিকা ?"

"এসো সব কথা আলোচনা করব। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া এখান থেকে বেরোন অসম্ভব। সে জন্যই কর্তৃপক্ষ তত সাবধান নয়।"

আমরা জঙ্গলে লুকালাম। হেলেন আমার সামনে চলছিল। ও সম্পূর্ণ নগ্ন। ওর জামাকাপড় আমার হাতে। যে হেলেন প্যারীতে আমার দেহের তন্তুতে কামনার উদ্বেলতা এনেছিল, এ সে নয়। এ এক রহস্যময়ী সুন্দরী।

চতুর্দ্দশ

বারের মালিক এসে বলল, "মোটা মেয়েটা খুব চমৎকার, স্যার। ও ফরাসী। সব কলাকৌশল জানে। ফরাসী মেয়েরা চমৎকার হয় স্যার, আমাদের পর্তুগীজদের মত বিশ্রী নয়। লোলিটা বা জুয়ানকে নিতে বলব না, স্যার। দুটোর কোনটাই ভাল নয়। আপনি একটু অসাবধান হলে লোলিটা ত' চুরিও করবে ···এবার চলি, স্যার, আপনারা ফুর্ত্তি করুন······"

ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সাথে সাথে সকালের রোদ লাফিয়ে ঘরে এল। আমি বললাম, "এবার আমরাও উঠলে হয়।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "আমার কাহিনী প্রায় শেষ হয়েছে। মদও একটু রয়েছে।" উনি মেয়ে তিনটির জন্য কফির অর্ডার দিলেন, যাতে ওরা আমাদের বিরক্ত না করে। তারপর শুরু করলেন, "সে রাতে বেশী কথাবার্ত্তা বলিনি। আমার জ্যাকেট পেতে দু'জন শুলাম। একটু ঠান্ডা পড়তে, হেলেনের জামাকাপড় আর আমার সোয়েটার গায়ে চাপালাম। ও আগে ঘুমাল। এক সময় মনে হল, ও ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। একটু পরে ও উদ্দাম প্রেমময়ী হয়ে গেল। ওর চুম্বন, আলিঙ্গনে এক অচেনা নতুন স্বাদ। ক্যাম্পের মেয়েদের মুখে ওর সম্বন্ধে যা শুনেছি, সে বিষয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। আমার প্রেম অনেক গভীর। আমরা দুজনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে অন্য জগতের প্রান্তে পেঁাছেছি। সেখান থেকে ফেরা নেই। আছে শুধু এগিয়ে চলা, একত্র লক্ষ্যহীন উড়ে চলা, শেষে হয়ত হতাশা।

হেলেন যখন বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে, আর একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখান থেকে পালাতে পারবে ?"

বেড়া পার হয়ে ও উত্তর দিল, "পারব না। আমি পালালে অন্য মেয়েরা শাস্তি পাবে। তুমি কাল রাতেও আসতে পারবে ?"

"পারব হেলেন, যদি তার আগে ধরা না পড়ি।"

হেলেন আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, "আমাদের জবিনটা কী হয়ে গেল। কী অপরাধ করেছি, যে জীবনটা এমন হল ?"

বেড়া দিয়ে গলে আসার পর হেলেনকে জামাকাপড় ফেরত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এই তোমার সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় ?"

ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আমি বললাম, "এগুলি পরার জন্য ধন্যবাদ, হেলেন। আগামীকাল রাতে আমি নিশ্চয় আসব। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকব।"

কী খাবে ? তোমার কাছে খাবার আছে ?

পাহাড়ে প্রচুর ফল এবং বাদাম আছে। ব্যাঙের ছাতাও অনেক ফলেছে। ঐ খেয়েই কাটিয়ে দেব।

আগামীকাল রাত পর্য্যন্ত কাটাতে পারলে কিছু খাবার এনে দেব।

কোন চিন্তা নেই, হেলেন। সকাল হতে অল্প বাকি। রাত অবধি সহজেই কাটাতে পারব।

ব্যাঙের ছাতা খেও না। তুমি ভাল চেন না। রাতে অনেক খাবার আনব। হেলেন স্কার্ট পরল। স্কার্টের নীল জমিতে সাদা ফুলের নক্সা। ব্লাউজ পরল। এমনভাবে ব্লাউজের বোতাম আঁটল, যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি। কত ভালবাসি তুমি নিজে বুঝতে পারবে না। বল, আমাকে কোনদিন ভুলবে না! কথা দাও· ···"

বিদায় নেওয়ার সময় হেলেন আগেও কয়েকবার এরকম গভীর আলিঙ্গন করেছে। সে সময় আমরা সবার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের কুব্যাখ্যা করে ফরাসী পুলিশ যখন তখন আমাদের হাতকড়া পরাতে ব্যগ্র। অপরপক্ষে জার্ম্মান গেস্টাপোও বসে ছিল না। তদানীন্তন ফরাসী-জার্ম্মান চুক্তি অগ্রাহ্য করে গেস্টাপো গোয়েন্দারা যেখানে খুশি নাক গলাত। ফলে দু'জন রিফিউজির প্রথমের পর দ্বিতীয় সাক্ষাত ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত।

হেলেন অনেক রুটি, চীজ, সসেজ আর ফল দিয়েছিল। আমার গ্রামে যাওয়ার সাহস ছিল না। ক্যাম্পের অদূরে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ ছিল। দিনের বেলা তার মধ্যে গৃহস্থালি পাততাম। ঘুমিয়ে অথবা হেলেনের দেওয়া বই এবং কাগজ পত্র পড়ে দিন কাটিয়ে দিতাম। ও প্রায়ই নতুন খবর আনত ঃ জার্ম্মানিরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, ফরাসী সরকারের সাথে চুক্তির পরোয়া করছে না, ইত্যাদি।

বহু অসুবিধা সত্ত্বেও সেই দিনগুলি রূপকথার মত সুন্দর হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ভয় করত বটে, তবু প্রতি ঘন্টায় বিপদের খতিয়ান করতে করতে ভয়ও গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। রাতে আকাশভর্ত্তি তারা। হেলেন এক খণ্ড ত্রিপল জুটিয়েছিল। মাঠের মেঝেতে সেই ত্রিপল বিছিয়ে, উপরে শুকনো ফুল আর পাতার রাশি ছেয়ে দিতাম। আমাদের নিত্যকার ফুলশয্যা হত। ওকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, "অত ঘন ঘন পালিয়ে আস কি করে, হেলেন?"

একটু ভেবে, ও উত্তর দিয়েছিল, "আমার উপর একটি বিশেষ কাজের ভার আছে। সেই জন্য গ্রামে যেতে দেয়। গ্রাম থেকে ফেরার পথেই সেদিন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল। তা ছাড়া, কর্ত্তৃপক্ষের উপর আমার প্রভাবও আছে।"

খাবারগুলি কি গ্রাম থেকে আন?

না। ক্যাম্পের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ও ছাড়া দোকানে আর বিশেষ কিছু কেনবার নেই।

তোমার ধরা পড়ার ভয় করে না?

নিজের জন্য করে না। আমার ভয় তোমার জন্য। আমি ত' এখনো বন্দী। আমার আর কী হতে পারে ?

পরের রাতে হেলেন এল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়ার ধারে মেয়েদের ছায়ামূর্ত্তিও দেখলাম না। সারা রাত বেড়ার ধারে লুকিয়ে রইলাম। ওদের ব্যারাকগুলি অন্ধকার। মাঝে মাঝে মেয়েদের বাথরুমে যাওয়ার শব্দ পেলাম। হঠাৎ দূরে রাস্তায় একটি গাড়ির নিষ্প্রদীপ করা হেডলাইটের আলো পড়ল। চিন্তা হল, হয়ত কিছু গোলমাল হয়েছে। পরদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলাম। ক্যাম্পে কিছু হৈচৈ শুনলাম। তাতেও একটু স্বস্তি পেলাম। তখন শুধু তিনটি সম্ভাবনা—হেলেন অসুস্থ, ওকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া এবং ওর মৃত্যু—ব্যতীত সব কিছুকেই আমি সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। জীবনের সব আশা তখন কয়েকটি সম্ভাবনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঃ দুজনে একত্র থাকব, চেষ্টা করব এবং সময় হলেই একটি নিরাপদ বন্দরে পাড়ি দেব।

সারাদিন জঙ্গলে শুয়ে কাটালাম। গাছ থেকে লাল, হলুদ, বাদামী রঙের শুকনো পাতা ঝরছিল। আমি গুণলাম। মনে তখন একমাত্র প্রার্থনা ঃ ভগবান, হেলেনকে বাঁচিয়ে রেখো, আর কিছু চাই না।

পরের রাতেও হেলেন এল না। ক্যাম্পে যাবার রাস্তার পাশে লুকিয়েছিলাম। রাত ন'টার সময় দেখলাম দু'টি গাড়ি ক্যাম্পের দিকে চলেছে। ইউনিফরম দেখে চিনলাম, যাত্রীরা জার্ম্মান। মিলিটারি না গোয়েন্দা পুলিশ, বুঝলাম না। গাড়িদুটি একটার আগে ফিরল না। সে এক উৎকন্ঠা ভরা রাত ! ভাবলাম ওরা নিশ্চয় গেস্টাপো, না হলে রাতে আসত না। বুঝতে পারলাম না, ওরা কোন বন্দীকে সাথে নিয়ে ফিরল কিনা। সারা রাত বেড়া আর রাস্তার পাশে ঘুরলাম। ভোর হতে ভাবলাম, আবার ইলেকট্রিক মিস্তিরির ছদ্মবেশ নেব। কিন্তু দূরে থেকে দেখলাম, মেন গেটের পাহারা দ্বিগুণ করা হয়েছে। পাহারাদারদের পাশে একজন একটি তালিকা হাতে বসে আছে।

সেদিন আর কাটতে চায় না। অন্ততঃ একশোবার বেড়ার পাশে ঘোরাঘুরি করলাম। শেষে দেখলাম, বেড়ার এপারে খবর-কাগজে মোড়া কি যেন পড়ে আছে। খুলে দেখি কিছু রুটি, চারটি আপেল এবং এক স্বাক্ষরবিহীন বাণী, "আজ রাতে।" হেলেন রেখে গিয়েছে। খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। মাটিতে বসে রুটিগুলি খেয়ে ফেললাম। দিনে জঙ্গলের গোপন আস্তানায় ঘুমালাম। বিকালে ঘুম ভাঙ্গল। আকাশে পরিষ্কার সোনালী রঙ। মদ রঙের রোদ তখন গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে। সেই রোদ গায়ে মেখে বীচ আর লিনডেন গাছগুলি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমার ঘুমের ফাঁকে কোন অদৃশ্য শিল্পী ওদের স্পন্দনহীন মশালে রূপান্তরিত করেছে। একটি পাতাও নড়ছিল না।

শোয়ার্থস্ একটু মুচকি হেসে বললেন, "প্রকৃতি বর্ণনায় দয়া করে অধৈর্য্য হবেন না। ঐ সময় জন্তুর থেকে আমার কাছে প্রকৃতির মূল্য কম ছিল না। একমাত্র প্রকৃতি দূরে ঠেলে দেয়নি, পাসপোর্ট বা আর্য্যরক্তের প্রমাণপত্র দাবী করেনি। যেটুকু দেওয়া নেওয়ার

সম্পর্ক সেখানে প্রকৃতির ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক। সেই বিকালের রোদে চুপ করে শুয়েছিলাম। কোন অদৃশ্য নির্দ্দেশে অগণিত গাছের পাতা এক এক করে ঝরে পড়ছিল। কয়েকটি আমার কোলে পড়ল। সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে মুক্তির রূপরেখা দেখতে পেলাম। তখনই কোন সিম্ধান্ত নিলাম না। মনে হল হেলেন যদি একান্তই মারা যায়, সেক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ প্রাণধারণ অর্থহীন। আমিও আয়ুর সীমারেখা টানতে সক্ষম। যার ভালবাসা মানবিক স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে, আত্মশক্তির এই নব চেতনা তার কাছে পরম আশীর্ব্বাদ।"

সে রাতে হেলেন এল অনেক পরে। তখন অন্য মেয়েরা বেড়ার পাশ থেকে চলে গিয়েছে। খাটো স্কার্ট আর ব্লাউজে ওকে অনেক কম বয়স লাগছিল। বগলে ছিপি-খোলা মদের বোতল। বলল, "কাপও এনেছি।" সন্তর্পণে বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে এসে বলল, "ভাবলাম প্যারীর পর এ জিনিষ তোমার পেটে পড়েনি। ক্যাম্পের দোকানে এক বোতলই ছিল, নিয়ে এসেছি।"

ওর গায়ে, মাথায় ওডিকোলনের সুবাস। ছোট ছোট করে নতুন ছাঁদে চুল ছেঁটেছে। রাগ করে বললাম, "এসব কী ব্যাপার! আমি ভেবে মরছি, কোথাও ধরে নিয়ে গেল না মেরে ফেলল, তুমি সেলুনে ফ্যাশন করে চুল ছাঁটিয়ে আর হাত পায়ের আঙ্গুলে রঙ লাগিযে বেড়াচ্ছ!"

আমি নিজে করেছি, হেলেন ওর হাত দুটি আমার কোলে রেখে বলল, "এস, মদ খাই।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছিল? গেস্টাপো এসেছিল?"

না। জার্ম্মান মিলিটারি কমিশন এসেছিল। ওদের সাথে দুজন গেস্টাপো ছিল।

কাউকে ধরে নিয়ে গেছে?

ও উত্তর দিল, "না। ধরে নিয়ে যায়নি। একটু মদ দাও।" দেখলাম, ও বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছে। ওর গা এবং হাত গরম, যেন ফেটে যাবে। ও আবার বলল, "ক্যাম্পে যে ক'জন নাজি আছে, ওরা তাদের তালিকা তৈরী করতে এসেছিল। নাজিদের জার্ম্মানীতে ফেরত পাঠানো হবে।"

ক'জন নাজি আছে?

অনেক। আগে বুঝতে পারিনি অত আছে। অনেকে অবশ্য নিজেদের নাজি বলে স্বীকার করেনি। আমি একটি মেয়েকে আগেই নাজি বলে চিনেছিলাম। ও এগিয়ে এসে বলল, "ও নাজি পার্টির সভ্যা, অনেক মূল্যবান গোপন খবর সংগ্রহ করেছে, ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ওর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাই পিতৃভূমিতে ফিরতে চায় · ইত্যাদি। ও জানে "

জিজ্ঞেস করলাম, "ও কী জানে?"

তাড়াতাড়ি মদটুকু শেষ করে হেলেন বলল, "ঠিক মনে নেই, তবে অনেক রাত এক-সঙ্গে থেকেছি, কথা বলেছি · · ও হয়ত জানে, আমি কে। যাক গে, আমি কিছুতেই জার্ম্মানী ফিরব না। কিছুতেই না। কেউ ফেরাতে চেষ্টা করলে, আত্মহত্যা করব।"

আত্মহত্যা করতে হবে না, হেলেন। মনে হয়, ওরা তোমাকে জার্মানীতে নিয়ে যেতে চাইবে না। জর্জেরই কোন ঠিকানা আছে ? তা ছাড়া, সব বৃত্তান্ত জর্জও নিশ্চয় জানে না। ঐ মেয়েটির বা তোমার সম্বন্ধে বলে দিয়ে কী লাভ হবে ?

আমাকে জড়িয়ে ধরে হেলেন বলল, "কথা দাও, ওদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে ?"

কথা দিলাম। হেলেন তখন এমন মরীয়া যে, ভগবানের মত কথা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

আরও গভীর আলিঙ্গন করে উত্তেজিত, ভারী কণ্ঠে হেলেন বলল, "বিশ্বস করো, তোমাকে আমি প্রাণের থেকে বেশী ভালবাসি।"

জানি, হেলেন।

ও এবার শ্রান্ত হয়ে, আলিঙ্গন শিথিল করে বলল, "আমাদের এখান থেকে পালাতেই হবে।"

হ্যাঁ। এই রাতেই পালাতে হবে।

হেলেন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাবে ? তোমার পাসপোর্ট আছে ?"

আমার আছে। লে ভেরন ক্যাম্প অফিসের এক কর্ম্মীর দয়ায় ফেরত পেয়েছি। তোমার পাসপোর্ট কোথায় ?

কিছুক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে হেলেন বলল, "অল্প কয়েকদিন আগে ক্যাম্পে একটি ইহুদি পরিবার এসেছে। স্বামী, স্ত্রী আর একটি বাচ্চা। বাচ্চাটি অসুস্থ। মিলিটারি কমিশনের কাছে বলেছে ওরা জার্ম্মানীতে ফিরতে চায়। কমিশনের ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করল, আপনারা ইহুদি না ? স্বামীটি জানাল, তারা জার্ম্মান। ক্যাপটেন আরও কিছু বলত, কিন্তু দু'জন গেস্টাপো ওকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনারা সত্যিই জার্ম্মানীতে ফিরতে চান ? পরে গেস্টাপোদের একজন হাসতে হাসতে বলল, "তালিকায় ওদের নাম লিখে নিন, ক্যাপটেন। ওরা দেশে ফেরার জন্য সত্যিই কাতর হয়ে থাকলে, ওদের নিতে হবে বৈকি।" পরিবারটি তালিকায় নাম লেখাল। কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। ওরা জবাব দেয়, আর পালিয়ে বেড়ানোর শক্তি নেই। বাচ্চাটিও অত্যন্ত অসুস্থ। তা ছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে জার্ম্মানরা সব ইহুদিকে ধরে জোর করে জার্ম্মানীতে পাঠাবে, যাতে নির্বিঘ্নে ইহুদি নিধন যজ্ঞ সমাধা হয়। সুতরাং স্বেচ্ছায় ফিরতে চাইলেও একই ফল হবে। ওদের মনোভাব পুরোপুরি ভারবাহী জীবের মত। হাজার মার খেয়েও প্রতিবাদ করতে জানে না। ওদের সাথে কথা বলবে ?"

কী কথা বলব, হেলেন ?

কেন ? বলবে, তুমি জার্ম্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলে, কি করে সেখান থেকে পালিয়েছ, আবার জার্ম্মানীতে ফিরে আমাকে নিয়ে এসেছ—এইসব বলবে।

কোথায় কথা বলব ?

এইখানে। আমি স্বামীটিকে ডেকে আনছি। ওকে তোমার কথা বলেছি। মনে হয়, তুমি বাঁচাতে পারবে।

কয়েক মিনিট পরে হেলেন একটি রুগ্ন চেহারার লোককে সাথে নিয়ে ফিরল। লোকটি কিছুতেই বেড়া পেরোতে চাইল না, ওপার থেকে কথাবার্তা চালাল। ক্রমে ওর স্ত্রীও যোগ দিল। স্ত্রীটির খুব ফ্যাকাশে চেহারা। ও কোন কথা বলছিল না। স্বামীটি বলল, ওরা দশ দিন আগে ধরা পড়েছে। তার আগে দুজনে ভিন্ন ক্যাম্পে ছিল। দু'জনই পালিয়েছিল। পথে বাড়ি ঘরের দেওয়ালে, রাস্তার ধারের পাথরে পরস্পরের নাম লিখতে লিখতে গিয়েছিল।

শোয়ার্থস্ এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডোলারোসার নাম শুনেছেন ?"

বললাম, "ডোলারোসার নাম কে শোনেনি ? বেলজিয়ম থেকে পীরেনীজ্ পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডোলারোসা।"

বস্তুতঃ ডোলারোসার কাহিনী ঐ কয়েকটি কথায় শেষ হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে তার সূত্রপাত। জার্ম্মান সৈন্যরা যখন ম্যাজিনো ব্যূহ ভেদ করে, বেলজিয়ম পদানত করে ফ্রান্সের দিকে পা বাড়াল, আরম্ভ হল অগণিত পলায়নপর মানুষের মিছিল। প্রথমে এল মোটর গাড়ির দল মাথায় স্তূপাকার বিছানা আর সাংসারিক জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে। তার পিছনে সব রকমের যানবাহন - ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলা গাড়ি এবং শিশুর প্যারামবুলেটর। সবার শেষে অসংখ্য মানুষের স্রোত। চমৎকার গ্রীষ্মের দিনে সবাই চলেছে দক্ষিণ ইউরোপের দিকে। এই বিরাট রিফিউজির দল পথে কয়লা, কাঠকয়লার টুকরা, রঙ ইত্যাদির সাহায্যে বাড়ির দেওয়ালে, রাস্তার মাইলপোস্ট, ঘরের দরজায়, যেখানে পেরেছে সেখানেই নিজের পরিচয় এবং বাণী লিখে গিয়েছিল। যেন একটি চলমান ইতিহাস। এ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল গুপ্ত জীবন যাপনকারী জার্ম্মান রিফিউজিরা নিজেদের সুবিধার জন্য এক ধরনের অদৃশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেছিল, যার বিস্তৃতি ছিল একদিকে ফ্রান্সের নাইস থেকে ইতালির নেপল্স্, অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ থেকে ফ্রান্সের প্যারী পর্য্যন্ত। এর শরিক ছিল বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবের দল যাদের মাধ্যমে খবর দেওয়া নেওয়া চলত। প্রয়োজনে ওরা দু এক রাত্রির আস্তানার ব্যবস্থাও করে দিত। চললাম ইতিহাস এবং গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইহুদিটি স্ত্রী এবং শিশুর সাথে পুনর্মিলিত হয়।

শোয়ার্থস্ আবার বলে চললেন, ইহুদি পরিবারটির আশঙ্কা ছিল হেলেনদের ক্যাম্পে বেশীদিন থাকলে ওদের বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। কারণ, ওটি মেয়েদের ক্যাম্প। অল্পদিন পরে স্বামীটিকে পুরুষদের ক্যাম্পে পাঠানো হবে। স্বামীটি বলছিল, বহু কষ্টে পুনর্মিলনের পর ওদের বিচ্ছেদ সইবে না। পালানো অসম্ভব। একবার পালানোর চেষ্টা করে প্রায় অনশনে মরতে হয়েছিল। তার উপর বাচ্চাটি অসুস্থ এবং ওর স্ত্রী পরিশ্রান্ত। ওর নিজের শক্তি প্রায় নিঃশেষ। তাই ওরা সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের অদৃষ্টের

হাতে তুলে দিয়েছে। স্বামীটি বলছিল, "আমাদের মত ফ্যাসীবিরোধী জার্ম্মানদের অবস্থা কশাইখানার গরু ছাগলের মত। যে-কোন দিন জার্ম্মান সৈন্য, গেস্টাপো অথবা নাজি পার্টির লোক গলার নলিটি কেটে দিয়ে যাবে। বলতে পারেন, ফরাসীরা কেন সময় থাকতে আমাদের পালাতে দিল না?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "কেউ সে উত্তর জানে না। আমিও রোগা, ফ্যাকাশে, কালো মোচওয়ালা ইহুদিটিকে জবাব দিতে পারিনি। ফরাসীরা আমাদেব রাখতে চায় না, চলে যেতেও দেবে না। কিন্তু ফ্রান্স যখন জার্ম্মান আক্রমণে খন্ড খন্ড হয়ে পড়ছে, ছোট ছোট পরস্পরবিরোধী আচরণের সমালোচনা কে বা করবে, শুনবে বা কে?

"পরদিন বিকালে দুটি ট্রাক ক্যাম্পের দিকে চলল। প্রায় তার সাথে সাথে কাঁটা-তারের বেড়া সজীব হয়ে উঠল। এক ডজনেব কিছু বেশী মেয়ে পরস্পবের সাহায্যে বেড়া পেরিয়ে জঙ্গলে লুকোল। ওদের মধ্যে হেলেনও ছিল। ও বলল, "আঞ্চলিক জেলা শাসকের দপ্তর সাবধান করে দিয়েছে, জার্ম্মানরা ওদের প্রয়োজনীয় মেয়েদেব নিয়ে যেতে আসছে। ফরাসীদেব জানা নেই, এর সাথে আর কোন উদ্দেশ্য জড়িত আছে কি না। তাই জার্ম্মানরা ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত জঙ্গলে লুকানোর অনুমতি দিয়েছে।"

বহুদিন পর হেলেনকে দিনের আলোয ভাল কবে দেখলাম। ওব লম্বা হাত পা আর মুখ আরও রোদে পুড়েছে। অনেক রোগা হয়েছে। মুখটা হতশ্রী হয়েছে। চোখদুটি অনেক বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস কবলাম, "তোমার খাবার আমাকে খাইযে, নিজে বোধ হয় আধপেট খাচ্ছ?"

আমার খাবার চিন্তা নেই। প্রচুর খাই। এই যে, পকেটে কিছু চকোলেটও নিযে এসেছি। গতকাল অনেক সার্ডিন মাছ আর কেক কিনেছি। কিন্তু রুটি বেশী পাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম, "যে ইহুদিটির সাথে কথা বললাম, ও কি জার্ম্মানীতে ফিববে?"

হঁ্যা।

হঠাৎ হেলেনেব মুখ কেঁপে উঠল। ও আমাকে জড়িয়ে ধবে বলল, "আমি কক্ষনো ফিরে যাব না। কক্ষনো না। তুমি কথা দিয়েছ। ওরা ধরতে এলে বাধা দেবে ত'?"

ওরা তোমাকে ধরতে পারবে না, হেলেন।

গাড়িগুলি এক ঘণ্টা পরে চলে গেল। গাড়ি থেকে মেযেদের গানের বেশ কানে আসছিল: "সবার সেরা দেশ মোদের প্রিয় জার্ম্মানভূমি।" সেই রাতে লে ভেবন ক্যাম্পে কেনা একটি বিষের শিশি হেলেনকে দিলাম।

পরদিন ও জানতে পারল, জর্জ্জ ওর গতিবিধি সম্পূর্ণ জানে। জিজ্ঞেস করলাম, "কে বলল?"

ক্যাম্পের ডাক্তার বলেছে।

ডাক্তার কি করে জানল?

ক্যাম্প পরিচালক ডাক্তারকে বলেছে। আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর হয়েছিল।

ডাক্তার জার্ম্মানদের হাত এড়াবার কোন ফন্দি বলেছে?

ডাক্তার বলেছে, প্রয়োজন হলে দু একদিন ক্যাম্প হাসপাতালে লুকিয়ে রাখতে পারবে। তার বেশী নয়।

অতএব তোমার পালাতে হবে, হেলেন। কে তোমাদের জঙ্গলে লুকাতে অনুমতি দিয়েছিল?

স্থানীয় জেলা শাসক।

বেশ, তোমার পাসপোর্ট ফেরত চেয়ে নাও। একটি মুক্তিপত্রও বুদ্ধি করে আদায় করে নিও। হয়ত ডাক্তার সাহায্য করবে। এসব করে উঠতে না পারলে, শুধু হাতেই পালাব। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথাও অন্য কাউকে বলবে না। আমি নিজে জেলা শাসকের সাথে কথা বলব। মনে হচ্ছে ওঁর কিছু মনুষ্যত্ব আছে।

পরদিন সকালে মিস্তিরির পোষাক পরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হেঁটে চললাম। ভয় হচ্ছিল, টহলদার জার্মান সৈন্য অথবা ফরাসী পুলিশের খপ্পরে পড়ব। জেলা শাসকের দপ্তরে একটি পুলিশ এবং একজন কেরাণীকে বললাম, আমি জার্মান মিস্তিরি। মিলিটারির জন্য ইলেকট্রিক লাইন বসাব। সেই সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর নেওয়ার জন্য জেলা শাসকের সাথে দেখা করতে চাই। অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম, দুঃসাহসে ভর করলে অনেক কাজই সহজ হয়। পুলিশকে ভয় করলে, গ্রেফতার করে···হেঁকে কথা বললে, সম্মান করে।

জেলা শাসককে সত্যি কথা বললাম। ওঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, আমাকে তখনই গ্রেফতার করা। পরে আমার সাহস এবং হঠকারিতায় মজা পেলেন। আমাকে সিগারেট দিয়ে বললেন, উনি ভাণ করবেন, বর্ত্তমান উপাখ্যানের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। সুতরাং যা খুশি, করতে পারি। মিনিট দশেক বাদে চিন্তা করে বললেন, তালিকার কোন বন্দীকে না পাওয়া গেলে জার্ম্মানরা ওঁকে দায়ী করবে, এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জীবন শেষ করার বাসনা ওঁর আদৌ নেই।

বুঝিয়ে বললাম, "জেলা শাসক মহাশয়, আমি জানি আপনি এযাবৎ সযত্নে বন্দীদের রক্ষা করেছেন। আমি এও জানি, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম মেনে চলাই আপনার কর্ত্তব্য। কিন্তু ফ্রান্স এক মহা দুর্দ্দশায় পড়েছে। আজকের হুকুম হয়ত আগামী কাল লজ্জাকর পরিহাস বলে গণ্য হবে। তখন এই হুকুমের সাফাই গাওয়ার ও কেউ থাকবে না। তবু কি আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে অই নিরপরাধ লোকগুলিকে কাঁটাতারের খাঁচার মধ্যে রেখে দেবেন, শুধু তাদের গ্যাস চেম্বার এবং নিপীড়ন শিবিরে পাঠানোর জন্য? ফ্রান্স যখন আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল, বিদেশীদের—শত্রু বা মিত্র—আটক শিবিরে বন্দী করে রাখার যুক্তি ছিল। যুদ্ধ এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও বিজেতা জার্ম্মানরা আপনাদের ক্যাম্প থেকে নাজিদের বেছে নিয়ে গিয়েছে। বাকি যারা ক্যাম্পে রয়ে গিয়েছে তাদের ভাগ্যে আছে সীমাহীন অত্যাচার এবং নিপীড়নের শেষে মৃত্যু। আমার সেই সব হতভাগ্যদের পক্ষে বলা উচিত ছিল। তার পরিবর্ত্তে আমি শুধু একজনের পক্ষে ওকালতি করতে এসেছি। আপনার যদি বন্দী তালিকা সম্পর্কে কোন ভয়

থাকে, আমার স্ত্রীকে পলাতক অথবা মৃত দেখিয়ে দিন। এও লিখতে পারেন যে ও আত্মহত্যা করেছে। তাতে আপনার দায়িত্ব চুকে যাবে।"

জেলা শাসক আমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, "আগামীকাল আসুন।"

আমি নড়তে চাইলাম না। বললাম, "কাল হয়ত আমি নিজেই গ্রেফতার হতে পারি, আজই করুন না?"

দু ঘণ্টা বাদে আসুন।

আমি বললাম, "আপনার ঘরের দরজার পাশেই অপেক্ষা করব। সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।"

হঠাৎ একটু হেসে উনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বিবাহিত, অথচ অবিবাহিতের মত থাকতে হচ্ছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক, সন্দেহ নেই।"

এক ঘণ্টা পরে উনি আমাকে ডেকে বললেন, "ক্যাম্প পরিচালককে ফোন করেছিলাম। সত্যিই আপনার স্ত্রী সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। যা হোক, আপনার কথা মত ওঁকে মৃত দেখাচ্ছি। আশা করি তাতে আমাদের এবং আপনার সমস্যা মিটবে।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে কুসংস্কারের এক অদ্ভুত কালো ভীতি আমাকে ঘিরে ধরল। আমি কি ভাগ্যকে প্রলোভিত করছি? অপরপক্ষে ভাবলাম, আমি নিজেই ত' বহুকাল আগে মৃত। এখনো একটি মৃত মানুষের পাসপোর্ট আশ্রয় করে বেঁচে আছি।

"আগামীকাল সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করে দেব," জেলা শাসক বললেন।

আমি বললাম, "আজই করুন। পালাতে একদিন দেরী করার দরুন আমাকে দু'বছর জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছে।"

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মুখও কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর একটু দেরী হলে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। উনি আমার অবস্থা লক্ষ্য করে বসতে বললেন। কগন্যাক আনতে হুকুম দিলেন। বললাম, কফি আনান। মনে হল ঘরে নানা রঙের ছায়া-মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আমার কানে গুঞ্জন করে বলছে: হেলেন মুক্ত, তোমরা পালাও। শেষে সব ছায়া মিলিয়ে গিয়ে একটি রইল। সে আমার কানে বলল, আমি জেল-খানার পরিচালক নই। আমি অত্যন্ত দয়াশীল ভদ্রলোক। ক্যাম্প থেকে সবাই চলে গেলেও আমার কী আপত্তি?

কতক্ষণ ছায়ামূর্তির গুঞ্জন শুনেছিলাম খেয়াল নেই। খানিক পরে কফি এল। কফি শেষ করে ঘরের বাইরে একটি বেঞ্চে বসলাম। অল্প পরে একজন কেরাণী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। অবশেষে জেলা-শাসক এসে জানালেন, সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আপনার কেমন লাগছে? একটু ভাল বোধ করছেন ত'? ভয় পাবেন না। আমি এক সাধারণ ফরাসী জেলাশাসক মাত্র।"

আমি সানন্দে জবাব দিলাম, "আমার কাছে আপনি ঈশ্বরের চেয়ে মহৎ। ঈশ্বর আমাকে ধরাতলে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্ত্তমানে তা অকেজো। আমার

প্রয়োজন ফরাসী দেশের এই প্রদেশে বসবাসের অনুমতি, যা কেবল আপনি দিতে পারেন।"

উনি হেসে জবাব দিলেন, "আপনি এই অঞ্চলে লুকানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। জার্মানরা এই অঞ্চলই বেশী খোঁজাখুঁজি করবে মনে হয়!"

কিন্তু লুকানোর জন্য মার্সাই বন্দর আরও বিপজ্জনক। জার্মানরা নিশ্চয় আশা করবে, আমরা মার্সাই দিয়ে পালাব। মাত্র এক সপ্তাহ এই অঞ্চলে থাকবার অনুমতি দিন। তারপর আমরা লোহিত সাগর পার হয়ে যাব।

"লোহিত সাগর পার হবেন কী করে?" উনি জিজ্ঞেস করলেন।

"ওটা একটা রিফিউজি কথোপকথনের উপমা। পুরাকালে মিশর থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের মত আমাদের বর্তমান জীবন। আমাদের পিছনে জার্মান সৈন্য এবং গেস্টাপো বাহিনী, দুই পাশে ফরাসী এবং স্পেনীয় পুলিশের সমুদ্র। সামনে খোলা আছে ইহুদি-পুরাণের 'প্রতিশ্রুত ভূমি'র সাথে তুলনীয় পর্তুগাল এবং তার বন্দর লিসবন—আশার দেশ আমেরিকার স্বর্ণতোরণ।

"আপনাদের আমেরিকান ভিসা আছে?" জেলাশাসক জিজ্ঞেস করলেন।

"জুটিয়ে নেব।"

"মনে হয় অলৌকিক ঘটনায় আপনার অত্যন্ত বেশী বিশ্বাস", উনি ব্যঙ্গ করলেন।

আমরা নিরুপায়। তাছাড়া একটা অলৌকিক ঘটনা কি একটু আগেই ঘটেনি?

একটু হেসে শোয়ার্থস্ বললেন, "মরীয়া হলে মানুষ অনেক ফন্দি আঁটতে পারে। জেলাশাসককে আমার শেষ কথাগুলি বলা এবং ওঁকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করে চাটুকারির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ওঁর থেকে স্বল্পদিন ঐ অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি আদায় করে নেওয়া। অপর একজনের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হলে প্রত্যেক মানুষের একটি ছোটখাট মনস্তত্ত্ববিদ হওয়া প্রয়োজন।

সত্যিই এক সপ্তাহ বসবাসের অনুমতি পেলাম। তখন সন্ধ্যা হতে অল্প বাকি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমি ক্যাম্পের মেন গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, হেলেন ডাক্তারের সাথে কথা বলছে। চোখ মুখে এক নতুন সজীবতা। ও আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল।

ডাক্তার বললেন, "আপনার স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ।"

ঠিক বলেছেন, হেলেন হেসে বলল, "এই শর্তে ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে আমি হাসপাতালে গিয়ে মারা যাব।"

আমি আদৌ রহস্য বা তামাশা করছি না। ডাক্তার খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওঁর সত্যিই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত।"

"ওকে তাহলে আগেই হাসপাতালে রাখা হয়নি কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এ আলোচনার অর্থ বুঝছি না। আমি মোটেই অসুস্থ নই। অতএব কোন হাসপাতালে যাব না," হেলেন উষ্মাভরে জবাব দিল।

"নিরাপদে থাকতে পারে এমন কোন হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে দিতে পারেন ?"

আমার সে উপায় নেই।

হেলেন এবার হেসে বলল, "সে প্রয়োজনও নেই। ঐ বিশ্রী আলোচনার এখানেই ইতি হোক। বিদায় জীন!"

হেলেন আমার আগে আগে চলল। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল, ওর কী হয়েছে। কিন্তু তা করা হল না। ডাক্তার একবার আমার দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ক্যাম্পে চললেন। আমি হেলেনের পিছু নিলাম।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার পাসপোর্ট নিয়েছ ?"

ও ঘাড় হেলিয়ে জানাল, নিয়েছে।

তোমার ব্যাগটা আমার হাতে দাও, হেলেন।

এতে এমন কিছু ভারী জিনিষ নেই।

তবু আমার হাতে দাও।

প্যারীতে যে সুন্দর ইভ্‌নিং ড্রেসটা কিনে দিয়েছিলে, সেটা এখনো রেখে দিয়েছি।

আমরা হেঁটে চললাম। কিছুদূর চলার পরে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি সত্যিই অসুস্থ, হেলেন ?"

আমার অসুখ করেনি। অসুস্থ হলে ত' শুয়েই থাকতাম। জ্বর হত। আমার কোথাও কোন অসুবিধা নেই। আরও কিছুদিন আমাকে ক্যাম্পে রেখে দেওয়ার জন্য ডাক্তার ঐ কথা বলেছে। চেয়ে দেখ, আমাকে কি অসুস্থ দেখায় ?

হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। আমি বললাম, "তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

অত মন খারাপ করো না, লক্ষ্মীটি।

তোমাকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিলে বোধ হয় ভাল হয়ে যাবে, হেলেন।

না। অসুস্থ হলে হাসপাতালে থেকে লাভ ছিল। আমার অসুখ করেনি, বিশ্বাস করো।

আমরা হেঁটে চললাম। এবার জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমি বললাম, "হয়ত আরও কিছুদিন ক্যাম্পে থাকলে তোমার অসুখ সারত।"

আমি তাহলে আত্মহত্যা করতাম। তুমি এসে বাঁচালে।

আরও জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টিকণাগুলি ঘন কুয়াশার চাদরে চারপাশ ঢেকে দিল। একটি বড় গাছের নিচে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। আমি বললাম, "এখন আমরা মার্সাই যাব। সেখান থেকে লিসবন, লিসবন থেকে আমেরিকা।"

ভাবছিলাম, আমেরিকায় অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছে। ওখানকার হাসপাতালের চারপাশে গ্রেফতারের পরোয়ানা নিয়ে গোয়েন্দা ঘুরে বেড়ায় না। হয়ত ওখানে কাজকর্ম করার অনুমতিও পাব। বললাম, "আমেরিকা পেঁছেই আমরা ইউরোপকে দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যাব।"

হেলেন উত্তর দিল না।

পঞ্চদশ

শোয়ার্থস্ বললেন, "সেই আমাদের যাত্রা শুরু হল, ইহুদিরা যেমন পুরাণে করেছিল মরুভূমি আর লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে। আশা করি এই অংশটুকুর সাথে আপনি পরিচিত।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। শোয়ার্থস্ শুরু করলেন, "আমরা বোর্ডো শহরে পৌঁছলাম। তারপর পীরেনীজ্ পাহাড়। অবশেষে মার্সাই বন্দর। জার্ম্মান বর্ব্বররা যত এগিয়ে আসে, ফরাসী আমলাতন্ত্র ততই নির্ম্মম হয়ে ওঠে। ওরা ফ্রান্সে বসবাসের অনুমতি দেবে না, ফ্রান্স ত্যাগও করতে দেবে না। যখন ফ্রান্স ত্যাগের অনুমতি পাওয়া গেল, ততক্ষণে স্পেনের ভিতর দিয়ে পর্ত্তুগাল পৌঁছবার অনুমতির মেয়াদ কেটে গিয়েছে। পর্ত্তুগীজ ভিসা ছাড়া স্পেনীয় অনুমতি পাওয়া যাবে না। আবার পর্ত্তুগীজ ভিসা আরও অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। ফলে, বিভিন্ন দূতাবাসের দ্বারে ঘুরে সময় নষ্ট।

অপেক্ষাকৃত কম উপদ্রুত অঞ্চলে একটি নির্জ্জন হোটেলে উঠলাম। বেশ কয়েক মাস বাদে আবার একত্র থাকব। হেলেন আনন্দে কেঁদে ফেলল। ওর কান্না থামলে, আমরা হোটেলের সামনে একটি ছোট বাগানে বসলাম। অল্প ঠাণ্ডা লাগছিল। এক বোতল মদ নিয়ে এসে দুজনে খেলাম। সে রাতে এক অজানা কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় দেখলাম, নিষ্প্রদীপ করা বাতি জ্বালিয়ে একটি গাড়ি হেলেনদের ক্যাম্পের দিকে চলেছে। হেলেন অস্বস্তি বোধ করল। সারাদিন আমরা ঘরের বাইরে যাইনি। বহুদিন পরে একসাথে থাকার সুযোগ পেয়েছি। নিজেদের একটি ঘর, ভাল বিছানা আর নিজস্ব বাথরুম। এ আনন্দের এক মুহূর্তও নষ্ট করতে ইচ্ছা হয়নি। তাছাড়া, দুজনই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, ঐ হোটেলে বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু হেলেন গাড়ি দেখে ভয় পেল, পাছে গেস্টাপো ওর জন্য এখানেও খোঁজ করে। সুতরাং ও হোটেল ছাড়তে হল।

এবার জিনিষপত্র নিয়ে বোর্ডোর পথে পা বাড়ালাম। পথে শুনলাম, অত্যন্ত দেরী করে ফেলেছি। একটি মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সাথে পথে দেখা। আমাদের গাড়িতে তুলে নিল। কিছু দূরে একটি বাগানবাড়িতে লুকাতে বলল। ও সেইদিকে যাচ্ছিল। অন্ততঃ রাতটা বাগানবাড়িতে কাটানো চলবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে ও বাগানবাড়িটির সামনে নামিয়ে দিল। মস্ত বড় বাড়ি। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ধাক্কা দিতে, দরজা খুলে গেল। গোটা বাড়ি অন্ধকার। আমাদের গলার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। বাড়িটাতে কোন মানুষ নেই। বড় বড় ঘরগুলি সব ফাঁকা! অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন বড়লোকের তৈরী। ঘরের দেওয়ালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কাঠের প্যানেলের কাজ। জানালাগুলি খুব বড় বড়। ঘরের চালে সুন্দর নক্সা। সিঁড়িটিও খুব সুন্দর এবং চওড়া। ধীরে ধীরে বাড়ির চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ালাম।

তৈরীর পর মালিক ইলেকট্রিক আনার কথা ভাবেনি। বিরাট ডাইনিং রুমে সাদা এবং সোনালী কাজ করা। প্রথম যে বেডরুমে ঢুকলাম, সেটিতে হাল্কা সবুজ আর সোনালী কাজ করা। কিন্তু কোথাও কোন আসবাবপত্র নেই। গৃহস্বামী নিশ্চয় কোথাও সরিয়ে রেখেছে।

কোণের একটি ঘরে কিছু মুখোস, সস্তা পোষাক পরিচ্ছদ আর কয়েক প্যাকেট মোমবাতি রয়েছে। কিছুদিন আগে এখানে কোন থিয়েটার হয়েছিল, তার চিহ্ন। একটি লোহার খাট আর গদিও রয়েছে। রান্নাঘরে কিছু রুটি, কয়েক টিন সার্ডিন মাছ, এক বোতল মধু, কয়েক পাউন্ড আলু আর কয়েক বোতল মদ পাওয়া গেল। অল্প কথায়, রূপকথার রাজত্ব।

প্রায় সব ঘরেই ফায়ারপ্লেস আছে। একটি বেডরুম বেছে নিলাম। সেই ঘরের জানালাগুলিতে পর্দার পরিবর্তে সস্তা জামা-কাপড়গুলি ঝুলিয়ে দিলাম। বাগানে দেখলাম অল্প কিছু তরিতরকারিও রয়েছে। কয়েকটি গাছে আপেল ফলেছে। কিছু তরকারি আর আপেল ঘরে নিয়ে এলাম।

যখন বেশ অন্ধকার হল, ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরিয়ে খেতে বসলাম। সে আগুনে ঘরের কাঠের প্যানেল চকচক করে উঠল। ঘরে কেমন অপার্থিব আবহাওয়া। যেন হুরি-পরীরা নাচ শুরু করল।

আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর বেশ গরম হল। হেলেন বৃষ্টিভেজা জামাকাপড় খুলে শুকোতে দিল। প্যারীতে কেনা ইভ্নিং ড্রেসটি পরল। আমি একটা মদের বোতল খুললাম। গ্লাস ছিল না। বোতলে মুখ লাগিয়ে খেলাম। হেলেন এবার ইভ্নিং ড্রেস খুলে ঘরের ড্রয়ারে রাখা থিয়েটারের পোষাক পরল। ঐ বিচিত্র পোষাকে বাড়িতে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল। এক এক সময় অন্ধকারে শুধু ওর পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ওকে দেখা যাচ্ছিল না। এক সময় কাঁধের উপর ওর তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ল। দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "ভয় হচ্ছিল, তোমায় বুঝি পেয়ে হারালাম।"

মুখোসের ফাঁক দিয়ে হেলেন বলল, "তুমি আমাকে কক্ষণো হারাবে না। কেন জান? কারণ, তুমি কখনই আমাকে ধরবার চেষ্টা করনি। চাষা জমিকে আঁকড়ে না ধরলেও জমি চাষারই থাকে। এই গুণটি না থাকলে অতি বড় নারীচিত্তবিজেতার উপরও মেয়েদের বিরক্তি আসে।"

অবাক হয়ে বললাম. "আমি কোনদিনই নারীচিত্তবিজেতা ছিলাম না, হেলেন।"

আমরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে ফায়ারপ্লেসের আলো সিঁড়ির রেলিং আর ব্রোঞ্জের নক্সার উপর প্রতিফলিত হয়ে হেলেনের মুখ রাঙিয়ে দিচ্ছিল। ও অস্ফুটে বলল, "তুমি কী তা তুমি নিজে কি করে জানবে? ডন জুয়ান মার্কা নারীচিত্তবিজেতা ব্যাটাছেলে আমার একদম ভাল লাগে না। ওরা এক-বার গায়ে দিয়ে ফেলে দেওয়া জামার মত। কিন্তু তুমি, তুমি আমার হৃদয়।"

হয়ত দুজনে ছদ্মবেশ পরেছিলাম বলেই ঐ ধরনের কথা, যা সাধারণতঃ বলি না, বলতে পেরেছিলাম। আমিও থিয়েটারের পোষাক পরে মিস্তিরির আলখাল্লা শুকোতে দিয়েছিলাম। ফায়ারপ্লেসের মিটমিটে আলো, বিচিত্র পোষাক এবং নতুন পরিবেশ আমাদের মুখে অনভ্যস্ত কথা যুগিয়েছিল।

ফিস্‌ফিস করে হেলেন বলল, "আমরা দু'জনই মৃত। মৃতের আইন নেই। মৃতের পাসপোর্ট আশ্রয় করে তুমি মৃত। আমি আজ হাসপাতালে মারা গিয়েছি। আমাদের জামাকাপড়েব দিকে দেখ,—দুটি রঙীন প্রজাপতি। এক মৃত শতাব্দীর উপর উড়ে বেড়াচ্ছি। এটি বড় সুন্দর শতাব্দী। এর প্রতিটি মুহূর্তে সুন্দর। এ শতাব্দীর কমনীয়তা, এর অলীক স্বর্গরচনা,—সবই সুন্দব। হায়, সব উৎসব শেষ হয়ে এখন শুরু হয়েছে ফাঁসিতে লটকানোর পালা। জানি না, কখন আমাদেরও ফাঁসিতে লটকাবে।"

দোহাই তোমার, ওকথা বলো না, হেলেন।

না। বলব না। মৃতের ফাঁসি নেই। আলো এবং ছায়ার মুন্ডচ্ছেদ করা যায় না। তাই আমাদেরও মুণ্ডচ্ছেদের ভয় নেই। এই অপার্থিব সোনালী আঁধারে আমাকে জড়িয়ে ধরো। হয়ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এর কিছুটা থেকে যাবে। অন্ধকার কোণগুলি আলোময় করবে।

আমার শরীরের মধ্য দিয়ে শিহরণ বয়ে গেল। বললাম, "দোহাই তোমার, ওকথা আর বলো না।"

আমাকে জড়িয়ে, ও কানে কানে বলল, "এখন যেমন আছি আমাকে সব সময় এই রকম মনে রেখো। কে জানে, আমাদের কী হবে "

আমরা আমেরিকা যাব, হেলেন। হয়ত যুদ্ধও কিছুদিন থেমে যাবে।

হেলেন এবার আমার মুখের উপর মুখ রেখে বলল, "আমি নালিশ করছি না। কী বা আমাদের নালিশ করবার আছে? যা করেছি, এ না করলে হয়ত অস্নাব্রুকের এক অতি সাধারণ নিষ্জীব দম্পতি বনে যেতাম। আশা আকাঙ্ক্ষাও হত অতি সাধারণ। বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকত শুধু কয়েক সপ্তাহের গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া "

হেসে বললাম, "মন্দ বলনি।"

সে রাতে হেলেন অত্যন্ত ফূর্তিতে ছিল। একটি মোমবাতি হাতে, একজোড়া সোনালী রঙের চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চটিজোড়া ও প্যারীতে কিনেছিল। সুখ দুঃখের মধ্যে ওটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আমি তখনো দোতলার সিঁড়িব মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। হেলেন রান্নাঘর থেকে এক বোতল মদ আনতে গেল। ওর হাতের মোমবাতি থেকে অন্ধকারে হেলেনের অনেকগুলি ছায়া পড়ল। মনে হল আমি কত সুখী।

ফায়ারপ্লেসের আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেল। হেলেন থিয়েটারের পোষাক পরেই ঘুমাল। রাতে ঘুম ভেঙ্গে আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলাম। শব্দে ঘরের পুরানো আয়নাগুলি কেঁপে উঠছিল।

বাড়িটিতে চারদিন ছিলাম। একদিন খাবারদাবার কেনার জন্য গ্রামে গিয়ে শুনলাম,

খুব শীগগির বোর্দো থেকে দুটি জাহাজ ছাড়বে। জিজ্ঞেস করলাম, "জার্মানরা বোর্দো দখল করেনি ?"

করেছে আবার করেনিও। আপনি কোন দলের জানতে পারলে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।

হেলেনকে সব বললাম, "জাহাজ ছাড়বে। হয়ত এখান থেকে আফ্রিকা, লিসবন, যে-কোন জায়গায় পালাতে পারব।" আশ্চর্য, ওর তাতে উৎসাহ নেই।

হেলেন বলল, "এখানেই কিছুদিন থাকি না ? বাগানে ফল আর তরকারির অভাব নেই। যতদিন কাঠ আছে রান্না করতে পারব। গ্রামে রুটি পাওয়া যাবে। কিছু টাকা আছে ?"

আছে। একটা ছবিও আছে। বোর্দোতে বিক্রি করে কিছু টাকা পেতে পারি।

"আজকাল কেউ ছবি কেনে ?" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

কিছু কিনে টাকাকে বেঁধে রাখতে চায়, এমন লোক এখনো ছবি কিনবে।

হেলেন হেসে বলল, "তাহলে বেচবার চেষ্টা করো। আমরা আরও কিছুদিন এখানে থাকব।"

হেলেন আসলে বাগানবাড়ির প্রেমে পড়েছিল। বাড়ির একধারে একটি পার্ক। পার্কের পর তরিতরকারি আর ফলের বাগান। ফলের বাগানের পাশে চারপাশ বাঁধানো বড় পুকুর। পুকুরের দুপাশে বসবার বেঞ্চি। একপাশের বেঞ্চির সামনে মস্ত বড় সূর্য্য ঘড়ি। বাড়িটিও যেন হেলেনের প্রেমে পড়েছিল। এই পটভূমিকা ওর মনের সাথে খুব খাপ খেয়েছিল। হোটেল আর ব্যারাক-জীবনের সাথে এর কত প্রভেদ। থিয়েটারের পোষাক পরে, প্রশান্ত অতীতের ছোঁয়া লাগা বাড়িটিতে আমাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। যেন এক থিয়েটারের ড্রেস রিহার্সাল দিচ্ছি। আমিও ওখানে একশো বছর থাকতে পারলে ধন্য হতাম।

তবু বোর্দোর চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর হয়নি। ভাবছিলাম, বোর্দো আংশিক-ভাবে জার্মান দখলে গেলেও ওখান থেকে জাহাজ ছাড়ত না। খুব আশা ছিল, বোর্দো তখনো শত্রুকবলিত হয়নি। কিন্তু আসলে সে সময় যুদ্ধের প্রাক্-সন্ধ্যা। ফ্রান্স অস্ত্র-ত্যাগ করেছে বটে, জার্মানীর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। শত্রুমুক্ত এবং শত্রু কবলিত এলাকার সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা থাকার কথা। কিন্তু চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল না। তাছাড়া, জার্মান মিলিটারি এবং গেস্টাপো বিজেতার দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব করার দরুন নানা অসুবিধা লেগেই থাকত। কারণ, ওদের প্রায়ই মতভেদ হত।

একদিন হেলেনকে বললাম, "তুমি এখানে থেকে যাও। আমি বোর্দো দিয়ে পালা-নোর চেষ্টা করে দেখি।"

হেলেন মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, "আমি একা থাকব না। তোমার সঙ্গে যাব।"

হেলেনের কথা যুক্তিহীন নয়। সে সময় বিপজ্জনক এবং নিরাপদ এলাকার সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা না থাকায়, শত্রুশিবির থেকে পালিয়ে কোন আপাত নিরাপদ অঞ্চলে গেস্টা-

পোর হাতে ধরা পড়ার ঘটনা বিরল ছিল না। সোজা কথায়, তখন আইন কানুনের উপর ভরসা করা চলত না।

বিভিন্ন রকম যানবাহনে ভয় করে আমরা বোর্ডো বন্দরে পেঁছিলাম। কিছু পায়ে হেঁটে, কিছু মালবাহী ট্রাকে চড়ে, অবশিষ্ট পথ এক চাষার খামারবাড়ির ঘোড়ায় চেপে যাত্রা শেষ করলাম।

বোর্ডোতে তখন অনেক জার্মান সৈন্য ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু শহরটা অধিকৃত হয়নি। ভয় হচ্ছিল, যে-কোন সময় গ্রেফতার হতে পারি। আমরা চোখে পড়ার মত পোষাক পরিনি। ভাল পোষাকগুলি গুছিয়ে রেখেছিলাম। একটি কাফেতে মালপত্র রাখলাম, কারণ সাথে থাকলেই নজর পড়বে। অবশ্য তখনো কয়েকজন ফরাসী স্যুটকেস হাতে ঘোরাফেরা করছিল। তবু, সাহস পেলাম না। ঐ শহরে কোন পরিচিত লোক ছিল না। স্থির করলাম, ভ্রমণ দপ্তরে খোঁজখবর করব।

ভ্রমণ দপ্তর খোলা পেলাম। জানালায় অনেকগুলি পুরনো পোস্টার লাগানো রয়েছে ঃ 'শরতে লিসবন ভ্রমণ করুন,' 'আলজিয়ার্স আফ্রিকার মণি,' 'ফেব্রারিডায় ছুটি কাটান,' 'সূর্য্যকরোজ্জ্বল গ্রানাডা' ইত্যাদি। প্রায় সব ক'টি পোস্টার অস্পষ্ট। শুধু লিসবন আর গ্রানাডায় পোস্টার দুটি তখনো জ্বলজ্বলে। বেশীক্ষণ জানালার সামনে অপেক্ষা করতে হল না। একটি চৌদ্দ বছর বয়সের বিশেষজ্ঞ প্রশ্নাদির জবাব দিল। না, জাহাজ নেই। জাহাজ সংক্রান্ত গুজব অনেক সপ্তাহ আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। জার্মানরা পেঁছিনোর অনেক আগে একটি ইংরেজ জাহাজ এসেছিল। পোল্যান্ডে লড়াই করার জন্য কিছু ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি করে নিয়ে গিয়েছে। আপাততঃ কোন জাহাজ ছাড়ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, এত লোক তাহলে কি জন্য বোর্ডোয় এসেছে?

বিশেষজ্ঞ জবাব দিল, "সবাই আপনার মত খবর পেয়ে এসেছে।"

তুমি কি করবে?

বিশেষজ্ঞ উত্তর দিল, "আমি যাওয়ার মতলব ত্যাগ করেছি। এখানে কিছু রোজ-গারের ব্যবস্থা আছে। আমি দোভাষী, ভিসা এবং ঘর ভাড়ার উপদেষ্টা। আমার অসুবিধা নেই।"

"আমি অবাক হলাম না। ঐ রকম দুঃসময়ে অল্প বয়সে পাকা ছোকরাদের সুদিন হয়। আবেগ-প্রবণতা বা কোন বিশেষ মতবাদের বাধা ওদের নেই। বিশেষজ্ঞকে সাথে নিয়ে একটি কাফেতে গেলাম। ও তৎকালীন অবস্থার একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা উপস্থাপিত করল ঃ হয়ত জার্মান সৈন্য কয়েকদিন বাদে চলে যাবে, বোর্ডোতে বসবাসের অনুমতি পাওয়া খুব মুস্কিল; ভিসা পাওয়া ততোধিক মুস্কিল, বেয়োন যাওয়ার জন্য স্পেনীয় ভিসা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওখানে অত্যন্ত ভিড়; মার্সাই সবচেয়ে ভাল, কিন্তু বড় দূর। দূর রাস্তাই বেছে নিলাম। আপনিও মার্সাই-এর রাস্তা ধরেছিলেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "আমেরিকান দূতাবাসেও অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু

হেলেনের পাসপোর্টে নাজি জার্ম্মান সরকারের শীলমোহর। সুতরাং জার্ম্মান সৈন্যকে ওর ভয়, একথা আমেরিকানদের বোঝানো সম্ভব নয়। তারা বলে, যে সব ইহুদি কাগজপত্র বিনা লোকের বাড়ির বাইরে শুয়ে কাটাচ্ছে, তাদের বিপদ অনেক বেশী। পাসপোর্ট দুটিই আমাদের শত্রু হল।

স্থির করলাম, বাগানবাড়িতে ফিরে যাব। পথে দু'বার ফরাসী পুলিশ গতি রোধ করতে, আমি গর্জ্জে উঠলাম আর পাসপোর্ট দুটি তাদের নাকের সামনে দুলিয়ে দিলাম। জার্ম্মান মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষ সম্পর্কেও কিছু বললাম। কাজ হল। ওরা রাস্তা ছেড়ে ছিল। কিন্তু কাফেতে ফিরে মালপত্র ফেরত চাইতে কাফের মালিক বলল, আমাদের মালপত্রের ব্যাগের কথা শোনেওনি। তারপর হেসে বলল, "ইচ্ছা হলে পুলিশ ডাকুন। তবে আমার মনে হয়, নিজেদের ভালর জন্যই তা করবেন না।"

আমি বললাম, "আমার পুলিশ দরকার নেই। ব্যাগ ফেরত দিন।"

মালিক, ওয়েটারের দিকে ফিরে বলল, "হেনরি, উনি চলে যেতে চাইছেন ..."

হেনরি এবার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, "সাবধান, হেনরি। জার্ম্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি?"

"তবে রে শয়তান" বলে হেনরী ঘুষি ওঠাল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "সার্জেন্ট, গুলি করো!"

হেনরি চারপাশে সার্জেন্টকে খুঁজতে লাগল। ঘুষি তেমনি বাগানো। সেই ফাঁকে শরীরের সব শক্তি দিয়ে ওর তলপেটে কষে এক লাথি মারলাম। ও হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল। মালিক এবার একটা বোতল হাতে এগিয়ে এল। আমিও একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে তার মাথা দরজায় ঠুকে ভেঙ্গে ফেললাম। মালিককে ভাঙ্গা বোতল তাক করছিলাম। এমন সময় পিছনে আর একটা বোতল ভাঙ্গার আওয়াজ পেলাম। আমার চোখ তখনো মালিকের ওপর। হেলেন বলল, "আমিও বোতল নিয়ে রেডি হয়েছি। ব্যাগ ফেরত না দিলে, শয়তানটাকে মেরে ফেলব।" হেলেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে মালিককে ভাঙ্গা বোতল তাক করতে লাগল। আমি হেলেনকে আড়াল করলাম। ওরা পরস্পরকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগল।

এমন সময় দরজার বাইরে জার্ম্মান ভাষায় কেউ জিজ্ঞেস করল, এখানে কী হচ্ছে?

মালিক দেঁতো হেসে আগন্তুককে আপ্যায়ন করল। হেলেন ফিরে দেখল, যে অলীক সার্জেন্টকে বলেছিলাম হেনরিকে গুলি করতে, সে সশরীরে হাজির। সার্জেন্ট হেনরিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওর চোট লেগেছে?"

হেলেন বলল, "ঐ শুয়োরের বাচ্চার? ওর কিছু হয়নি।"

হেনরি তখন লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। হাতে ঘুষি বাগানো।

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল, "আপনারা জার্মান?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। এরা আমাদের জিনিষপত্র কেড়ে নিয়েছে।"

"আপনাদের কাগজপত্র আছে?" সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল। মালিক আবার দোঁতো

হাসল। ও অল্প জার্মান বোঝে। হেলেন ফোঁস করে উত্তর দিল, "অবশ্যই কাগজপত্র আছে! এই দেখুন পাসপোর্ট। আমি পার্টি অধিনায়ক জুর্গেন্সের বোন। আমরা— বাগানবাড়িতে থাকি।" বলা বাহুল্য সে অঞ্চলে ঐ বাগানবাড়ি নেই। হেলেন আবার বলল, "আমরা এক দিনের জন্য বোর্ডো বেড়াতে এসেছি। এই চোরটার কাছে জিনিসপত্র রেখেছিলাম। ও এখন বলছে কোনদিন আমাদের দেখেওনি। আপনি আমাদের দয়া করে সাহায্য করবেন?"

সার্জেন্ট মালিককে জিজ্ঞেস করল, "এসব সত্যি?"

হেলেন গর্জে উঠল, "নিশ্চয় সত্যি। জার্মান মহিলা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।" এও নাজিরাজের একটি বাঁধা বুলি।

সার্জেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

মেক্যানিকের আলখাল্লা দেখিয়ে বললাম, "এই মহিলার ড্রাইভার।"

সার্জেন্ট এবার মালিকের উপর গর্জে উঠল, "ঠিক আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? সব ফেরত দাও।" মালিকের সব হাসি উবে গেল।

সার্জেন্ট আবার বলল, "মেরে তোর হাড় আলগা করে দেব নাকি, বিদেশী শয়তান কাঁহাকা?" ফরাসী নাগরিককে তার নিজভূমে বিদেশী শয়তান বলে গাল দেওয়া খুবই অদ্ভুত শোনাল।

মালিক হেঁকে বলল, "হেনরি কোথায় এদের জিনিষ রেখেছ? দিয়ে দাও।" সার্জেন্টের দিকে ফিরে বলল, "আমি এর কিছু জানি না। সব হেনরির বদমায়েশি!"

হেলেন চেঁচিয়ে উঠল, "ও মিথ্যা কথা বলছে। বেয়ারার উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। ভালোয় ভালোয় আমাদের জিনিষ দিয়ে দাও, নাহলে গেস্টাপো ডাকব।"

মালিক হেনরিকে এক লাথি মারল। লাথি খেয়ে ও পালিয়ে গেল। মালিক সবিনয়ে সার্জেন্টকে বলল, "মাফ করুন। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আপনারা আমার খরচায় কিছু খান।"

হেলেন বলল, "সব চেয়ে ভাল কগন্যাক নিয়ে আসুন।"

মালিক কাউন্টারের উপর গ্লাস সাজাল। সার্জেন্ট বলল, "আপনি প্রকৃতই সাহসী মহিলা।"

হেলেন নাজি কেতাব থেকে উদ্ধৃতি করে বলল, "জার্মান মহিলা কোন কিছুকেই ভয় করে না।"

সার্জেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী গাড়ি চালান?"

ওর নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, "মার্সেডিস্ গাড়ি চালাই, ফ্যুরার হিটলার যে গাড়ি চড়েন।"

এ জায়গাটা বেশ সুন্দর, তাই না? কিন্তু আমাদের দেশের মত নয়।

আমি সাগ্রহে জবাব দিলাম, "হ্যাঁ। এ জায়গাটা সত্যি সুন্দর, কিন্তু জার্মানীর কোন অংশের সাথে এর তুলনা হয় না।"

আমরা তিনজন কগন্যাক খেলাম। অতি উৎকৃষ্ট কগন্যাক। হেনরি জিনিষপত্রের ব্যাগ এনে রাখল। ভাল করে দেখলাম। সার্জেন্টকে জানালাম, "সব ঠিক আছে।"

সব হেনরির দোষ, স্যার। মালিক বলল, "হেনরি, এখন থেকে এখানে তোমার চাকরি নেই। নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে রাস্তা দেখ।"

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, সার্জেন্ট, হেলেন বলল, "আপনি প্রকৃত জার্মান যোদ্ধা এবং ভদ্রলোক।"

সার্জেন্ট প্রত্যুত্তরে স্যালুট করল। ওর বয়স মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। মালিক এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে বলল, "আমার দু'বোতল মদের দাম বাকি আছে। এঁরা বোতল দুটি ভেঙ্গেছেন।"

হেলেন সার্জেন্টকে মালিকের বক্তব্য জার্মানে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিল। আরও বলল "ওর দাম বাকী থাকতে পারে না। ও অভদ্র। আমরা আত্মরক্ষার জন্য বোতল দুটি ভাঙ্গতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

সব শুনে সার্জেন্ট বীরের ভঙ্গীতে বলল, "বিজেতার কিছু প্রাপ্য থাকে। অতএব, বিজেতার প্রাপ্য নিলাম।" কাউন্টার থেকে ও আর এক বোতল কগন্যাক তুলে নিল।

কাফের বাইরে এসে সার্জেন্ট হেলেনকে বোতলটি উপহার দিল। আমি চট করে ন্যাপস্যাকে পুরলাম। বেশী দেরী না করে বিদায় নিলাম। ভয় ছিল, সার্জেন্ট হয়ত মার্সেডিস গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু হেলেন চালাকি করে সব দিক রক্ষা করল। সার্জেন্ট বিদায় নেবার সময় বলে গেল, "এমন কাণ্ড আমাদের দেশে হতে পারে না। দেশে আইন শৃঙ্খলা আছে।"

ও চলে গেলে ভাবলাম, জার্মানীতে আইন শৃঙ্খলা আছে বটে। তবে তার অর্থ: অহেতুক অবর্ণনীয় নিপীড়ন, গুলি আর গণহত্যা। এ সবের থেকে কাফে মালিকের মত একলক্ষ খুদে বদমাশ দেশে থাকা অনেক ভাল।

"কেমন লাগছে?" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

চমৎকার। কিন্তু তুমি অত গালাগাল কোথা থেকে শিখলে?

ও হেসে জবাব দিল, "ক্যাম্পে। আমার এক বছরের ক্যাম্প-জীবন আজ সার্থক। কিন্তু তুমি ভাঙ্গা বোতল নিয়ে লড়তে কি করে শিখলে, আর লোকের জননেন্দ্রিয়ের উপর লাথি মারতেই বা শিখলে কোথা থেকে?"

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছিলাম। আমরা এক পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে বাস করি হেলেন, তাই শান্তিরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করি।

তামাশা করলেও, ঠিক কথাই বলেছিলাম। তখন মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা ছাড়া আমাদের বাঁচার রাস্তা ছিল না। বেশ কয়েকদিন আমরা কৃষকদের বাগান থেকে ফলমূল আর খামার থেকে দুধ চুরি করে নিজেদের কাজ চালালাম। মোটামুটি মন্দ লাগছিল না। ঐসব ছোটখাট চুরি যথেষ্ট বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। তবু মনে হত, বিরাট

ফ্র্তির কাজ করছি। একটু আগেই কাফের ঘটনা বলেছি। ওরকম ঘটনা অবশ্য প্রায় সব রিফিউজির জীবনে ঘটে থাকে। আপনারও ওরকম কিছু ঘটেছিল নাকি ?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "ঘটেছিল। তবে সেভাবে দেখলে, মজার ব্যাপার বটে।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "হেলেন সমস্ত ব্যাপারটাকে ফ্র্তির রঙমশাল হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিল। ও কখনো অতীতকে আঁকড়ে ধরত না। প্রতিদিনই অতীত ওর চলার পথে খণ্ড খণ্ড হয়ে যেত। ও ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে পড়ত শুধু ওর নিত্য ভাস্বর বাস্তবতা এবং উচ্ছ্বলিত জীবন। ওর সব অভিজ্ঞতার বয়স, বর্ত্তমান মুহূর্ত। সাধারণ মানুষের যা সারা জীবনে সঞ্চয়, ওর তা একদিনের খরচ। তবু ওর বেপরোয়া, বেহিসাবী চলনে পাগলামির লেশমাত্র ছিল না। ওর সব কিছু মোজার্টের সুরের মত শান্ত, সমাহিত। নীতিবোধ এবং দায়িত্ববোধের জাগতিক অর্থের অনেক উপরে পেঁাছেছিল হেলেন। ও যেন অতিবাস্তব মূল্যায়ন করতে শিখেছিল। ফলে ওর কাছে সাধারণ কোন কিছুর স্থান ছিল না। ও আতসবাজীর মত দপ করে জ্বলে উঠত, দহনের শেষে ছাই পড়ে থাকত না। সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল। বুঝেছিল, সঞ্চয় করে রাখা ওর পক্ষে অসম্ভব। একান্ত পীড়াপীড়িতে ও আমার তালে তাল দিতে বাধ্য হত। আমিও মূর্খের মত ওকে এক থেকে অন্য জায়গায় টেনে বেড়ালাম—বোর্ডো থেকে বেয়োন, বেয়োন থেকে মার্সাই, অবশেষে এখানে।

ফিরে দেখি বাগান বাড়ি ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। জার্মান বিমান বাহিনীর পোষাক পরা অফিসার এবং সৈন্য সামন্ত গর্ব্বিত ময়ূরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের কাজের জিনিষপত্র বিস্তর ছড়ানো। বড় গাছের নিচে একটি পাথরের দেবমূর্ত্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কিছু ফেলে যাইনি ত' ?"

"আমরা রেখে গেছি গাছে গাছে আপেল, সোনালী অক্টোবরের রেশমী বিকালবেলা আর আমাদের স্বপ্ন," হেলেন জবাব দিল।

আমরা শরতের ঊর্ণনাভ। যেখান থেকে বিদায় নেব, রেখে যাব রেশমী স্পর্শ। দুঃখ করো না, হেলেন।"

গাড়িবারান্দা থেকে একজন অফিসার অধস্তনকে হেঁকে নির্দ্দেশ দিল। হেলেন বলল, "ঐ শোনো, বিংশ শতাব্দী গর্জ্জন করছে। চল, এখান থেকে যাই। আজ রাতে কোথায় ঘুমাব আমরা ?"

কোন খড়ের গাদা খুঁজে নেব। কপাল ভাল হলে বিছানাও জুটতে পারে। যা হোক, দুজনে একসাথে ঘুমাব।"

ষোড়শ

শোয়ার্থস্ জিজ্ঞেস করলেন, "বেয়োনের দূতাবাসটি মনে আছে? ভোরে আগে রিফিউজিরা তার সামনে তিন চারটি লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকত। হঠাৎ একসময় সব ক'টি লাইন উধাও হয়ে সবাই মিলে দরজার সামনে দাঁড়ানোর জন্য ধাক্কাধাক্কি করত।"

আমি বললাম, "আমার মনে আছে, লাইনে দাঁড়াবার জন্য দূতাবাস কর্তৃপক্ষ টিকিট বিলি করতেন। তবু রিফিউজিরা অকারণে দরজার সামনে ভিড় করত। ওরা প্রথমে গুঞ্জন করত। একটি জানালা খোলার সাথে সাথে গুঞ্জন রূপান্তরিত হত চিৎকার এবং হট্টগোলে। প্রত্যেকে জানালা দিয়ে তারা পাসপোর্ট ছুঁড়ে দিতে চায়। এক সাথে শ'খানেক হাত উঠত। জনতা তখন একটি জঙ্গল ছাড়া কিছু নয়।"

কাফের মেয়ে তিনটির একটি তখন শুতে গিয়েছে। বাকি দুটির মধ্যে যেটি একটু সুন্দরী, সে হাই তুলতে তুলতে আমাদের টেবিলে এসে বলল, "আপনারা অদ্ভুত লোক। শুধুই কথা বলে চলেছেন। আমাদের শোবার সময় হয়েছে। কাফে খোলা থাকবে। আরও কিছুক্ষণ বসতে পারেন।"

মেয়েটি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ফালি সকালের তাজা রোদ ঘরে ঢুকল। হাতঘড়ি দেখলাম। শোয়ার্থস্ বললেন, "আজ জাহাজ ছাড়বে না। আগামীকাল রাতের আগে ছাড়বে না।"

উনি বুঝলেন, আমি ওঁর কথা বিশ্বাস করলাম না। উনি বললেন, "চলুন, বাইরে গিয়ে দেখি।"

নিস্তব্ধ কাফে এবং বেশ্যালয়ের পর সকালের হট্টগোল অসহ্য লাগল। শোয়ার্থস্ চুপচাপ ছিলেন। কয়েকটি বাচ্চা মাথায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে দৌড়ে গেল। আমরা ক্রমে বন্দরে পৌঁছলাম। সমুদ্রের জল অশান্ত। সকালের রোদে সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। কারুর ব্যস্ততার হেতু সে নিজে। অপর কারুর কাজ সম্পর্কে ব্যস্ততা। শুকনো পাতার মত আমরা কর্ম্মব্যস্ত লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলছিলাম। শোয়ার্থস জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিশ্বাস করলেন না যে, আগামীকাল রাতের আগে জাহাজ ছাড়বে না?

ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সকালের রোদ যেন ওঁর সহ্য হচ্ছিল না। আমি বললাম, "বিশ্বাস করার উপায় নেই। আপনিই বলেছিলেন, আজ জাহাজ ছাড়বে। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। আমার কাছে এর মূল্য অনেক।"

যেমন আমার কাছেও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই।

আমি উত্তর দিলাম না। দুজনে হাঁটতে লাগলাম। এক অস্থিরতার তাড়নায় মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। জীবন আমাকে রঙ্গীন দিন আর কোলাহলের আসরে ডাকছে। রাত

শেষ। রাতের ছায়ামূর্তি নিয়ে আর কত দুঃস্বপ্ন দেখব? হাঁটতে হাঁটতে একটি বড় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকানটির সব দিকে অজস্র পোস্টার লাগানো। খোলা জানালায় একটি কালো রঙের বোর্ডে সাদা চক দিয়ে লেখা, জাহাজ ছাড়ার সময় আগামী কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। শোয়ার্থস্ বললেন, "আমার কাহিনীও শেষ হয়ে এসেছে।"

ভাবলাম, একরকম মন্দ হল না। আর একদিন সময় পাওয়া গেল। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য নোটিশ না মেনে, দোকানের দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। দরজায় তালা লাগানো। রাস্তার দশ বারোজন রিফিউজি আমাকে দেখছিল। ওরা এগিয়ে এল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে নোটিশটি পড়ার ভাণ করল।

শোয়ার্থস্ বললেন, "হাতে অনেক সময় আছে, সুতরাং বন্দরেই কোথাও কফি খাওয়া যাক।"

কাপ হাতে নিয়ে, উনি তাড়াতাড়ি গরম কফি খেতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কটা বাজে।"

সাড়ে সাতটা।

এক ঘণ্টা বাদে দোকানের লোকজন আসবে। আপনাকে শুধু বেদনার কাহিনী শোনাতে ইচ্ছা করছিল না। ছিঁচকাঁদুনে মনে হচ্ছে, না?

না।

তবে কী মনে হচ্ছে?

একটি সুন্দর প্রেমোপাখ্যান।

শোয়ার্থস্‌কে অনেকটা আশ্বস্ত মনে হল। নিজেকে একটু সংযত করে বললেন, ধন্যবাদ। সবচেয়ে বেদনাময় পরিচ্ছেদটি আরম্ভ হল বিয়ারিৎস্-এ। শুনেছিলাম, সেন্টজীন-দ্য-লুজ্ থেকে একটি জাহাজ ছাড়বে। গিয়ে দেখলাম, আমাদের স্থান হবে না। হোটেলে ফিরে দেখি, হেলেন মেঝেয় শুয়ে আছে, মুখ বেদনায় কুঞ্চিত। বলল, "দারুণ খিঁচ ধরেছে। আপনা থেকেই চলে যাবে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও।"

আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

ও রাগ করে বলল, "ডাক্তার ডাকতে হবে না। এমনি ঠিক হয়ে যাবে পাঁচ মিনিট পরে। এখন যাও। দশ মিনিট বাদে এসো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেলেন হাত নেড়ে আমাকে যেতে বলল। কথা বলতে পারছিল না। চোখ মুখে এমন কাতর আকুতি যে আমার না সরে উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ডাক্তারের খোঁজ করতে, ডাঃ দুবয় বলে এক ডাক্তারের ঠিকানা মিলল। উনি অল্প দূরে থাকেন। তাঁর কাছে ছুটলাম। উনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হোটেলে এলেন।

হেলেন তখন বিছানায় শুয়ে। সারা মুখ ঘামে ভেজা। একটু শান্ত লাগছিল। আমাকে ধমকের সুরে বলল, "তুমি সেই ডাক্তার আনলে।" আমি যেন সবচেয়ে বড়

শত্রু। ডাঃ দুবয় ধীরে খাটের দিকে এগোলেন। ও ডাক্তারকে বলল, "আমার অসুখ করেনি।"

ডাঃ দুবয় হেসে বললেন, "সেটা আমাকেই বুঝতে দিন।" উনি ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বার করে সাজালেন। হেলেন বলল, "তুমি বাইরে যাও।"

আমি তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলাম। হেলেনের ক্যাম্পের ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার অপর পারে গ্যারেজের উপর মিচেলিন টায়ারের বিরাট বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। গ্যারেজ থেকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ আসছিল। যেন কেউ লোহার চাদর পিটিয়ে কফিন তৈরী করছে। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না। ডাঃ দুবয়কে দেখে তন্ময়তা ভাঙ্গল। ওঁর মুখে সাদা ছাগলদাড়ি। শুনেছিলাম, উনি বিশেষ বড় ডাক্তার নন। সাধারণতঃ বিয়ারিৎস্-এ টুরিস্টদের মধ্যে ওঁর অল্পস্বল্প প্র্যাকটিস, সর্দিজ্বর আর মাথাধরার দাওয়াই বিলি করেই শেষ। ওখানে তখন টুরিস্টের ভিড় নেই। একটি রোগী পেয়ে উনিও বর্তে গেছেন। ধীর পায়ে আমার কাছে এসে বললেন, "আপনার স্ত্রী····· "তারপর থামলেন।

ওর দিকে ভাল করে চেয়ে বললাম, "হয় ওর অসুখ সম্পর্কে সত্যি কথা বলুন, না হয় কিছুই বলবেন না।"

উনি মৃদু হেসে বললেন, "এইটা নিয়ে কোন ওষুধের দোকানে যান। প্রেসক্রিপশন ফেরত চাইতে ভুলবেন না। এ ওষুধ ওঁকে প্রায়ই দিতে পারেন। আমি সে রকমই লিখেছি।"

সাদা কাগজটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ওর কী হয়েছে ?"

এমন কিছু হয়েছে যাতে আপনার কিছু করবার নেই।

তবু ভেঙ্গে বলুন। অত রহস্য করবেন না। আমার সত্যি কথা জানতেই হবে।

আপনি বরং ওষুধের দোকানে যান। ওরাই আপনাকে সব বলে দেবে।

আপনি কী ওষুধ লিখেছেন ?

একটি শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ লিখেছি। প্রেসক্রিপশন বিনা এ ওষুধ কেনা যায় না।

আমি প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাকে কত ফী দিতে হবে ?"

কিছু দিতে হবে না। আপনি ওষুধটা এমন জায়গায় রাখবেন যেখান থেকে আপনার স্ত্রী সহজে খুঁজে পান। ওঁকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। উনি সব জানেন। ডাক্তার ধীর গতিতে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেলেন।

হেলেন, আমি বললাম, "এ সবের অর্থ কী ? তুমি অসুস্থ, তবু সে কথা স্বীকার করছ না কেন ?"

"জ্বালিও না। আমার খুশিমত বাঁচতে দাও," হেলেন খুব আস্তে জবাব দিল।

অসুখ সম্পর্কে কিছু বলতে চাও না ?

হেলেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কিছু বলবার নেই।"

আমাকে বলো না ; আমি কিছু উপকারও তো করতে পারি ?

না, লক্ষ্মীটি ! এ ব্যাপারে তুমি কোন কিছু করতে পারবে না। যদি পারতে, বলতাম।

আমার কাছে এখনো দেগা'র আঁকা ছবিটি আছে। দরকার হলেই বেচতে পারি। বিয়ারিৎস্-এ অনেক বড়লোক আছে। ছবি বেচে তোমাকে হাসপাতালে দেব।

কেন, হাসপাতাল থেকে আমাকে গ্রেফতার করানোর জন্য ? বিশ্বাস করো, ওতে কাজ হবে না।"

তোমার অবস্থা কি এত খারাপ যে হাসপাতালেও সারবে না ?

হেলেন প্রশ্নের জবাব দিল না। ওর শ্রান্ত, অসুস্থ চোখ মুখ দেখে আর জিজ্ঞাসাবাদ করলাম না। স্থির করলাম, ডাঃ দুবয়কে জিজ্ঞেস করব।

শোয়ার্থস্ একটু চুপ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার স্ত্রীর কি ক্যান্সার হয়েছিল ?"

শোয়ার্থস্ বললেন, "হ্যাঁ। আমার বহু আগে সন্দেহ করা উচিত ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞরা ওকে বলেছিলেন, দ্বিতীয়বার অপারেশন করিয়ে লাভ হবে না। ও একবার করিয়েছিল। সেই দাগই আমি দেখেছিলাম। বিশেষজ্ঞ ওকে সত্যি কথাই বলেছিলেন। ওর সামনে দুটি পথ খোলা : কয়েকটি অর্থহীন অপারেশন করিয়ে বাকি জীবন হাসপাতালে কাটানো, অথবা হাসপাতালের বাইরে হ্রস্বতর জীবন। ও স্থির করেছিল, অপারেশন করাবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "উনি অসুখের কথা আপনাকে গোপন করলেন কেন ?"

ঠিক তা নয়। ও ওর অসুখকে ঘৃণা করত। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। সব সময় বোধ করত, কতকগুলি দুষ্ট কীট দেহে বাসা বেঁধে, বাসাকেই কুরে কুরে খাচ্ছে। ভাবত ওর অসুখের কথা শুনলে, আমি বিরক্ত হব। এমন ভাবত, অগ্রাহ্য করেই হয়ত রোগমুক্ত হতে পারবে।

কখনো এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেননি ?

খুব কমই করেছি। ও নিজে ডাঃ দুবয়ের সাথে কথা বলত। পরে অবশ্য ডাক্তার আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন ; আরও ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, ব্যাথা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যাথা না বাড়লে মৃত্যু হয়ত দ্রুততর হবে। হেলেনকে অবশ্য জানাইনি। ও আমার কাছে এসব শুনতেও চাইত না। কেবল ভয় দেখাত, ব্যথার কষ্ট সহ্য করতে না দিলে আত্মহত্যা করবে। পরে আমিও বিশ্বাসের ভাণ করতাম,—যেন সত্যিই ওর নির্দোষ খিঁচ ধরে মাঝে মাঝে।

বিয়ারিৎস্ ত্যাগের সময় হয়ে এসেছিল। আমরা পরস্পরকে প্রতাবণা করে চললাম। হেলেন আমাকে লক্ষ্য করত। আমিও হেলেনকে লক্ষ্য করতাম। এইভাবেই চলছিল। প্রতারণার খেলায় কালের গতি সম্পর্কে উদাসীনতা দেখা দিল। ঘুমন্ত হেলেনের মুখের পানে চেয়ে থাকতাম। দেখতাম, ও মৃদু শ্বাস নিচ্ছে। আর অধীরভাবে আমার সবল হাত দুটি দেখতাম। এক অদ্ভুত হতাশা দেখা দিত। ভাবতাম, আমাদের মাত্র দুটি দেহ

আর চামড়ার তফাত। তবু কী দুরতিক্রম্য দূরত্ব। আমার তাজা রক্ত দিয়েও প্রিয়তমার দূষিত রক্ত নির্ম্মল করতে পারব না! কেন এ অক্ষমতা? সবই আমার বুদ্ধির অগোচর। মৃত্যুও ত' তাই!

প্রতিটি মুহূর্ত্ত তখন কত মূল্যবান। মনে হত আগামীকাল কোন অনাদি অনন্তের পরপারে। হেলেন চোখ মেললে দিন শুরু হত। হেলেন চোখ বুজলে, পাশে শুয়ে পড়তাম। মন আশা নিরাশার ধূসর গলিপথে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত। কত অলৌকিক আশায় নির্ভর করে অবাস্তব ফন্দি আঁটতাম। হয়ত সব ভুলে, মুহূর্তের জন্য কোন দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করতাম। কিন্তু সব স্বপ্ন রচনা সকালের আলোয় শিশির বিন্দুর সাথে মিলে উবে যেত।

ক্রমে শীত এল। দেগা'র আঁকা ছবিটি নিয়ে ঘুরতে শুরু করলাম। ওটি বেচতে পারলে আমেরিকা যাবার ভাড়া যোগাড় হবে। অনেক শহর আর গ্রামে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে সব জায়গায় ছবিটি বিক্রির চেষ্টা করে নায্য দাম পাইনি। চাষার কাজ করতেও বাধ্য হয়েছি। লাঙ্গল দিতাম, মাটি কাটতাম। তাতে দুঃখ ছিল না। অনেক প্রফেসার পেটের দায়ে কাঠ কাটত। এমন কি বিখ্যাত গায়িকাও মাঠে বীট বুনতে বাধ্য হয়েছিল। ফরাসী চাষী অন্য সব দেশের চাষীর মতই ব্যবহার করত। অল্প পয়সা দিয়ে বেশী কাজ করাত। কারণ, ঠেকা আমাদের। কোন চাষা পয়সা দিত না, শুধু খেতে আর রাতে শুতে দিত। কেউ তাড়িয়েও দিয়েছে। এভাবে মার্সাই পেঁছলাম। আপনি মার্সাই হয়ে এসেছেন?

উত্তর দিলাম, "আমিও মার্সাই হয়ে এখানে পেঁছেছি। মার্সাই তখন ফরাসী পুলিশ আর জার্ম্মান গেস্টাপোর লীলাক্ষেত্র। ওরা বিভিন্ন দূতাবাসের বাইরে অপেক্ষারত রিফিউজিদের শুয়োর ছানার মত ধরে নিয়ে যেত।"

শোয়ার্থস্ বললেন, "আমাদেরও ধরে ফেলত। ফরাসী বৈদিশিক দপ্তরের মার্সাইস্থিত অফিসার রিফিউজিদের বাঁচানোর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। আমার তখনো আমেরিকান ভিসা জোটানোর ঝোঁক যায়নি। যেন ভিসা পেলে ক্যান্সারও সেরে যাবে। অথচ ঐ দুর্লভ বস্তুটির জন্য আমেরিকায় তৈরি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং পণ্ডিতদের তালিকায় নাম থাকা প্রয়োজন; অথবা প্রমাণ, আপনার জীবন বিপন্ন। আমরা সবাই যে সমষ্টিগত ভাবে বিপন্ন, সে কথা কেউ বুঝবে না। এখানেও মানুষে মানুষে কত প্রভেদ রচনা। অসাধারণ থেকে সাধারণ মানুষকে এভাবে পৃথক করার সাথে নাজি মতাদর্শে অতিমানব আর্য্য জার্ম্মান জাতি থেকে মনুষ্যেতর অনার্য্য ইহুদি জাতির পৃথকীকরণের তফাত কোথায়?"

"আমেরিকানরা ত' সবাইকে নিতে পারে না!" আমি বললাম।

শোয়ার্থস্ বললেন, "বটে। সেক্ষেত্রে সব চেয়ে অখ্যাত নিঃস্ব লোককে নেওয়াই কি যুক্তিযুক্ত ছিল না?"

এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ওঁর জানা উচিত ছিল, যদি কোন

আমেরিকাবাসী এই মর্মে এফিডেভিট করে যে ভিসাপ্রার্থী আমেরিকা পৌঁছনর পর মার্কিন সরকারের দয়ার উপর নির্ভরশীল হবে না, তবেই আমেরিকান দূতাবাস ভিসা দিত। এবার উনি প্রায় সে কথা বললেন, "আমেরিকায় আমার পরিচিত কেউ ছিল না। একজন নিউইয়র্কের একটি ঠিকানা দিল। সেই ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে আমাদের অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে এক বন্ধু বলল, দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত অথবা পঙ্গু লোককে ভিসা দেওয়া হয় না। সুতরাং বলতে হবে হেলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। হেলেন আড়ি পেতে আমাদের কথাবার্তা শুনেছিল। মার্সাই-এর সবার মুখে তখন আমেরিকা পালানোর কথা।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা রাস্তার ধারে একটি রেস্তোরাঁয় বসেছিলাম। মৃদু বাতাস বইছিল। আমি তখনো আশা ত্যাগ করিনি। হয়ত কোন দয়ালু ডাক্তার হেলেনকে রোগমুক্ত বলে সার্টিফিকেট দেবেন। তবু দুজনে পরস্পরকে প্রতারণা করে চলছিলাম, যেন ওর অসুস্থতার প্রকৃত কারণ আমি জানি না। ওর ক্যাম্পের অধিকর্তাকে অনুরোধ করে লিখেছিলাম, তিনি যেন আমাদের বিপদগ্রস্ত বলে সার্টিফিকেট দেন। একটি ছোট ঘর খুঁজে উঠলাম। এক সপ্তাহ বসবাসের অনুমতি পেয়েছিলাম। বেআইনীভাবে রাতে রেস্তোরাঁয় ডিশ ধোয়ার কাজ করতাম। অল্প কিছু টাকা হাতে ছিল। ডাঃ দুবয়ের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ডাক্তারখানা থেকে কিছু মরফিনের এ্যাম্পুল কিনে নিয়েছিলাম। আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না।

রাস্তায় চোখ রেখে জানালার ধারে একটি টেবিলে বসেছিলাম। বসবাসের অনুমতি পাওয়ার ফলে এক সপ্তাহ আর লুকোনোর প্রয়োজন নেই। যেন এক নতুন বিলাসিতা উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ চমকে হেলেন আমার হাত ধরল। ওর দৃষ্টি বাইরে, অন্ধকারে। চুপিচুপি বলল, "জর্জ!"

কোথায়?

একটা খোলা গাড়ি চেপে চলে গেল।

ঠিক দেখেছ?

হেলেন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আমার মনে হল, অসম্ভব। গাড়ি করে যে ক'জন এর মধ্যে গেছে, সবার মুখ মনে করার চেষ্টা করলাম। আশ্বস্ত হতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "মার্সাইতে ও কী করতে আসবে?

পরক্ষণেই মনে পড়ল, ওর পক্ষে মার্সাইতে আসা খুব স্বাভাবিক। কারণ ফ্রান্সের সব রিফিউজি তখন মার্সাইতে এসে ঠেকেছে। বললাম, "এখান থেকে পালাতে হবে।"

কোথায় যাব?

স্পেনে যাব, হেলেন।

স্পেন কি আরও বিপজ্জনক নয়?

তাও ঠিক। গুজব রটেছিল, গেস্টাপোরা স্পেনে ঘাঁটি করেছে। স্পেনীয় পুলিশ

রিফিউজিদের গেস্টাপোর হাতে তুলে দিচ্ছে। আমরা উপায়ান্তরবিহীন। গুজবে কান দিলে চলে না।

আবার পুরানো খেলায় যোগ দিলাম। স্পেনীয় ভিসা পাওয়া সম্ভব, যদি পর্তুগীজ ভিসা থাকে। কিন্তু অপর কোন তৃতীয় দেশের ভিসা না থাকলে পর্তুগীজ ভিসা মিলবে না। ফ্রান্স ত্যাগের ভিসা পেতে সর্ব্বাধিক আমলাতান্ত্রিক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

এক রাতে বরাত খুলল। একটি মাতাল আমেরিকান যুবকের সাথে আলাপ হল। ও ইংরাজী জানা লোকের সঙ্গ খুঁজছিল। ও আমাদের টেবিলে এসে মদ খাওয়াল ওর বয়স বছর পঁচিশ। একটি জাহাজের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই জাহাজে আমেরিকা ফিরবে। ও জিজ্ঞেস করল, "আমার সাথে আমেরিকা যাবেন ?"

সাথে সাথে জবাব দিলাম না। মনে হল, ও অন্য গ্রহের বাসিন্দা। এখানকার কিছুই জানে না। বললাম, "আমার ভিসা নেই।"

তাতে আটকাবে না। এখানে আমাদের দূতাবাস আছে। লোকগুলি চমৎকার।

চমৎকার লোকগুলি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা ছিল। ওরা নিজেদের খুদে ভগবান ভাবত। সামান্য পদস্থ কর্ম্মীর সাথে দেখা করতে হলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত, যার ফলে প্রায়ই গেস্টাপোরা রিফিউজিদের ধরে নিয়ে যেত। অবশেষে কর্ত্তারা দূতাবাসের একটি পরিত্যক্ত ভাঁড়ার ঘরে অপেক্ষা করার অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছিলেন।

যুবকটি বলল, "আগামীকাল আপনাকে দূতাবাসে নিয়ে যাব।"

"বেশ, চমৎকার।" একথা বললাম বটে, ওর কথা একটুও বিশ্বাস করলাম না।

আমরা আরও কিছুক্ষণ মদ খেলাম। ওর নিষ্পাপ, তাজা মুখ যেন অসহ্য লাগছিল। কেবলই ব্রডওয়ের আলোক বন্যার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। ও যখন নিউইয়র্কের খ্যাতনামা নাটক, নাট্যশিল্পী, নাইট ক্লাব এবং শহরের হট্টগোলের কথা বলছিল, আমি হেলেনের মুখ লক্ষ্য করছিলাম। হেলেন অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে শুনছিল। একটু অবাক লাগল, কারণ কিছুদিন আগেও আমেরিকা যাওয়ার কথায় উৎসাহিত হত না। ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। ও সিগারেট খেতে খেতে হাসছিল। যুবকটি যখন তার প্রিয় নাটকের কথা বলল, হেলেন প্রতিশ্রুতি আদায় করল, ও হেলেনকে নিউইয়র্কের সেই নাটকটি দেখাতে নিয়ে যাবে। আমি মনে মনে জানতাম, আগামীকাল সকালে আমরা সবাই সব প্রতিশ্রুতি ভুলে যাব।

কিন্তু ভুল করেছিলাম। পরদিন ঠিক সকাল দশটায় যুবকটি আমাদের বাসায় এল। আমার সামান্য মাথা ধরেছিল। অথচ, হেলেন আমাকে ছাড়া যাবে না। সুতরাং তিন-জনই চললাম। দূতাবাসের বাইরে যথারীতি রিফিউজির ভিড়। যুবকটির সবুজ রঙের পাসপোর্ট অসাধ্য সাধন করল। পুরাকালে মিশরীয় রাজশক্তির করাল গ্রাস হতে পলায়-মান ইহুদীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লোহিত সাগরের মত অপেক্ষমান রিফিউজিরা দুভাগ হয়ে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিল।

তারপর যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ যখন যুবকটিকে

সবিস্তারে বোঝালেন কেন মার্কিন ভিসা দেওয়া সম্ভব নয়, ও বলে বসল এই মর্মে এফিডেভিট করবে যে আমেরিকা পেঁছনর পর আমরা সরকারী সাহায্য বিনা চলতে সক্ষম। আমরা হতভম্ব। আমি জানতাম, এফিডেভিটকারীর বয়স অন্ততঃ ভিসাপ্রার্থীর সমান হওয়া প্রয়োজন। ওর কত অল্প বয়স। কত সামান্য পরিচয়।

দূতাবাসে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে বিপন্ন বোধ করার কারণ বর্ণনা করে একটি বিবৃতি দাখিল করেছিলাম। বহু কষ্টে সুইজারল্যাণ্ডে পরিচিত লোকের মাধ্যমে কয়েকটি চিঠি জুটিয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, আমার কয়েক বছর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছে। এ প্রমাণও দেখিয়েছিলাম, আমাদের ধরবার জন্য জর্জ আশেপাশে ওৎ পেতে আছে। সব শুনে, ওরা এক সপ্তাহ বাদে দেখা করতে বলল। বাইরে এসে যুবকটি আমার করমর্দন করে বলল, "আপনার সাথে আলাপ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। এই আমার ভিজিটিং কার্ড। আমেরিকা পেঁছে দেখা করবেন।" ও বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "যদি দূতাবাসে কোন ঝামেলা হয়? আপনাকে কোথায় পাব?"

ও হেসে উত্তর দিল, "কী ঝামেলা হবে? সব ঠিক করে দিয়েছি। আমেরিকায় আমার বাবা বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক। শুনেছি, আগামীকাল ওরান যাওয়ার জন্য জাহাজ ছাড়বে। দেশে ফেরার আগে একবার ওরান দেখার ইচ্ছা আছে। আর কখনো যদি এদিকে আসা না হয়, তাই যতদূর সম্ভব এই বেলা দেখে নিচ্ছি।"

যুবকটি রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল। প্রায় সাথে সাথে আধ ডজন রিফিউজি আমাকে ঘিরে ওর নাম এবং ঠিকানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। বললাম, ওর বর্ত্তমান ঠিকানা জানি না। কেউ বিশ্বাস করল না। গালি দিল। শেষে, কার্ডে ওর দেশের ঠিকানা দেখালাম। ওরা লিখে নিল। বললাম, ও ঠিকানা লিখে লাভ নেই, কারণ সে তখন ওরান ভ্রমণ করছে। ওরা বলল, জাহাজ ছাড়ার আগে ওর জন্য বন্দরে অপেক্ষা করবে। ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলাম, কার্ডটি দেখিয়ে পণ্ড করেছি!

হেলেনকে সব খুলে বললাম। ও হাসল। সে সন্ধ্যায় ওকে খুব শান্ত লাগছিল। আমাদের দুটি ভাড়াটে ঘরের একটি ভাড়া দিয়েছিলাম। বাড়ির মালিকের একটি ক্যানারি পাখী আমাদের ঘরে ছিল। খাঁচায় বসে ও উম্মত্তের মত গাইছিল। মাঝে মাঝে একটা উটকো বিড়াল এসে লোলুপ চোখে খাঁচার নিচে বসেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। তবু হেলেন জানালা বন্ধ করতে দিল না। ব্যথা বাড়লে ও জানলা বন্ধ করতে দিত না। ও জিজ্ঞস করল, "বাগানবাড়িটা মনে পড়ে?"

বললাম, "এমন মনে পড়ে যেন আমার নিজের ওখানে থাকার অভিজ্ঞতা হয়নি। যেন বাড়িটা সম্পর্কে কারুর কাছে শুনেছি।"

ও আমার দিকে ভাল করে চেয়ে বলল, "তোমার হয়ত সত্যিই ঐরকম মনে হয়। আসলে প্রত্যেক মানুষের ভিতর অনেকগুলি মানুষ বাস করে। প্রতিটি মানুষ পৃথক। কখনো কখনো ওরা স্বাধীন হয়ে উঠে সমগ্র মানুষটিকে চালনা করে। তখন সমগ্র

মানুষটির পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু, পরে সমগ্র মানুষটি তার স্বকীয়তা ফিরে পায়। তাই না ?"

জবাব দিলাম, "আমার ভিতরে কখনো কোন পৃথক মানুষ বাস করেনি। আমি চিরকালই একঘেয়েমি ধরানো অপরিবর্তিত।"

হেলেন সজোরে মাথা নেড়ে বলল, "ভুল। একদিন বুঝবে, তুমি ভুল বলছ।"

এসব কথার অর্থ কী, হেলেন ?

ওকথা ভুলে যাও। দুষ্টু বিড়াল আর পাখীটাকে দেখ। পাখীটা আনন্দ করতে করতেই মরবে !

বিড়ালটা ওকে ধরতে পারবে না। ও খাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হেলেন প্রাণভরে হেসে বলল, "খাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ ! কে তা থাকতে চায় ?

দরওয়ানের চিৎকার আর গালাগালে ভোরে ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে দরজা খুলে দেখি, না কোথাও পুলিশ নেই। দরওয়ান তখনো চেঁচাচ্ছে, "রক্ত শুধু রক্ত ! আর কোন রকমে মরতে পারল না ! কী কাণ্ড ! এখন পুলিশ ডাকতেই হবে। লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের এই প্রতিদান ! আমার পাঁচ সপ্তাহের ভাড়া এখনো বাকী !"

অন্য ভাড়াটেরাও তখন আস্তে আস্তে আমার পাশের ঘরের দরজার সামনে জমায়েত হচ্ছিল। ষাট বছরের এক বুড়ী এক হাতের কব্জির শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছে। খাট বেয়ে মাটিতে রক্ত পড়ছে। ল্যাকম্যান বলে একজন ফ্রাঙ্কফুর্টের রিফিউজি (ও মার্সাই বন্দরে সাধুসন্তদের ছবি আর মালা বিক্রি করে পেট চালাত) বলে উঠল, "ডাক্তার ! ডাক্তার ডাকো !"

দরওয়ান এবার চটে গিয়ে উত্তর দিল, "ডাক্তার ! ডাক্তার কি করবে ? দেখতে পাচ্ছেন না, বুড়ী বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মরেছে ? মানুষকে বিশ্বাস করলে, ভাল ব্যবহার করলে, এইভাবে ঠকতে হয়। আমরা বরং পুলিশ থাকব। যে কজন রিফিউজিকে খুশি গ্রেফতার করে নিয়ে যাক। বুড়ীর খাটটাই বা কি করে পরিষ্কার করব বুঝতে পারছি না !"

"আচ্ছা বুড়ির খাট আমরা পরিষ্কার করে দেব। পুলিশ ডেকো না," ল্যাকম্যান উত্তর দিল।

বুড়ীর ঘর ভাড়া ? কে দেবে ?

আমরা চাঁদা উঠিয়ে মিটিয়ে দেব, একটি লাল কিমোনো পরা বুড়ী বলল, "কোথায় যাব বল ? আমাদের দিকটাও একটু দেখ।"

বুড়ীর উপকার করতে গিয়েই এই ঝঞ্ঝাট হল ! তাও যদি গয়নাগাটি রেখে মরত, তবু একরকম চলত ! দরওয়ান বুড়ীর জিনিষপত্র ঘেঁটে দেখতে লাগল। একটি ন্যাড়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল। তার বিবর্ণ হলুদ আলো কোনমতে ঘরের অন্ধকার ঠেকিয়ে রাখছে। খাটের নিচে একটি সস্তা স্যুটকেস দেখা যায়। দরওয়ান হাঁটু গেড়ে বসে স্যুটকেসটি টেনে এনে খুলল। ওর থেকে কয়েকটি পুরানো কাপড় আর

জনতো বেরোল। লাল কিমোনো পরা বন্ড়ী (এ মার্সাইয়ের কালো বাজারে পনুরানো মোজা বিক্রি আর ভাঙ্গা চীনামাটির বাসন মেরামত করে পেট চালাত) একটি ছোট বাক্স দেখাল। দরওয়ান বাক্সটি খনুলল। বাক্সে রয়েছে চেনের সাথে ছোট পাথর বসানো একটি রিং। ও জিজ্ঞেস করল, "চেনটা সোনার, না গোল্ড পেনুটিং করা ?"

"সোনার", ল্যাকম্যান বলল।

"সোনার হলে বনুড়ী এটা বিক্রি করে মরত", দরওয়ান বলল।

মানন্ষ সব সময় পেটের জনালায় আত্মহত্যা করে না, ল্যাকম্যান শান্তভাবে উত্তর দিল, "সোনার ঠিকই। পাথরটা হয়ত চননী। মোট সাত আটশো ফ্র্যাঁ'র কম হবে না।"

আপনি হাসাবেন না।

ঠিক আছে, তোমার হয়ে আমিই জিনিষটা বিক্রি করব।

অর্থাৎ আমাকে আবার ঠকাবেন, এই ত' ? না, মশায়, ঐটি চলবে না।

পনুলিশ ডাকতেই হল, এড়ানো গেল না। পনুলিশ আসার আগেই রিফিউজি ভাড়াটেরা যার যার ধান্ধায় বেরোল। বেশীর ভাগই দনুতাবাসে ধর্ণা দিতে। কেউ কাজ খনুঁজতে, কেউ কিছনু বেচে রোজগার করতে। বাকি রিফিউজিরা কাছাকাছি একটি গীর্জায় গেলাম। সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

তখন গীর্জায় প্রার্থনা হচ্ছিল। স্ত্রীলোকরা কালো পোষাক পরে সার বেঁধে বসেছে, যেন কালো মাটির ঢিবি। অর্গ্যান বাজছে। অনেকগনুলি বড় মোমবাতি জনলছে। তার আলো সোনালী কাজ করা পবিত্র পাত্রের উপর ঠিকরে পড়ছে। পাত্রে যীশনুর রক্ত রাখা আছে, যার সাহায্যে প্রভু এই দনুনিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তনু তারপর ? তারপর ধর্ম্মান্ধদের উন্মত্ত যনুদ্ধ, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, নাস্তিকদের নিপীড়ন এবং আগনুনে পনুড়িয়ে মারা,—এ সবই মানব কল্যাণের জন্য।

আমি বললাম, "আমরা বরং রেল স্টেশনে যাই। ওখানে একটু গরম হবে।"

"আচ্ছা, একটু পরে যাব." হেলেন বলল।

হেলেন প্রার্থনার স্থানে গিয়ে নতজাননু হয়ে তন্ময়চিত্তে প্রার্থনা করল। কার কাছে, কি জন্য প্রার্থনা করল, বনুঝতে পারলাম। অস্নাব্রনুকের গীর্জার কথা মনে পড়ল। তখন মনে হয়েছিল, স্ত্রীলোকটিকে চিনি না। পরে এই কয়েক মাসে ও অনেক কাছে এসেও দনুরে সরে গিয়েছিল। এখন যেন আরও দনুরে সরে যাচ্ছে। সব বাঁধন খনুলে এক অন্ধকার জগতে মিশে যেতে চায়, যেখানে নাম নিষ্প্রয়োজন, যেখানকার আইন কানননুও সেখানকার একান্ত নিজস্ব। সে ক্ষণিক তিমির প্রবাস থেকে ফিরে এলেও যেভাবে ওকে এ যাবত পেয়েছি, আর পাব না। ও আমার থাকবে না। হয়ত কখনই ও আমার হয়নি। বস্তনুতঃ কে বা কার ? কও কি সনুদনুর অতীতে শনুরনু হওয়া এক প্রহেলিকাময় রীতির ধনংসাবশেষ নয় ? কত রাতে কত বারই ত' হেলেন এমন পিছন ফিরে নিজের সমস্যার সমাধান খনুঁজেছে। তখন আমি কেবল হিসাবরক্ষকের ভনুমিকা নিয়েছি। হিসাব পরীক্ষকের ভনুমিকা

নেইনি। এই দুর্জ্ঞেয়া, অসুখী প্রিয়তমা যেটুকু বলেছে, সেটুকু বিশ্বাস করাই তখন আমার কাজ। প্রশ্ন করা নয়।

অনেক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী প্রার্থনা করলে?"

হেলেন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে জবাব দিল, "আমেরিকান ভিসা।"

বুঝলাম, ও সত্যি কথা বলল না। হয়ত ঠিক উল্টো প্রার্থনা করেছে। কয়েক দিন যাবত আমেরিকা যাত্রার প্রসঙ্গে ওর নৈতিক বিরোধিতার আভাস পাচ্ছিলাম। এক রাতে ও বলল, "আমেরিকা গিয়ে কী করবে? অত দূর পালানোর কী দরকার? ওখানে পেঁাছে হয়ত দেখবে, আর এক আমেরিকায় পালানো দরকার। ও আর পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে। ভবিষ্যতের সব আশা ত্যাগ করেছিল। মৃত্যুর কালো ছায়া ওর দৌড়ে বেড়ানোর ইচ্ছাটুকুও হরণ করেছিল। অস্ত্রোপচারকারী যেমন এক অঙ্গের পর আর একটিতে অস্ত্রোপচার করে অবাক বিস্ময়ে বিমোহিত হয়, মৃত্যুও ওকে নিয়ে তেমন রহস্যের খেলায় মেতেছিল। ফলে, ও হয়ত কখনো কম্প্রদৃষ্টি প্রেমময়ী, পর মুহূর্ত্তে বিদ্বেষ বিরাগময়ী। কখনো জুয়াড়ীর মত দুঃসাহসী এবং বেহিসাবী, কখনো হতাশ এবং ক্ষুধার্ত। তবু, তিমিরলোক যাত্রা থেকে আমার কাছে ফিরে সব সময়ই ও মাটির পৃথিবী খুঁজে পেত। তাই শেষ পর্য্যন্ত ওর কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না।

একজন রিফিউজি জানাল, পুলিশ চলে গিয়েছে। ল্যাকম্যান বলল, "চলুন, মিউজিয়মে যাই। মিউজিয়মটি বেশ গরম।"

"এখানে মিউজিয়ম আছে?" জিজ্ঞেস করল একটি কুঁজো যুবতী। ছ'সপ্তাহ আগে ওর স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে, তখনো ছেড়ে দেয়নি।

হ্যাঁ, এখানে একটি মিউজিয়ম আছে।

পরলোকগত শোয়ার্থস্‌কে মনে পড়ল। হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আসবে?"

না, এখন যাব না। বরং চল, বাড়ি ফিরে যাই।

বুড়ীর শব দেখার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হেলেনের জন্য ফিরতে বাধ্য হলাম। দরওয়ান ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে। বোধহয় ইতিমধ্যে সোনার চেন আর রিং এর দাম কষানো হয়েছে। ও বলল, "পোড়াকপালী বুড়ী বেচারীর ঠিক নামটিও কেউ জানে না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "বুড়ীর পাসপোর্ট বা ভিসা নেই?"

হতভাগীর ছিল শুধু একটা কাঠের তৈরী গয়নার বাক্স। তাও পুলিশ আসার আগে রিফিউজিরা নিজেদের মধ্যে লটালী করে নিয়ে নিয়েছে। ওতে কোন কাগজপত্র ছিল না। বুড়ীকে আর একবার দেখবেন নাকি?

আমি বললাম, "না।"

হেলেন বলল, "আমি দেখব।"

হেলেনের সাথে চললাম। বুড়ীর ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুটি রিফিউজি স্ত্রীলোক ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করছিল। ওরা মৃতদেহটি এমনভাবে

নাড়াচাড়া করছিল, যেন সাদা কাঠের তক্তা। বুড়ীর খোলা চুল খাট বেয়ে মাটিতে লুটোচ্ছিল। একটি স্ত্রীলোক আমাকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করল।

আমি বেরিয়ে গেলাম। হেলেন ঘরের মধ্যে রইল। কিছুক্ষণ পরে ওর খোঁজে আবার ঐ ঘরে গেলাম। ও একা অপরিসর ঘরটিতে খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শবদেহের সাদা চুপসে যাওয়া মুখ আর একটি আধ বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললাম, "চলে এসো।"

ও ফিসফিস করে বলল, "মরে গেলে সবাইকে ঐরকম দেখায়? ওকে কোথায় কবর দেবে?"

ঠিক বলতে পারব না। হয়ত গরীব লোকদের যেখানে দেয়, ওকেও সেখানে কবর দেবে। তার জন্য পয়সাকড়ি লাগলে, দরওয়ান চাঁদা ওঠাবে।

হেলেন উত্তর দিল না। খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "কখন কবর দেবে?"

হয়ত কাল কিংবা পরশু। ওর দেহের ময়না তদন্ত হতে পারে।

কেন ময়না তদন্ত হবে? ও আত্মহত্যা করেছে, একথা ওরা বিশ্বাস করবে না?

বিশ্বাস করতেও পারে, হেলেন।

দরওয়ান এসে বলল, "কাল বুড়ীর দেহ হাসপাতালে চেরাই হবে। শিক্ষানবীশ ডাক্তাররা কাজটা করবে। ফি দিতে হবে না।" ও জিজ্ঞেস করল, "চা কিংবা কফি খাবেন?"

হেলেন বলল, "না।"

দরওয়ান বলল, "তবে একাই কফি খাই। সারাদিন বড় উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছি, যদিও তেমন কারণ ছিল না। আমোদেরও ত' একদিন যেতে হবে।"

ঠিক, হেলেন বলল, "তবু কেউ বিশ্বাস করবে না যে, একদিন তাকেও যেতে হবে।"

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, হেলেন বিছানায় বসে কান পেতে কিছু শুনছে। ও জিজ্ঞেস করল, "তুমিও গন্ধ পাচ্ছ?"

কিসের?

শবদেহের। আমি পাচ্ছি। জানালা বন্ধ করো।

কোথাও কোন গন্ধ নেই, হেলেন। মৃতদেহ এত তাড়াতাড়ি পচে না।

কিন্তু আমি গন্ধ পাচ্ছি।

ও হয়ত ফুল আর পাতার গন্ধ। ভাড়াটেরা মৃতদেহের পাশে কিছু ফুলের তোড়া আর মোমবাতি রেখেছিল। তারই গন্ধ হতে পারে।

ফুলের তোড়া রাখল কেন? কালই ত' ওর দেহটা টুকরো টুকরো করে কাটবে। কাজ হয়ে গেলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করবে।

না, হেলেন, হাসপাতাল শবদেহ বিক্রি করে না। ময়নাতদন্তের পর দাহ করা অথবা দেওয়া হয়। আমি বাঁ হাত দিয়ে ওর কাঁধ জড়াতে চেষ্টা করলাম। ও হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, "কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলে ভাল লাগে না।"

কে তোমাকে থামিয়ে দিল ?

ও আমার কথা শুনতে পেল না। ও বলল, "কথা দাও, ওরা আমাকে চেরাই করবে না ?"

কথা দিলাম।

জানলাটা বন্ধ করে দাও। আমি আবার গন্ধ পাচ্ছি।

একটি বিড়াল জানালার চৌকাঠে বসে চাঁদনী রাতের তারিফ করছিল। আমি হিস্ হিস্ আওয়াজ করতে, ও লাফিয়ে চলে গেল। জানালা বন্ধ করতে একটু বেশী শব্দ হল। হেলেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ও জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ?"

একটা বেড়াল।

বেড়ালটাও গন্ধ পেয়েছে।

অহেতুক মাথা খারাপ করছ, হেলেন। বেড়ালটা রোজ রাতে জানালায় বসে লক্ষ্য করে, কবে ক্যানারি পাখীটা খাঁচার বাইরে বেরোবে। ঘুমিয়ে পড়ো। কোথাও গন্ধ বেরোচ্ছে না।

তাহলে আমার নিজের শরীর থেকেই পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

ওর দিকে ভাল করে চেয়ে বললাম, "তোমার গা থেকে পচা গন্ধ বেরোবে কেন ? জ্যান্ত মানুষের গা থেকে পচা গন্ধ বেরোয় না, হেলেন। মিথ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে মাথা খারাপ করছ।"

"বুড়ীর মৃতদেহ থেকে না বেরোলে, নিশ্চয়ই আমার গা থেকে বেরোচ্ছে। তুমি মিথ্যে কথা বলো না," হেলেন রাগ করে উত্তর দিল।

হায় ভগবান! জ্যান্ত লোকের গা থেকে পচা গন্ধ বেরোতে পাবে না, হেলেন। বোধ হয়, কোন রেস্তোরাঁয় রসুন ভাজছে। এই যে, দাঁড়াও ··· এক বোতল ও ডি কোলন (ঈদানিং কালো বাজারে ঐ জিনিষটি বেচে কিছু পয়সা পাচ্ছিলাম) নিয়ে এসে কয়েক ফোঁটা ওর গায়ে, বিছানায় ছিটিয়ে দিয়ে বললাম, "দেখ কেমন সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এইবার।"

ও সিধে হয়ে বসল। আমাকে বলল, "তাহলে স্বীকার করছ যে, আমার গা থেকেই দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ? নইলে ও ডি কোলন ছেটাতে না।"

কিছুই স্বীকার করিনি, করছিও না। ও ডি কোলন ছিটিয়েছি, শুধু তোমাকে শান্ত করতে।"

হেলেন বলল, "তোমার মনের কথা বেশ বুঝতে পেরেছি। তুমি নিজেই আমার গায়ের দুর্গন্ধ টের পেয়েছ। ঐ মড়াটার মত দুর্গন্ধ। মিথ্যে কথা বলো না! সপ্তাহ খানেক ধরে আমিও পাচ্ছি। তোমার চাউনিতে বোঝা যায়, সত্য গোপনের চেষ্টা করছ। মনে কর, কিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ, আমি দেখছি না! কিছুই আমার নজর এড়ায় না। জানি, তুমি আজকাল আমার উপর কত বিরক্ত। প্রতিদিন আমি নিজের চোখ দিয়েই দেখতে পাই, বুঝতে পারি, আমাকে একটুও ভাল লাগে না। স্পষ্ট বুঝি, তুমি ডাক্তারের

কথা বিশ্বাস কর না। ডাক্তার তোমাকে আমার রোগের কথা গোপন করে। তাই এমন একটা কিছু আন্দাজ করে নিয়েছ, যা ডাক্তার বলেনি। তবু স্বীকার কর না কেন ?"

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলাম। চাইছিলাম, আরও কিছু বলার থাকলে, বলে যাক। থামাব না। ও নিজেই থেমে গেল। কাঁপছিল। দু হাতের উপর ভর করে, সামনে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছে। এ মানুষের অবয়ব নয়। অস্পষ্ট, পাণ্ডুর ছায়ামাত্র। চোখদুটি কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁটে একগাদা রঙ। শুতে যাবার আগে লিপস্টিক লাগিয়েছিল। আহত জন্তুর মত তাকিয়েছিল। যেন, লাফিয়ে আমার টুঁটি কামড়ে ধরবে।

ওর ঠাণ্ডা হতে অনেক সময় লাগল। তারপর আমি তিনতলায় বাউম্ নামে এক রিফিউজির ঘরে গিয়ে এক বোতল কগন্যাক ধার করে আনলাম। বিছানায় বসে কগন্যাক খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল। কখন বুড়ীর মৃতদেহ নিতে লোক এসেছে। সিঁড়িতে ওদের ভারী বুটের শব্দ হচ্ছিল। অপরিসর সিঁড়ির ধারে স্ট্রেচার ঠেকে যাচ্ছিল। ঘরের পাতলা পার্টিশন ভেদ করে ওদের ঠাট্টা তামাশা আমার কানে পেঁছিল। এক ঘণ্টা বাদে বুড়ীর ঘরে নতুন ভাড়াটে এল।

সপ্তদশ

কিছুদিন যাবৎ বাসনপত্র, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ফেরি করে চালাচ্ছিলাম। ও কাজে সন্দেহজনক স্যুটকেস প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে দু দিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখি, হেলেন নেই। চিন্তায় পড়লাম। দরওয়ান বলল, ও প্রায়ই বাইরে যায়! সেদিন ও গিয়েছিল। না, কোন পুলিশ ওর খোঁজ করতে আসেনি। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে।

ও অনেক দেরী করে ফিরল। চোখ মুখে উদ্ধত ভাব। আমার দিকে তাকাল না। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছু জিজ্ঞেস না করলে পাছে কদর্থ করে, তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় গিয়েছিলে হেলেন ?"

বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

এই আবহাওয়ায় বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ এই আবহাওয়াতেই ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমার পিছনে অত গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না।

গোয়েন্দাগিরির বাসনা আমার নেই, হেলেন। শুধু চিন্তা করছিলাম, হয়ত তোমাকে পুলিশ ধরেছে।

ও কর্কশ হেসে উত্তর দিল, "পুলিশ আমাকে কোনদিন ধরতে পারবে না।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত, হেলেন।"

ও পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আর প্রশ্ন করলে, আবার বেরিয়ে যাব। প্রতি পদে

কেউ লক্ষ্য করবে, এ বরদাস্ত করব না। বাইরের লোক এমন ভাবে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে না। তারা এমন প্রশ্নও করে না।

ওর কথার অর্থ বুঝলাম। ও বলতে চায়, বাইরের লোকের কাছে ও স্ত্রীলোক, রোগী নয়। ও তাই চায়। কারণ, রোগী হওয়ার অর্থ মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা।

ওর রাতের অন্ধকার সহ্য হত না। ভীত মনের উপর অন্ধকার যেন মাকড়ষার জাল বিছাত। রাতে ঘুমের মাঝে কেঁদে উঠত। ভোরে সে কথা মনে করতে পারত না। স্নায়ু শান্ত করার জন্য ওর কিছু ঘুমের ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন হয়েছিল। লুইস নামে এক-জনকে (ও পেশায় ডাক্তার হলেও তখন ঠিকুজি, কোষ্ঠি বিক্রি করে পেট চালাত) জিজ্ঞেস করলাম। লুইসও ডাঃ দুবয়ের কথার পুনরাবৃত্তি করল। বলল, কিছু করা অসম্ভব, কারণ অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছে।

পাছে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তাই তখন থেকে ও আরও দেরীতে ঘরে ফেরা ধরল। আমি কোন প্রশ্ন করতাম না। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, কেউ গোলাপের তোড়া রেখে গিয়েছে। আমার আবার বেরোনো প্রয়োজন ছিল। ফিরে দেখি, তোড়াটি নেই। বন্ধু-বান্ধবরা জানাল, হেলেন বারে অপরিচিত লোকের সাথে মদ খাওয়া ধরেছে। বুঝলাম, আমাদের শেষ আশা আমেরিকা। ততদিনে আমেরিকান দূতাবাসের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করার অনুমতি পেয়েছিলাম। শুধু অপেক্ষা করেই দিন কাটতে লাগল।

শেষে একদিন ধরা পড়লাম। দূতাবাসের মাত্র বিশ কদম দূরে পুলিশ হঠাৎ জায়গাটা ঘিরে ফেলল। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম। তাতে পুলিশের সন্দেহ হল। বন্ধু ল্যাকম্যান এক বাড়ির খোলা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পুলিশ ধরতে পারল না। আমি ঠিক ওর পিছনে ছিলাম। একটি পুলিশ হঠাৎ পা বাড়িয়ে আমাকে আটকে দিল। পালাতে পারলাম না। সাদা পোষাক পরা আর একজন জোয়ান পুলিশ হাসতে হাসতে তার সহকর্ম্মীকে বলল, "এই লোকটাকে ভাল করে ধরো। ওর বিশেষ তাড়া মনে হচ্ছে।" ছ' জন একসাথে ধরা পড়লাম। কাগজপত্র পরীক্ষার পর ইউনিফরম পরা পুলিশ আমাদের সাদা পোষাক পরা পুলিশের হাতে সমর্পণ করে চলে গেল। বন্ধ ট্রাকে করে নিয়ে শহরতলির একটি নির্জ্জন বাড়িতে আমাদের রাখল। বাড়িটার চারপাশে বাগান। কাছাকাছি অন্য বাড়ি ঘর নেই। এ কাহিনী শুনে হয়ত আপনার মনে হচ্ছে, একটা বাজে সিনেমার গল্প। বিগত কয়েক বছরের ইউরোপের ঘটনাবলীও কি একটি জঘন্য রক্তপিপাসু সিনেমার গল্প মনে হয় না?

জিজ্ঞেস করলাম, "সাদা পোষাক পরা পুলিশগুলি কী ছিল? গেস্টাপো?"

শোয়ার্থস্ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "আজ আশ্চর্য্য লাগে, ওরা আরও আগে কেন ধরতে পারেনি। জানতাম, জর্জ্জ আমাদের খোঁজ করা ছাড়েনি। যে জোয়ান গেস্টাপোটা আমি ধরা পড়ার সময় হাসছিল, ও কাগজপত্র দেখামাত্র জর্জ্জের নাম বলল। দুর্ভাগ্যক্রমে হেলেনের পাসপোর্টও আমার সাথে ছিল। ভেবেছিলাম, আমেরিকান দূতাবাসে প্রয়োজন হবে। জোয়ান গেস্টাপো ব্যঙ্গ করে বলল, "অবশেষে ছোট্ট মন্দা,

মাছটাকে খুঁজে পেয়েছি। এবার মাদীটাও আসবে। কি বলেন, মিঃ শোয়ার্থস্ ?" ও ক্রূর হেসে আমার মুখে এক ঘুষি মারল।

ঠোঁট থেকে রক্ত মুছে ফেললাম। জোয়ান গেস্টাপো আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠিকানাটা আমাদের বলে দিলে সব থেকে ভাল হয় না ?"

আমার কোন ঠিকানা নেই, আমি উত্তর দিলাম, "আমি নিজে স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক সপ্তাহ আগে ঝগড়া হওয়ার পর ও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে।"

ঝগড়া করেছ ? তবে রে আপদ ! ও আমরা মুখে আর এক ঘুষি মেরে বলল, "এটা বৌ-এর সাথে ঝগড়া করার শাস্তি।"

একজন গেস্টাপো অপর একজনকে জিজ্ঞেস করল, "একে এবার ঝুলিয়ে দেব ?"

মেয়েলি মুখওলা একটি জোয়ান গেস্টাপো উত্তর দিল, "ঝুলিয়ে দেওয়ার অর্থ ওকে বুঝিয়ে দাও, মোলার।"

মোলার তখন বলল,"জননেন্দ্রিয়কে কয়েক প্যাঁচ টেলিফোনের তার দিয়ে জড়িয়ে, ঐ তার থেকে আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" জোয়ান গেস্টাপোটি জিজ্ঞেস করল,"জিনিষটা কি রকম মজার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ? ক্যাম্পে কিছুদিন ত' কাটিয়েছেন। আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির সাথে আশা করি পরিচয় আছে।"

আমি সত্যিই এই কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানতাম না। জোয়ান গেস্টাপো আবার বলল, "এটি আমার আবিষ্কার। তবে, আপনার খাতিরে সহজ কিছু চেষ্টা করে দেখতে পারি। যেমন, অণ্ডকোষ দুটিকে এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হবে যে, এক বিন্দু রক্ত চলাচল করবে না। এক ঘন্টার মধ্যেই আপনি অত্যন্ত চেঁচামেচি শুরু করবেন। তখনই আপনাকে ঠান্ডা করার জন্য মুখের মধ্যে কাঠের গুড়ো ঠেসে দেওয়া হবে।"

ওর চোখদুটি হাল্কা নীল কাঁচের গুলির মত লাগছিল। ও এবার বলল, "আমাদের কাছে নিত্য নতুন আইডিয়া পাবেন। আগুন নিয়ে কত রকম খেলা দেখানো যায় ভাবতে পারেন ?"

দুটি গেস্টাপো অট্টহাসি হাসল। ও মৃদু হেসে বলল, "একটি উত্তপ্ত লাল তার মানুষের কান অথবা নাসিকার মধ্যে ধীরে ধীরে ঢোকালে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। আপনাকে পেয়ে ভাল হয়েছে, মিঃ শোয়ার্থস্। আপনার উপর বিভিন্ন রকম পরীক্ষা চালানো যাবে।"

কথা শেষ করে ও এবার আমার দুই পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। ওর গায়ের সুগন্ধির সুবাস পাচ্ছিলাম। বিনা প্রতিবাদে চুপ করে রইলাম। কারণ, প্রতিবাদ করতে কিংবা সাহস দেখাতে গেলে, ওরা সানন্দে সে প্রতিবাদ বা সাহস গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে মেতে উঠবে। আর এক গেস্টাপো খাটো লাঠি দিয়ে মাথায় সজোরে এক ঘা মারল। 'উঃ' বলে লুটিয়ে পড়লাম। ওরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। জোয়ান গেস্টাপো তার অধস্তনকে বলল, "মোলার, একে চাঙ্গা করে তোল।"

কয়েকটা টান দিয়ে মোলার একটা সিগারেট আমার চোখের পাতার উপর ঠেসে

ধরন। যেন চোখের উপর কেউ গলা লোহা ঢেলে দিল। ওরা তিনজন অট্টহাসি হাসল।
জোয়ান গেস্টাপো তেমনি হাসিমুখে বলল, "ওঠো বাছা।"

কোনমতে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে ও এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বলল, "এ শুধু গরম করার জন্য ব্যায়াম করানো হচ্ছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। সারা জীবন পড়ে আছে,—আপনার গোটা জীবন। এর পরের বার ভাণ বা ঢং করার আগে জেনে রাখুন, আরও অনেক আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়া আমাদের জানা আছে। হয়ত এবার আপনাকে সিলিংএ ছুঁড়ে দেওয়া হবে।

আমি মোটেই ঢং করিনি। আমার হার্টের দোষ আছে। আপনারা যা খুশি করুন। এর পরের বার আমার উঠবার শক্তি থাকবে না।

ও দুটি গেস্টাপোকে জিজ্ঞেস করল, "বাছা বলছে হার্ট খারাপ। আমরা ওর কথা মেনে নেব?"

ও আর এক ঘুষি মারল। কিন্তু, বুঝলাম, একটু কাজ হয়েছে। যা হোক, আমাকে মৃত অবস্থায় জর্জের হাতে তুলে দেওয়ার সাহস ওর নেই। ও জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠিকানা মনে পড়েছে? দাঁত কটা অক্ষত থাকতে বলার চেষ্টা করা সহজ হবে।"

আমি জানি না। জানলে আমারই ভাল হত।

বাছাকে হীরো মনে হচ্ছে। কী দুঃখ! আমরা ছাড়া আর কেউ এ হীরোকে চিনবে না।

ও পর পর কয়েকটা লাথি মারল। ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম, যাতে মুখ বা জননেন্দ্রিয়ে চোট না লাগে। যুবকটি শেষে বলল, "মনে হচ্ছে, আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এখন ঘরে বন্ধ করে রেখে দাও। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আবার খেলা শুরু করা যাবে। রাতের বৈঠকে কী আনন্দ!"

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে এ ধরনের অত্যাচারের পরিচয় পেয়েছি। গ্যেটে এবং শীলারের মত, এও জার্মান সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বহু তল্লাসি করেও ওরা আমার লুকোনো বিষের শিশি এবং ব্লেডের খোঁজ পায়নি। এক খণ্ড কর্কের চাদরের আড়ালে ব্লেডটা আমি প্যাণ্টের কাফের মধ্যে আলগা করে সেলাই করে নিয়েছিলাম।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। হতাশায় মন ভরে গিয়েছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্য ভাবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার পরিবর্ত্তে বোকামি করে ধরা পড়ার দরুন ধিক্কার বোধ করছিলাম।

ল্যাকম্যান আমাকে গ্রেফতার হতে দেখছে। অবশ্য ওর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, গেস্টাপো ধরেছে। কারণ, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল ফরাসী পুলিশ সবাইকে ধরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরছি না দেখে, হেলেন হয়ত ফরাসী পুলিশের কাছে জানতে চাইবে কে এবং কেন আমাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু জোয়ান গেস্টাপোটি কি তার অপেক্ষা করবে? ধরে নিয়েছিলাম, আমার গ্রেফতারের সাথে সাথে জর্জকে জানানো হয়েছে। মার্সাইতে থাকলে, রাতে ও আমাকে 'ইন্টারভিউ' করবে।

হেলেনের চোখ ভুল করেনি। জর্জ মার্সাইতেই ছিল। ও সশরীরে হাজির হয়ে, আমার প্রতি বিশেষ নজর দিল। তার বিশদ বর্ণনা করে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না।

কয়েদ ঘর থেকে টেনে বার করে ওরা আমার উপর বেশ কয়েক বালতি জল ঢেলে দিল। তারপর হিড়হিড় করে টেনে আবার কয়েদ ঘরে বন্ধ করে দিল। লুকোনো বিষের সম্বলটির বলেই অত অত্যাচার মুখ বুজে সইতে পেরেছি। কপাল ভাল, জোয়ান গেস্টাপোটির অত্যাধুনিক নিপীড়নের ফিরিস্থিতে জর্জের বিশেষ আস্থা ছিল না। তবে নিপীড়ক হিসাবে ও অন্যের কাছে হার মানার পাত্র ছিল না।

জর্জ সে রাতে একটু দেরী করে এল। একটি বিশেষ ধরণের টুলের উপর খাড়া হয়ে বসল, যেন বিগত শতাব্দীর সীমাহীন ক্ষমতার প্রতীক অথবা বিংশ শতাব্দীর পাপের শীলমোহর। শয়তানের দুই অবতার, হাসিমুখ জোয়ান গেস্টাপো আর জর্জ, সীমাহীন বদামি আর অবিমিশ্র নৃশংসতার প্রতিমূর্ত্তি। তুলনা করলে, হাসিমুখো গেস্টাপোকেই অধিকতর বদ বলতে হয়। কারণ, ও নিপীড়ন করত আনন্দ পাবার জন্য আর জর্জ নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে।

"ইতিমধ্যে পালানোর প্ল্যান ফেঁদে ফেলেছিলাম। জর্জ আসার পর এমনভাবে চললাম, যাতে ও আমাকে ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করে। ওর চোখ মুখে ভাল খাওয়া দাওয়া করা বড়লোকের মত ঘৃণার ভাব। যেন এমন অবস্থায় পড়ে ওর কত বিরক্তি। এ ধরনের লোক কিন্তু অল্প টোকাতেই ভেঙ্গে পড়ে।

উত্তর দিলাম, "আমি জানি। শুনেছিলাম, এক গেস্টাপো একটি লোককে লোহার চেন দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলছিল। এমন সময় সেই চেনের একটা কোণ গেস্টাপোর হাতে ফুটে গেল। ও তাতেই কঁকিয়ে উঠল। অত মার খেয়েও মৃতপ্রায় লোকটি একটু উঃ আঃ করেনি।"

শোয়ার্থস্ বললেন, জর্জ একটা লাথি মেরে বলল, "তাহলে আজ আমাদের দরদাম করার পালা এসেছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমার দরদামে উৎসাহ নেই। শুধু বলতে চাই, তুমি যদি হেলেনকে ধরে নিয়ে যেতে চাও, ও আবার জার্মানী থেকে পালাবে অথবা আত্মহত্যা করবে।"

"বাজে কথা!" জর্জ ফোঁস করে উঠল।

ওর নিজের জীবনের মূল্যবোধ আর নেই। ও জানে, ক্যান্সার হয়েছে এবং তা সারবে না।

জর্জ আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বলিস না শুয়োরের বাচ্চা। ওর ক্যান্সার হয়নি, হয়েছে স্ত্রীরোগ।"

"ওর ক্যান্সার হয়েছে। জুরিখে প্রথম অপারেশনে ধরা পড়ে। সেই অপারেশনটাই অত্যন্ত দেরীতে হয়েছিল। ডাক্তার ওকে সব বলেছে," আমি বললাম।

কোন ডাক্তার বলেছে?

যে অপারেশন করেছে। হেলেন জানতে চেয়েছিল।

নিষ্ঠুর শুয়োরের বাচ্চা ডাক্তার! জর্জ গর্জ্জে উঠল, "ঐ ডাক্তারকেও ধরব! এক বছরের মধ্যে সুইজারল্যান্ডও আমাদের দখলে আসবে।"

আমি হেলেনকে জার্ম্মানী ফিরে যেতে বলেছিলাম। ও ফিরতে নারাজ। হয়ত আমার সাথে ছাড়াছাড়ি হলে ফিরতে পারে।

আমাকে হাসাবার চেষ্টা করো না।

তোমার খাতিরে এবং হেলেনের প্রত্যাবর্ত্তন সহজতর করতে, আমি এমন কিছু করতে প্রস্তুত যার জন্য বাকি জীবন ও আমাকে ঘৃণা করবে।

দেখলাম, জর্জ্জের মনে দাগ কাটছে। দুহাতের চেটোয় মুখ রেখে ওর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিলাম। চোখের ব্যথায় তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ও জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবে ?"

হেলেন ভাবে অসুস্থতার সঠিক কারণ জানতে পারলে ওকে আমি আর সহ্য করতে পারব না, ভালবাসব না। এটাই ওর সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ। যদি বলি ওর অসুস্থতা সম্পর্কে সব জানি, ও আর কখনো আমার মুখ দেখবে না।

জর্জ্জ ভাবতে লাগল। ওর চিন্তাধারা বুঝতে পারলাম। ও স্পষ্টই দেখল, আমি যে বুদ্ধি দিয়েছি সেটিই হেলেনকে জার্ম্মানী ফেরানোর একমাত্র রাস্তা। আমাকে নিপীড়ন করে হেলেনের ঠিকানা মিললেও, হেলেন চিরকালই ওকে ঘৃণা করবে। অপরপক্ষে হেলেনের সাথে দুর্ব্যবহার করলে, হেলেন আমাকে ঘৃণা করবে। সেই অবসরে ও পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে বলতে পারবে, "তোমাকে আগেই বলেছিলাম।" ও জিজ্ঞেস করল, "হেলেন কোথায় আছে ?"

একটা মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে বললাম, "বাড়িটার চারপাশে গলি, অনেক ছোট ছোট ঘর আর দরজা আছে ! পুলিশ গ্রেফতারের চেষ্টা করলে ও সহজেই পালাতে পারবে। আমি একা গেলে পালাবে না।"

"আমি একা গেলে ?" জর্জ্জ জিজ্ঞেস করল।

তুমি একা গেলে ভাববে, আমাকে খুন করেছ। ওর কাছে বিষ আছে।"

যত বাজে কথা !

একটু চুপ থেকে জর্জ্জ জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রস্তাবে রাজি হলে, প্রতিদানে কী চাও ?"

আমাকে মুক্তি দিতে হবে।

খানিকক্ষণ ভেবে, জর্জ্জ হাসল, দাঁত শিকারী জন্তুর মত ঝকঝক করল। জানতাম, ও কখনই আমাকে হেলেনের সাথে দেখা করতে দেবে না। ও বলল, "ঠিক আছে, এসো। আমার সামনে হেলেনকে সব বলবে। চালাকি করবে না।"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে, ও বলল, "চল, যাই।" ও উঠে দাঁড়াল। মুখ হাত ধুয়ে নাও।

একটা গেস্টাপো বলল, "আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।" ও জর্জ্জকে স্যালুট করে, আমাকে জর্জ্জের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। জর্জ্জ বলল, "আমার পাশে বসো। রাস্তা চেন ?"

ক্যানাবিয়ের থেকে চিনি।

ঠাণ্ডা রাত ভেদ করে গাড়ি চলল। ভেবেছিলাম, আস্তে চললে কিংবা থামলে, পালাব। কিন্তু জর্জ দরজায় চাবি দিয়ে দিয়েছিল। রাস্তায় চেঁচামেচি করে লাভ হত না। চেঁচামেচি বাইরে পেঁছনোর আগেই ও আমাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলত। আমি বসবার পর ও বলল, "এখনো সত্যি কথা না বললে, গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দেহটাকে লঙ্কাগুঁড়োর উপর গড়িয়ে দেব।" চুপ করে বসে রইলাম। একটা বাতিবিহীন ঠেলা-গাড়ির সাথে ধাক্কা এড়ানোর জন্য ও খুব জোর ব্রেক করল। আমি সীটের সামনে গড়িয়ে গেলাম। ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "কাপুরুষ কোথাকার! অসুখের ভান করতে হবে না!"

উঠে বসে বললাম, "মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব।"

"দুর্ব্বল কাপুরুষ কোথাকার!"

ইতিমধ্যে প্যান্টের পায়ের কাফের হাল্কা সেলাইগুলি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে-ছিলাম। আর একবার ব্রেক করতে হল। সেই ফাঁকে হাতড়ে হাতড়ে কাফের ভাঁজে লুকানো ব্লেডটা খুঁজে পেলাম। তৃতীয়বার ব্রেক করতে, উইন্ডস্ক্রীনে মাথা ঠুকে গেল। যখন ঠিক হয়ে সীটে বসলাম, ব্লেডটি আমার হাতে। শোয়ার্থস্ আমার দিকে তাকালেন। কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছে। বললেন, "জর্জ কিছুতেই পালাতে দিত না। আপনি বুঝতে পারছেন ত' ?"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

গাড়িটা একটা গোল চক্কর ঘুরবার মুখে আমি আচমকা চেঁচিয়ে উঠলাম, "সাবধান, ডান দিকে দেখো!"

ওতে ফল হল। জর্জ যন্ত্রচালিতের মত মাথা ঘুরিয়ে, শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরল। পা দিয়ে ব্রেক চাপল। সেই সুযোগে খোলা ব্লেড হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ছোট্ট, দাড়ি কামানোর ব্লেড। সারা গলায় বেড় পাবে না। তাই গলার একধার থেকে নিয়ে ওর কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত টেনে দিলাম। ও স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত উঠিয়ে দুহাতে গলা চেপে ধরল। তারপর ডান দিকের দরজার উপর লুটিয়ে পড়ল। ওর ডান হাত হাতলের উপর পড়ায় দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল। জর্জের দেহের উপর দিক গাড়ি থেকে গড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দেহের নিচের অংশ তখনো পাদানিতে। গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। গাড়িটা কাঁটাঝোপে আটকে থেমে গেল।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখলাম। তখনো ইঞ্জিন চলছিল। থামিয়ে দিলাম। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছিল। মনে হচ্ছিল, জর্জের গলা থেকে রক্ত বেরোনোর শব্দ শুনছি! গাড়ির রানিং বোর্ডে রক্তমাখা ব্লেডটা পড়েছিল। ব্লেডটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, পাছে জর্জ লাফিয়ে উঠে প্রতিশোধ নেয়। ওর পাদুটো একবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল। আমিও ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একটু পরে আবার কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলাম। গাড়ির বাতিগুলি নিভিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করলাম। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। আমার দ্বিতীয় কর্তব্য আগে স্থির করিনি। তখনই ভেবে নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তখন মূল্যবান।

জর্জের জামাকাপড় খুলে নিয়ে বান্ডিল বাঁধলাম। নগ্ন দেহটা টেনে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলাম। বেশ কিছু সময়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কপাল ভাল হলে, মৃতদেহ সনাক্ত করাও প্রায় অসম্ভব হবে। দেখলাম, গাড়িটি অক্ষত রয়েছে। কিছুদূর চালালাম। পথে একবার বমি করলাম। গাড়িতে টর্চ লাইট ছিল। দরজা আর সীটে রক্ত লেগেছিল। রাস্তার ধারে একটা গর্তের জলে জর্জের জামা ভিজিয়ে রক্তের দাগ মুছলাম। গাড়ির ভিতর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে নিলাম। নিজের জামা কাপড় থেকেও রক্তের দাগ মুছে ফেললাম। টর্চের আলোয় গাড়িটাকে আবার পরীক্ষা করলাম। এবার ড্রাইভ করে চললাম। জর্জের জায়গায় বসে চালাতে বমি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও অন্ধকার থেকে লাফিয়ে আসবে।

আমাদের বাসার বেশ কিছু দূরে একটি গলির মধ্যে গাড়ি পার্ক করলাম। বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তা পার হবার সময় জোরে শ্বাস নিতে বুকে লাগছিল। সারা দেহে বেদনা অনুভব করলাম। একটি মাছের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। দোকানের অপরিষ্কার আয়নায় দেখলাম, মুখটা অত্যন্ত ফুলেছে। বাসায় ঢুকবার সময় দরওয়ান লক্ষ্য করল না। ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। হেলেন ঘরে ছিল না। বাতি জ্বালাতে, বিছানা আর জামা কাপড়ের রাশি দেখতে পেলাম। ক্যানারি পাখীটির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ও গান শুরু করল। অল্প একটু অপেক্ষা করে, আমি ল্যাকম্যানের ঘরে টোকা দিলাম।

ও সঙ্গে সঙ্গে জাগল। রিফিউজিদের ঘুম খুব পাতলা। আমাকে দেখে বলল, "আরে, তুমি " তারপর চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "আমার বৌকে দেখেছ।"

ও মাথা নেড়ে বলল, "ও আজ সারাদিন বাইরে। এক ঘন্টা আগে দেখেছি, ও ফেরেনি।"

"হায় ভগবান!"

ল্যাকম্যান এমনভাবে তাকাল, যেন ওর সামনে কোন পাগল দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, "তাহলে হয়ত ও এমনি বেরিয়েছে, গ্রেফতার হয়নি।"

"হ্যাঁ, এমনিই বেরিয়েছে," ল্যাকম্যান বলল। ও জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হল?"

ওরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমি পালিয়ে এসেছি।

কারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? পুলিশ?

না। গেস্টাপো। সব মিটে গিয়েছে। তুমি এখন ঘুমাও।

গেস্টাপো তোমার এই ঠিকানা জানে?

জানলে কি এখানে ফিরে আসতাম? আমি ভোরের আগে চলে যাব।

একটু দাঁড়াও। অনেক খুঁজে ও কিছু মালা আর সাধু সন্তের ছবি নিয়ে এল। বলল, "এগুলি সব সময় কাছে রাখবে। এক এক সময় আশ্চর্য্য ফল দেয়। হার্শ বলে

একজন রিফিউজি এর বলেই পীরেনীজ্ পার হতে পেরেছিল। পীরেনীজের লোকরা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ত'। এগুলি মহামান্য পোপ নিজে আশীর্ব্বাদ করে দিয়েছেন।"

"সত্যি ?"

সুন্দর হেসে ও উত্তর দিল, "ওরা মানুষের প্রাণ বাঁচায়। স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপুষ্ট না হলে কি এ ক্ষমতা হত ? বিদায় শোয়ার্থস্।"

নিজের কামরায় ফিরে জিনিষপত্র গোছাতে লাগলাম। নিজেকে ফাঁকা ড্রামের মত শূন্য মনে হচ্ছিল। 'কেয়ার জেনারেল ডেলিভারি, মার্সাই পোষ্ট অফিস' এই ঠিকানা এবং হেলেনের নাম লেখা কতকগুলি চিঠি ওর ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম। কোন চিন্তা না করে চিঠিগুলি বাণ্ডিলের মধ্যে পুরলাম। প্যারীতে কেনা, হেলেনের সুন্দর ইভ্নিং ড্রেসটাও নিলাম। এবার ওয়াশ বেসিনে মুখ হাত ধোয়ার জন্য কল খুলে দিলাম। পুড়ে যাওয়া আঙ্গুলের মাথাগুলি জ্বালা করছিল। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। অনেক পরে সিঁড়িতে হেলেনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সদর দরজায় এসে দাঁড়াল যেন একটি বিধ্বস্ত সুন্দরী প্রেত। আমার সারা দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কেও কিছুই জানত না। জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে ?"

"এক্ষুণি আমাদের মার্সাই ছাড়তে হবে। এক্ষুণি।"

"কেন, জর্জের জন্য ?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। স্থির করেছিলাম, যতটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন, ততটুকুই বলব। ও কাছে এসে, আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে এই দশা করেছে ?"

"ওরা গ্রেফতার করেছিল। আমি পালিয়েছি। ওরা এবার খোঁজ শুরু করবে।"

"আমরা কোথায় যাব ?" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

"স্পেনে যাব।"

"কী ভাবে ?"

"যত দূর পারি মোটর গাড়িতে যাব। তাড়াতাড়ি রেডি হতে পারবে ?

"পারব।"

হেলেন কঁকিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যথা উঠেছে ?"

হেলেন মাথা নেড়ে জানাল, ওর ব্যথা উঠেছে ? মনে হচ্ছিল, ও আমার কত অজানা এক মহিলা। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কাছে আর ওষুধের এ্যাম্পুল আছে ?"

"খুব বেশী নেই।"

"আরও কিছু কিনে দেব।"

"আমাকে একটু একা থাকতে দাও," হেলেন বলল।

ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বড় ঘরটিতে গেলাম। আস্তে আস্তে সদর দরজা একটু ফাঁক হল। মনে হল একটি এক চক্ষু বাঁদর দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। দরজা খুলে গেল। আন্ডারওয়্যার পরা ল্যাকম্যান ফড়িং-এর মত বিনা শব্দে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে

এল। আধ বোতল কগন্যাক আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "পথে কাজ দেবে। রেখে দাও।"

তখনই এক চুমুক খেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আর এক বোতল বেচতে পার? আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে।"

প্রথম ভেবেছিলাম, জর্জের ব্রীফ কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দেব। পরে মত পাল্টিয়েছিলাম। ওর মধ্যে পেলাম, প্রচুর টাকাকড়ি, আর জর্জ, হেলেন এবং আমার পাসপোর্ট। ওর জামাকাপড়ে ভারী পাথর বেঁধে বন্দরের জলে ফেলে দিলাম। টর্চ লাইট দিয়ে পরীক্ষার পর, গ্রেগরিয়াসের সাথে দেখা করে বললাম, জর্জের পাসপোর্ট থেকে ওরটা উঠিয়ে, আমার ছবি বসিয়ে দিতে হবে। আমার প্রস্তাবে ঘাবড়িয়ে, ও সরাসরি ঐ কাজ প্রত্যাখ্যান করল। ওর ব্যবসা রিফিউজিদের পাসপোর্ট শুধরে দেওয়া। সে কাজ করার জন্য ও নিজেকে ভগবানের (রিফিউজিদের দুর্দশার জন্য ও ভগবানকে দুষত) চেয়ে ন্যায়পন্থী মনে করত। কিন্তু উচ্চ পদস্থ গেস্টাপো কর্মীর পাসপোর্টের দিকে ফিরে তাকানোও ওর মতে অন্যায়।

ওকে বললাম, শিল্পে যেমন চিত্রকরের স্বাক্ষর এঁকে দিতে হয়, আমার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। শুধু আসলটা তুলে, আমার ফটো লাগিয়ে দেওয়া। সব শুনে ও জিজ্ঞেস করল, "যদি ওরা অত্যাচার করে, আমার নাম বলে দেবে না ত'?

ওকে আশ্বস্ত করলাম। চোখ, মুখ এবং হাতের ক্ষত দেখিয়ে বললাম, ঐ চেহারায় রিফিউজি পাসপোর্ট নিয়ে ফ্রান্স থেকে পালাতে গেলে, পুলিশ আবার ধরবে। এই আমার একমাত্র সুযোগ। যা টাকা লাগে দেব। অবশেষে গ্রেগরিয়াস রাজী হল।

ল্যাকম্যান আর এক বোতল কগন্যাক আনল। ওকে দাম চুকিয়ে, হেলেনের কাছে গেলাম। হেলেন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ঐ টেবিলের ড্রয়ারেই ওর চিঠিগুলি ছিল। ড্রয়ারটা খোলা। আমাকে দেখে, সজোরে ড্রয়ার বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "এ কার কাজ? জর্জের?"

"আমি জানি না," আমি উত্তর দিলাম।

"জর্জ মরুক!" হেলেন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটি বিড়াল ক্যানারি পাখীর দিকে চেয়ে জানালার উপর বসেছিল। ও হেলেনকে দেখে পালাল। হেলেন জানালার খড়খড়ি খুলে দিল। মনের সব ঘৃণা মিশিয়ে আবার বলল, "জর্জ মরুক! মরেও শান্তি পাবে না "

ওর হাত ধরে জানালা থেকে সরিয়ে এনে বললাম, "চল, আমাদের যেতে হবে।"

দুজনে জিনিষপত্র নিয়ে নিচে নামলাম। সব ঘরের জানালা থেকে আমাদের দেখছিল। একজন হাত নেড়ে বলল, "শোয়ার্থস, ন্যাপস্যাক নিও না। ন্যাপস্যাক দেখলেই পুলিশ ধরছে। আমার একটা রেক্সিনের স্যুটকেস আছে। সস্তা আর খুব সুন্দর··· "

"ধন্যবাদ," আমি জবাব দিলাম, "স্যুটকেস দরকার নেই। কপাল ভাল হলেই চলবে।"

"আমরা তোমাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, শোয়ার্থস্।"

হেলেন আমার আগে আগে চলছিল। একটি স্ত্রীলোক বৃষ্টি ভিজে এক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ও হেলেনকে বৃষ্টি ভিজতে বারণ করল; আরও বলল, বৃষ্টিতে রাস্তায় লোক চলাচল কমে গিয়েছে। ভাবলাম, ভালই হয়েছে। গাড়ি দেখে, হেলেন জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি কোথা থেকে জোটালে?" জবাব দিলাম, "চোরাই গাড়ি। এতে বেশ কিছুদূর যাওয়া চলবে। এসো।"

রাস্তা তখনো অন্ধকার। গাড়ির সামনের কাঁচে বৃষ্টির ধারা নামল। কোথাও রক্তের চিহ্ন থাকলে, মুছে যাবে। গ্রেগারিয়াসের বাড়ির অদূরে থামলাম। বড় বড় কাঁচের দেওয়ালওলা একটি জামাকাপড়ের দোকান দেখিয়ে, হেলেনকে বললাম, "ঐ দরজাটার সামনে অপেক্ষা করো।"

"গাড়িতেই বসে থাকি না?"

"না। যেখানে বললাম, ঐখানে দাঁড়াও। কেউ এসে পড়লে, ভান করবে খদ্দেরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব।"

গ্রেগারিয়াস পাসপোর্ট মেরামত শেষ করে ফেলেছিল। ভয় দূর হয়ে, ওর মনে শিল্পীর গর্ব্ব দেখা দিয়েছে। ও বলল, "ইউনিফরম নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। ফটোতে আপনার গায়ে ইউনিফরম নেই। তাই জর্জ্জের ফটো থেকে মুখ কেটে দিয়ে, সেখানে আপনার মুখ বসিয়েছি।" পাসপোর্টের শীলমোহরগুলি অক্ষত রয়েছে। কোনমতে ধরার উপায় নেই, পাসপোর্টটা আসলে আমার নয়। শোয়ার্থসের পাসপোর্টও অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেলাম। আমি মুখ্য নাজি পার্টি অধিনায়ক শোয়ার্থস্ বনে গেলাম। জর্জ্জের ফটোর অবশিষ্টটুকুও ফেরত দিল। পথে সেটুকু টুকুরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দ্দমায় ফেলে দিলাম।

হেলেন অপেক্ষা করছিল। চাবি দিয়ে দেখলাম, গাড়ির ট্যাঙ্কে যথেষ্ট পেট্রোল আছে। বর্ডার পার হওয়ার আগে কিনতে হবে না। গ্লাভ্ বক্সে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল। সেগুলি থেকে বুঝলাম, গাড়িটি এর আগে দুবার ফরাসী বর্ডার পার হয়েছে। এক জোড়া দস্তানা, আর মিচেলিন টায়ার কোম্পানির ইউরোপের রাস্তাঘাটের ম্যাপও পেলাম।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে লাগলাম। ভোর হতে কয়েক ঘণ্টা বাকি। উদ্দেশ্য, পেরপিগাঁ পৌছনো। ভোরের আলো ফোটা পর্য্যন্ত বড় রাস্তা ধরে চললাম। খানিকক্ষণ পর হেলেন জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে লাগছে। আমি চালাব?"

"চালাতে পারবে? তুমি ত' ঘুমাওনি?"

"তুমিও ত' ঘুমাওনি।"

ওর দিকে তাকালাম। ওকে অত তাজা আর শান্ত দেখে অবাক লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, "কগন্যাক খাবে?"

"না। যতক্ষণ কফি না পাওয়া যায় ড্রাইভ করে যাব।"

কোটের পকেট থেকে কগন্যাকের বোতল বার করলাম। হেলেন মাথা নেড়ে জানাল

খাবে না। ও নিজেই একটা ইনজেকশন্ নিয়ে নিল । বলল, "আমি পরে কগন্যাক খাব। তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। আমরা পালা করে চালাব।"

হেলেন আমার থেকে ভাল ড্রাইভ করছিল। একটু পরে, ও গুন গুন করে বাচ্চাদের গান ধরল। গাড়ির দোলা আর হেলেনের গুঞ্জনে আমার তন্দ্রা এল। ঘুম এল না। এক এক করে গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিষ্প্রদীপ বিধি লঙ্ঘন করে, উজ্জ্বল হেডলাইট দুটি জেলে রেখেছিলাম। হঠাৎ হেলেন জিজ্ঞেস করল, "তুমি জর্জকে খুন করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"খুন করা ছাড়া উপায় ছিল না?"

"না।"

আমরা এগিয়ে চললাম। রাস্তার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। মনের মধ্যে নানা চিন্তা আনাগোনা করছিল। ক্রমে আর ভাবতে পারছিলাম না। যখন জাগলাম, তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। সকাল হয়েছে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হেলেন ড্রাইভ করছে। বিগত দিনের ঘটনাগুলি দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছিল। হেলেনকে বললাম, "তোমাকে যা বলেছি, সত্যি না।"

"আমি জানি," ও জবাব দিল।

"আমি জর্জকে খুন করিনি। অন্য লোককে খুন করেছি।"

"আমি জানি।"

হেলেন আমার দিকে ফিরে তাকাল না।

অষ্টাদশ

শোয়ার্থস্ বললেন, "ঠিক করেছিলাম, ফরাসী বর্ডারের শেষ শহরে হেলেনের জন্য স্পেনীয় ভিসা জুটিয়ে নেব। জর্জের পাসপোর্টের সাথে ভিসা ছিল। স্পেনীয় দূতাবাসের সামনে প্রচন্ড ভিড়। ধীরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলাম। জার্মান নম্বরপ্লেট দেখে লোক সরে গেল। আমাদের রাস্তা করে দিল। জনকয়েক রিফিউজি ত' পালিয়েও গেল। যেন ঘৃণা আর সন্দেহের সরণি বেয়ে স্পেনীয় দূতাবাসের প্রবেশ পথে এগোলাম। একটি ফরাসী পুলিশ স্যালুট করে, সম্ভ্রমভরে পাশে সরে দাঁড়াল। অলসভাবে স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে, দূতাবাসের ভিতরে ঢুকলাম। মনে হল, খুনী না হলে পুলিশ সম্মান করে না।

হেলেনের জন্য ভিসা পেতে দেরী হল না। আমার পাসপোর্ট দেখালাম। সহকারী স্পেনীয় রাষ্ট্রদূত মুখের দিকে তাকালেন। উনি আমার হাত দেখতে পাচ্ছিলেন না, কারণ দুহাতে দস্তানা (গাড়িতেই পেয়েছিলাম) পরেছিলাম। হাত দুটি দেখিয়ে বললাম,

"যুদ্ধের স্মৃতি, সামনাসামনি লড়াই করতে হয়েছে।" উনি সহানুভূতিভরে মাথা নেড়ে বললেন, "আপনাদের মত আমাদেরও অনেক লড়াই করতে হয়েছে। হিটলারের জয় হোক! হিটলার আমাদের কডিল্লোর মতই এক মহামানব।"

দূতাবাসের বাইরে এসে দেখি, গাড়ির কাছে আর লোকের ভিড় নেই। পিছনের সীটে এগারো বারো বছরের একটি ভীত কিশোর এক কোণে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। ওর হাতদুটো মুখে চাপা দেওয়া। শুধু চোখদুটি দেখা যাচ্ছে। হেলেন বলল, "ওকে আমাদের সাথে নিতেই হবে।"

"কেন?"

"ওর কাগজপত্রের মেয়াদ দুদিন পরে শেষ হবে। পুলিশ ধরতে পারলে ওকে জার্ম্মানীতে পাঠিয়ে দেবে।"

উৎকণ্ঠায় আমার পিঠ ঘামে ভিজে গেল। হেলেন এবার ইংরাজীতে বলল, "আমরা একটি জীবন নিয়েছি, সুতরাং একটি জীবন বাঁচানো আমাদের কর্ত্তব্য।" ও খুব শান্ত-ভাবে কথাগুলি বলল।

"তোমার কাগজপত্র দেখি," ছেলেটিকে বললাম।

কোন কথা না বলে, ও বসবাসের অনুমতিটি সামনে মেলে ধরল। ঐটি নিয়ে আবার স্পেনীয় দূতাবাসে গেলাম। আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার দূতাবাসে যাওয়া তখন কত মুস্কিল! গাড়িটি যেন শতকণ্ঠে আমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছিল। এক পদস্থ কর্ম্মচারীকে বললাম, আমার মনে ছিল না, আরও একটি ভিসা প্রয়োজন। জার্ম্মান সরকারের বিশেষ কাজের জন্যই ভিসাটি প্রয়োজন। স্পেনে কাজে লাগতে পারে। ও প্রথমে একটু ইতস্তত করল। শেষে একরকম আমাকে খাতির করার জন্যই ভিসা দিল। গাড়িতে ফিরে দেখি, জনতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়েছে। ওদের ধারণা, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চালান করার জন্যই ছেলেটিকে ধরা হয়েছে।

শহর ছেড়ে এগিয়ে চললাম। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চালানোর ফলে স্টিয়ারিং হুইলটি অত্যন্ত তেতে গিয়েছিল। চালাতে কষ্ট হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের গাড়ি ত্যাগ করতে হতে পারে। কিন্তু কোন যানবাহন ভর করে এগোব, সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিনি। পায়ে হেঁটে হেলেন পাহাড় অতিক্রম করতে পারবে না। আমাদের ফ্রান্স ত্যাগের অনুমতিপত্রও ছিল না, যা পায়ে হেঁটে বর্ডার পার হতে গেলে অবশ্য প্রয়োজন। দামি গাড়ি করে পার হলে ওসবের দরকার নেই।

আমরা ড্রাইভ করে এগিয়ে চললাম। একটি সংকীর্ণ গিরিপথে গাড়ি চলছিল। আমাদের কাছাকাছি মেঘ ঘোরাফেরা করছিল, যেন কেবল্‌ কারে চড়েছি। ছেলেটি তখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, একটুও নড়াচড়া করছিল না। স্বল্প দিনের অভিজ্ঞতায় ও সবাইকে, সব কিছুকে অবিশ্বাস করতে শিখেছে। এ ছাড়া ও আর কিছুই মনে করতে পারে না। তিন বছর বয়সে ও দেখেছে জাতীয় সমাজতন্ত্রী (নাজি) সংস্কৃতির পুরোধারা ওর ঠাকুর্দ্দার মাথার খুলি হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সাত বছরে ও

দেখেছে বাপের ফাঁসি হল। ওর ন' বছর বয়সে মাকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হল। এক কথায়, খাঁটি বিংশ শতাব্দীর সন্তান। ওকেও থাকতে হয়েছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখান থেকে কোনমতে পালিয়ে, বুদ্ধি করে জার্মান বর্ডার পার হয়েছে। ধরা পড়লে, কপালে আছে আবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং ফাঁসি? ওর গন্তব্যস্থল লিসবন। সেখানে ওর কাকা আছে, ঘড়িওয়ালা। গ্যাস চেম্বারে প্রাণ হারাণোর আগের রাতে মা ওকে শেষ কিছু উপদেশ, আশীর্ব্বাদ এবং ঐ কাকার ঠিকানা বলে যান।

এরপর সবই নির্ব্বিঘ্নে কাটল। কেউ ফ্রান্স ত্যাগের ভিসা চাইল না। আমি পাসপোর্ট দেখালাম। একটি ফাঁকা ফরমে গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য লিখে দিলাম। ফরাসী পুলিশ স্যালুট করে গেট তুলে দিল। আমরা ফ্রান্স ছেড়ে গেলাম। কয়েক মিনিট পরই স্পেনীয় পুলিশ আমাদের গাড়ির তারিফ করতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, প্রতি গ্যালনে ক'মাইল যায় ইত্যাদি। সুবিধামত জবাব দিলাম। ওরা তারপর স্পেনের গর্ব্ব, হিস্পানো সুইজা গাড়িরও প্রশংসা করল। বললাম, আমার নিজের একটি ঐ গাড়ি ছিল। গাড়িটির প্রতীকের,—একটি উড়ন্ত সারস, কথাও বললাম। ওরা আনন্দিত হল। জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি কোথাও পেট্রোল কিনতে পাওয়া যায়? ওরা জানাল, ওদের কাছেই বন্ধুরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য পেট্রোল মজুত আছে। আমার পেসেতা নেই। ওরা ফ্র"'র বদলে পেসেতা দিল। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর বিদায় নিলাম।

পিছন ফিরে দেখলাম, আর উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ নেই। নেই নিচু মেঘের রাশি। সামনে ছড়িয়ে এমন একটি দেশ যার সাথে ইউরোপের মিল অল্প। তখনো অবশ্য পুরোপুরি নিরাপদ হইনি। তবু ফ্রান্স থেকে বেরোতে পেরেছি, এও কম নয়। চোখে পড়ছিল রাস্তাঘাট, লোকজন এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, পাথুরে গ্রাম আর পথে গর্দ্দভ,— সব মিলে মনে হচ্ছিল, আফ্রিকায় এসেছি। পীরেনীজ পর্ব্বতমালা থেকে স্পেন অনেক দূরে। প্রায় খাঁটি প্রাচ্য দেশ। হঠাৎ দেখলাম, হেলেন কাঁদছে। ও বলল, "তুমি যেখানে আসতে চেয়েছিলে, সেখানে এসে গিয়েছ।"

ওর কথার অর্থ বুঝলাম না। অত সহজে স্পেনে পেঁছিনোর ঘোর তখনো কাটেনি। মনে পড়ছিল, পথে বিভিন্ন স্থানে হাসি, শুভেচ্ছা ইত্যাদি, যা বহু বছরের মধ্যে কপালে জোটেনি। ভাবছিলাম, মানুষের মত ব্যবহার পাওয়ার জন্য আমার খুন পর্য্যন্ত করতে হয়েছে। হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? এখনো আমরা নিরাপদ নই। স্পেনে গেস্টাপোর চর ভর্ত্তি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্পেন থেকে পালাতে হবে।"

পথে একটি গ্রামে ঘুমালাম। ভেবেছিলাম, গাড়িটা কোথাও ছেড়ে দিয়ে, বাকি রাস্তা ট্রেনে পার হব। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, স্পেনের মত বিপজ্জনক দেশে দ্রুততম যান-বাহনই শ্রেয়। অতএব গাড়ি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। গাড়িটি তখনো যান্ত্রিক বিচারে চমৎকার। ওর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে, জর্জ্জ সম্পর্কে ভীতি দূর হল। বহু বছর ওকে ভয় করে চলেছি। ও অপসারিত হওয়ার দরুন অনেক স্বস্তি বোধ করলাম। হাসি-মুখো গেস্টাপোটা অবশ্য তখনো বেঁচে, এবং টেলিফোন মাধ্যমে আমাদের ধরবার চেষ্টা

নিশ্চয় করবে। সব দেশই খুনীকে বহিষ্কার করে। যদিও আমি আত্মরক্ষার্থে খুন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেকথা যে শহরে খুন হয়েছে সেখানেই প্রমাণ করতে হবে।

পরদিন গভীর রাতে পর্তুগীজ বর্ডারে পৌঁছলাম। বিনা ঝঞ্ঝাটে, পথে পর্তুগীজ ভিসা জুটিয়ে নিলাম। বর্ডারে ইঞ্জিন চালু রেখে, হেলেনকে গাড়িতে বসিয়ে স্পেনীয় বর্ডার দপ্তরে গেলাম। বলে গেলাম, তেমন বিপদ বুঝলে গাড়ি চালিয়ে সিধে আমার কাছে আসবে। আমি লাফিয়ে গাড়িতে উঠব। জোরে গাড়ি চালিয়ে পর্তুগীজ বর্ডার ভেদ করব। এভাবে আমরা কোনমতে বেকায়দায় পড়ব না। কারণ স্পেনীয় পুলিশ অন্ধকারে বন্দুক তাক করার আগেই আমরা পর্তুগালে পৌঁছব। সেখানে কি হবে, পরে ভাবা যাবে।

কোন বিপদই হল না। ইউনিফরম পরা গার্ডগুলি চাপ বাঁধা অন্ধকারে গয়া'র আঁকা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়েছিল। ওরা স্যালুট করল! আমরা এবার ড্রাইভ করে পর্তুগীজ বর্ডার চৌকিতে পৌঁছলাম। সেখানেও অসুবিধা হল না। রওনা হবার জন্য সবে স্টার্ট দিয়েছি, এমন সময় একটি পর্তুগীজ বর্ডার-গার্ড দৌড়ে এল। ও চেঁচিয়ে আমাদের থামতে বলছিল। একটু ইতস্ততঃ করে থামলাম। কারণ, পরের শহরে আমাদের আটকে দিতে ওদের কোন অসুবিধা নেই। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। ও এসে বলল, "আপনার ভিসা। আমাদের অফিসে ফেলে এসেছেন। ফিরবার সময় কাজে লাগতে পারে।"

"অশেষ ধন্যবাদ।"

পিছনের সীটে ছেলেটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হল, আমার দেহের ভার কমে গেছে। ছেলেটিকে বললাম, "আমরা এখন পর্তুগালে।" ও মুখ থেকে হাত সরিয়ে সিধে উঠে বসল। গোটা রাস্তা ও কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে এসেছে।

গ্রামগুলি যেন পর পর উড়ে চলেছিল। কুকুর ডেকে উঠল। কামারশালের হাপর থেকে আগুনের শিখা উঠছে। কামার ঘোড়ার খুর তৈরী করছে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। হেলেন আমার পাশে চুপ করে বসেছিল। তবু, যে মুক্তির আনন্দ এতদিন খুঁজেছি, মুক্তি পেয়ে সে আনন্দ আর পেলাম না। নিজেকে রিক্ত মনে হচ্ছিল।

লিসবন থেকে মার্সাইস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ফোন করলাম। জর্জের সাথে দেখা হওয়া পর্য্যন্ত সব ঘটনা বললাম। যে কর্ম্মচারীটি ফোন ধরেছিল বলল, ভিসা মঞ্জুর হলে লিসবনস্থিত দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে গাড়িটি চড়ে এই দুঃসাহসিক যাত্রা করলাম, এবার তার একটা গতি করা দরকার। হেলেন বলল, "বেচে দাও।"

"সমুদ্রে ফেলে দিলে কেমন হয়?"

"তাতে লাভ নেই। তোমার টাকা দরকার। ওটা বেচে দাও।"

হেলেন ঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। সহজেই বিক্রি করতে পারলাম। কিনল এক গাড়ির ব্যবসাদার। ও কাস্টমস শুল্ক দিয়ে দেবে। গাড়িটিকে কালো রঙ করিয়ে নেবে। বিক্রেতার নাম: জর্জ জুর্গেন্স। কয়েক সপ্তাহ পরে তাতে পর্তুগীজ নম্বর প্লেট

লাগল। লিসবনে ঐ রকম গাড়ি আরও কয়েকটি ছিল। তখন গাড়িটাকে একমাত্র বাঁ মাডগার্ডের টোল খাওয়া দাগ দেখে চিনতে পারছিলাম। শেষে জর্জের পাসপোর্ট পুড়িয়ে দিলাম।

শোয়ার্থস্ একবার হাতঘড়ি দেখে বললেন, "আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। প্রতি সপ্তাহে আমেরিকান দূতাবাসে যেতাম। গাড়ি বেচার টাকা দিয়ে কিছুদিন হোটেলে থাকলাম। ইচ্ছা ছিল, হেলেনকে যথাসম্ভব আরামে রাখব। একটি ডাক্তার জোটালাম। সে ঘুমের ওষুধ জোগাড় করে দিত। প্রায়ই ওকে ঘোড়ার গাড়ি করে ক্যাসিনোয় নিয়ে যেতাম। ও তখন প্যারীতে কেনা ইভনিং ড্রেস আর সোনালী রঙের চটি পরত। আপনি ক্যাসিনোটি চেনেন ?"

হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমিও চিনি। কাল রাতে গিয়েছিলাম।

শোয়ার্থস্ বললেন, "আমি চাইতাম, হেলেন জুয়া খেলুক। ও মাঝে মাঝে জিতত। ওর ভাগ্য ছিল অবিশ্বাস্য রকম ভাল। যেমন খুসি গুটি ফেললেও নম্বর উঠত।

শেষ দিনগুলির সাথে বাস্তবের অল্প সম্পর্ক ছিল। যেন বোর্ডোর বাগানবাড়ির জীবন ফিরে পেয়েছিলাম। অবশ্য দুজনেরই এজন্য সামান্য একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল। যদিও বাস্তবে ও প্রতি ঘন্টায় আমার আলিঙ্গন ছিঁড়ে সর্ব্বশক্তিমান এক নিষ্ঠুর প্রেমিকের অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে ধীরে ধীরে ধরা দিচ্ছিল, তবু মনে হত ওর সবটুকুই আমার। ও তখনো সেই নতুন প্রেমিককে সম্পূর্ণ ধরা দেয়নি, কিন্তু তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা হারিয়েছিল। কত বেদনাময় রাত কেটে গিয়েছে। ও তখন শুধু কাঁদত। তারপরই অপার্থিব মুহূর্ত্তগুলির দেখা পেতাম, যখন থাকত শুধু মাধুরী, বিষাদ এবং প্রজ্ঞা। আর থাকত দেহের সীমা উত্তরণকারী ঘনীভূত প্রেম। এক রাতে ও প্রথম বলল, "প্রিয়তম, হয়ত দুজনের একসাথে 'প্রতিশ্রুত ভূমি' আমেরিকা দেখা হবে না।"

সেদিন বিকালে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। হেলেনের কথা শুনে নিষ্ফল প্রতিবাদে অভিভূত হয়ে গেলাম। প্রিয়তমাকে হারানোর বেদনায় এমনই হয়। ধরা গলায় বললাম, "হেলেন, কী হয়েছে হেলেন ? এ কী হল আমাদের ?"

হেলেন, কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে, এক দিকে ঘাড় হেলিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমরা যথেষ্ট করলাম। এই আমাদের সন্তোষ। আর কিছু করবার নেই।"

অবশেষে সেই অবিশ্বাস্য দিন এল। দূতাবাসে শুনলাম, আমাদের দুটি ভিসা এসেছে। বহু কাতর অনুনয় বিনয়েও যা সম্ভব হয়নি, এক মাতাল যুবকের এক রাতের খামখেয়ালি খুসির ফলে তাই হল। হাসি পেল। আজকের দুনিয়ায় হাসবার জিনিষ বড় কম নেই, কি বলেন ?"

"কখনো আবার হাসি শুকিয়েও যায়", আমি জবাব দিলাম।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, শেষ দিনগুলিতেই আমরা সবচেয়ে বেশী হেসেছি, শোয়ার্থস্ বলে চললেন, "মনে হত, ঝড়ো হাওয়া কাটিয়ে এক নিরাপদ বন্দরে তরী

ভিড়েছে। সব তিক্ততা, অশ্রুজল তখন মুছে গিয়েছে। বিবাদ ফিকে হয়ে, পরিহাসময় আনন্দে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। এবার একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। প্রায় সব ভুলে আমেরিকা পালানোর প্ল্যানে মেতে গেলাম। কিছুদিন কোন জাহাজ ছাড়ছিল না। শেষে একটি জাহাজ ছাড়ার কথা ঘোষণা করল। দেগা'র আঁকা শেষ ছবি বেচে দুটি টিকিট কিনলাম। মনে হচ্ছিল সব কিছু, এমন কি ডাক্তারদেরও, তুচ্ছ করে আমরা কত সুখী!

জাহাজ ছাড়া দিন কয়েকের জন্য স্থগিত হল। গত পরশু দিন জাহাজ কোম্পানির অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ জাহাজ ছাড়বে। হেলেনকে একথা বলে, আমি কয়েকটি জিনিষ কিনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি হেলেন মৃত। ঘরের সব কটি আয়না ভেঙ্গে চুরমার। ওর প্রিয় ইভ্নিং ড্রেসটি ছিন্নভিন্ন হয়ে মেঝেয় লুটোচ্ছে, ও তার পাশে শুয়ে।

প্রথম ভাবলাম, হয়ত কোন চোর ওকে খুন করেছে। তারপর মনে হল, হয়ত কোন গেস্টাপোর চর খুন করেছে। কিন্তু গেস্টাপোর লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত আমি, হেলেন নয়। যখন দেখলাম, আয়নাগুলি আর ইভ্নিং ড্রেস ছাড়া কিছু নষ্ট হয়নি, তখনই বুঝতে পারলাম। মনে পড়ল, ওকে এক শিশি বিষ দিয়েছিলাম। ও বলত, হারিয়ে গিয়েছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করলাম, ও কোন চিঠি রেখে গিয়েছে কিনা। না, কোন চিঠি নেই। ও কিছু না বলেই চলে গেল। আপনি বুঝতে পারছেন?

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"আপনি সত্যি বুঝতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম, "কী বা উনি লিখতেন?"

"কিছু, কেন ·····"

শোয়ার্থস্ কথা শেষ করতে পারলেন না। হয়ত ভাবছিলেন কোন শেষ কথা, প্রেমের শেষ চিহ্ন অথবা এমন কিছু যা ওঁর নিঃসঙ্গ আঁধার জীবন আলোকিত করত। অনেক পুরানো গতানুগতিক ধারণা উনি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এই জায়গায় উনি সেই গতানুগতিক রয়ে গিয়েছেন। আমি বললাম, "হয়ত আপনার স্ত্রী লেখা শুরু করলে শেষ করতে পারতেন না, এত কথা ছিল। ওঁর অনুক্ত বাণীই ত' অধিকতর বাঙ্ময়।"

উনি একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ভ্রমণ দপ্তরের বিজ্ঞাপনটি দেখেছেন? উনি ফিসফিস করে বললেন, "জাহাজ ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থগিত হয়েছে। একথা জানলে, হেলেন আরও একদিন বাঁচতে পারত।"

"তাই নাকি?"

"ও আসলে আমেরিকা যেতে চায়নি। তাই ঐ রকম করল।"

"আমি মাথা নেড়ে বললাম, "উনি আর কষ্ট সইতে পারতেন না।"

শোয়ার্থস জবাব দিলেন, "আপনার কথা বিশ্বাস করি না। তাহলে যাবার যখন সব ঠিক, তখনই আত্মহত্যা করল কেন? না কি ভাবল, অসুস্থতার জন্য আমেরিকা প্রবেশের অনুমতি পাবে না?"

আমি বললাম, "একটি মুমূর্ষু মহিলার জীবনদীপ কখন নিভে আসছে, সেটুকু বিচারের স্বাধীনতাও কি তাঁর থাকবে না ? সে ভার তাঁর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি।"

উনি আমার দিকে তাকালেন। আবার বললাম, "উনি শুধু আপনার মুখ চেয়ে যতদিন সামর্থ্য ছিল, লড়াই করেছেন। যখন জেনেছেন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ, তখনই তাঁর যুদ্ধ শেষ করেছেন।"

যদি অন্ধের মত, মত্তের মত নিজের খেয়ালখুশিতে না মাততাম, আমেরিকা যাওয়ার উন্য পীড়াপীড়ি না করতাম, তা হলে··· · তা হলে কী হত ?"

উত্তর দিলাম, "মিঃ শোয়ার্থস্, তবুও ত' আপনার স্ত্রীর রোগমুক্তি হত না।"

অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়িয়ে শোয়ার্থস্ বললেন, "ও চলে গিয়েছে।" বিড়বিড় করে বললেন, "একবার মনে হল ও হয়ত কখনই আমার হয়নি। ওর দিকে চেয়ে রইলাম। কোন উত্তর পেলাম না। ভাবলাম, আমি কী করলাম ? ওকে কি প্রকৃত সুখী করতে পেরেছি ? ও কি সত্যিই আমাকে ভালবাসত ? না, ওর সুবিধা অনুযায়ী আমাকে একটি পঙ্গু লোকের ক্রাচের মত কাজে লাগল ? উত্তর পেলাম না।"

"উত্তর আপনার একান্ত প্রয়োজন ?"

উনি বললেন, "না। মাফ করুন, হয়ত উত্তরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।"

"কোন উত্তর হতে পারে না। এসব প্রশ্নের উত্তর আপনিই শুধু দিতে পারেন।"

একটু নীরব থেকে শোয়ার্থস্ বললেন "এ কাহিনী আপনাকে শোনালাম কারণ আমি জানতে চাই, আমার জীবনের অর্থ কী ? এ কি এক ভাগ্যহীন, নপুংসক এবং খুনীর রিক্ত, অর্থহীন জীবন ·· ?"

জবাব দিলাম, "সঠিক বলতে পারব না। তবে, আমি বলব এ এক প্রেম-পাগল, যদি বলতে অনুমতি দেন, এক ধরণের সাধকের জীবন। সুন্দর বিশেষণের মালা গেঁথে আর কি করব ? এই ছিল আপনার জীবনের প্রকৃতি। এটুকুই কি যথেষ্ট নয় ?"

"সে জীবন 'ছিল।' আজ ?"

"যতদিন বাঁচবেন, সে জীবনও আপনার সাথে বেঁচে থাকবে।"

শোয়ার্থস্ ফিসফিস করে বললেন, "শুধু আমরা,—আপনি এবং আমি, আর কেউ নয়- সেই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখব।" আমার মুখের উপর পূর্ণদৃষ্টি রেখে আবার বললেন, "ভুলবেন না। কখনো ভুলবেন না। সে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তার মৃত্যু সইতে পারব না। শুধু আমরা দুজন আছি। আমার ক্ষমতা নেই। আপনার আছে। আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন। যেন সে জীবন কখনো না নিঃশেষ হয়ে যায়।"

সব সন্দেহ, অবিশ্বাস ছাপিয়ে আমার এক অজানা অনুভূতি হল। এ বৃদ্ধ কী চান ? উনি কি পাসপোর্টসহ আপনার অতীত আমার জিম্মায় রেখে, নিজের প্রাণ-নাশের কথা ভাবছেন ? জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেন সে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না, মিঃ শোয়ার্থস্ ? আপনি নিজেও ত' বেঁচে থাকবেন ?"

শান্ত স্বরে শোয়ার্থস্ উত্তর দিলেন, হাসিমুখো গেস্টাপোটা বেঁচে থাকতে আমি কিছুতেই আত্মহত্যা করব না। কিন্তু ভয় হয়, আমার মন হয়ত সেই স্মৃতিকে টুকরো করে চিবিয়ে শেষ করবে, নষ্ট করে ফেলবে, হয়ত অন্য রূপ দেবে, এমনকি দৈনন্দিন ঘরকরণার সামগ্রীতে পরিণত করবে,—যাতে সহজভাবে আমার জীবনযাত্রার সাথে মিলে যায়। আজ যা বলছি, হয়ত কয়েক সপ্তাহ পরে সেটুকুও বলতে পারব না। তাই ত' আপনাকে এ কাহিনী শোনালাম। আপনি একে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবেন, মিথ্যা হতে দেবেন না। অন্ততঃ কোথাও এ স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।" হঠাৎ ওঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দূরাগত মনে হল। উনি বললেন, "অন্ততঃ কিছুকালের জন্য একে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।" পকেট থেকে দুটি পাসপোর্ট বার করে আমার সামনে রেখে বললেন, "এই যে, হেলেনের পাসপোর্টও এখানে আছে। টিকিট দুটি আপনাকে আগেই দিয়েছি। এই নিন, দুটি আমেরিকান ভিসা।" ওঁর ঠোঁটের উপর দিয়ে ক্ষীণ হাসির ছায়া মিলিয়ে গেল। উনি চুপ করলেন। অবাক হয়ে পাসপোর্ট দুটির দিকে চেয়ে রইলাম। শেষে অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এগুলি সত্যিই আর প্রয়োজন নেই?"

উনি বললেন, "এগুলির পরিবর্তে আপনার পাসপোর্টটি দিন। বর্ডার পার হতে কাজে লাগবে।"

বিস্মিত হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। উনি আবার বললেন, "ফ্রান্সের সাহায্যকল্পে ফ্যাসিবিরোধী বিদেশী স্বেচ্ছাসেনাদল গঠিত হয়েছে। ওরা পাসপোর্ট চাইবে না। রিফিউজি কিনা, সে কথাও জিজ্ঞেস করবে না। হাসিমুখো গেস্টাপোটার মত বর্ব্বররা বেঁচে থাকতে আত্মহত্যার চিন্তাও অপরাধ। কারণ যে জীবন ঐ জানোয়ারদের সাথে লড়াইয়ে নিঃশেষ হতে পারত, তার সম্পূর্ণ অপব্যয় হবে।"

পকেট থেকে আমার পাসপোর্টটা বার করে ওঁকে দিয়ে বললাম, "ধন্যবাদ, আপনাকে সর্ব্বান্তিঃকরণে ধন্যবাদ জানাই, মিঃ শোয়ার্থস্।"

"কিছু টাকাও আছে। আমার অত টাকা লাগবে না।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শোয়ার্থস্ বললেন, "আমার জন্য অন্ততঃ একটি কাজ করবেন? আধঘণ্টা পরে ওরা হেলেনকে নিতে আসবে। আপনি আমার সাথে আসবেন?"

"চলুন।"

শোয়ার্থস্ দাম চুকিয়ে দিলেন। আমরা কোলাহলমুখর প্রভাতের মুখোমুখি হলাম। নদীর মোহানায়, সাদা উত্তাল তরঙ্গের উপর জাহাজটি তখনো দাঁড়িয়ে।

শোয়ার্থসের পাশে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়েছিলাম। রিক্ত আয়নার ফ্রেমটি চেয়ে আছে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। যেমন মৃত মানুষ থাকে, মহিলাও তেমনি কফিনের ভিতর শুয়েছিলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, অন্তহীন দূরের মানুষ। কোন কিছুর ভ্রূক্ষেপ বা প্রয়োজন নেই আর। শোয়ার্থস্, আমার বা কারো উপস্থিতিতেই উনি আর বিচলিত হবেন না। মুখ দেখে, আগের চেহারা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। কফিনে শায়িত একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি। এর প্রাণবন্ত রূপ কেবল শোয়ার্থসের মনে আছে।

শোয়ার্থস্ বোধহয় ভাবলেন, ওঁর মনের কথা ধরতে পেরেছি। উনি বললেন, "কয়েকটি চিঠি ···· মাত্র গতকাল ·····"

উনি ড্রয়ার থেকে কয়েকটি চিঠি বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমি এখনো পাড়িনি। আপনি নিন।"

চিঠিগুলি কফিনে রাখতে গিয়েও রাখলাম না। ভাবলাম, অন্ততঃ মৃত মহিলাটি শোয়ার্থসের সম্পূর্ণ আপনার। সেখানে অন্য লোকের লেখা চিঠি অবান্তর। উনি চান না, চিঠিগুলি প্রিয়তমার অন্তিম শয্যায় থাকে। অপর পক্ষে ওগুলি নষ্ট হয়, তাও চান না। কারণ, ওগুলি যে হেলেনকে লেখা। চিঠিগুলি পকেটে রেখে বললাম, "আমি এগুলি নিলাম। এরা এখন অবান্তর হয়ে গেছে। এদের মূল্য এক প্লেট স্যুপের দামের থেকেও কম।"

উনি উত্তর দিলেন, "পঙ্গু লোকের ক্রাচের মত। এক সময় হেলেন নিজেই বলত, আমার কাছে খাঁটি থাকার জন্য ওগুলি ছিল ওর ক্রাচ। আজগুবি····· "

সহানুভূতিভরে বললাম, "ওঁকে শান্তিতে বিদায় দিন। যতদিন সামর্থ্য ছিল উনি প্রাণভরে ভালবেসেছেন, আপনার পাশে থেকেছেন। এবার বিদায় দিন।"

উনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হঠাৎ শোয়ার্থস্কে অত্যন্ত দুর্বল লাগল। উনি অস্ফুটে বললেন, "শুধু ঐটুকু জানতে চেয়েছি।"

ঘরের ভিতব অত্যন্ত গরম লাগছিল। মৃতদেহের তীব্র গন্ধ, মাছির ভন ভন, পোড়া মোমবাতির গন্ধ,—সব মিলে অসহ্য লাগছিল। শোয়ার্থস্ আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন, "একটি স্ত্রীলোক আমাকে সাহায্য করেছে। অপরিচিত দেশে ডাক্তার, পুলিশ, সব নিয়েই ঝঞ্ঝাট। ওরা হেলেনকে নিয়ে গেল। গত রাতে ফেরত দিয়ে গেল। ময়না তদন্তের জন্য ওর দেহ চেরাই করা হয়েছে। ওর মৃত্যুর কারণ·· " আমার দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে, শোয়ার্থস্ আবার বললেন, "ওরা ·· ওর দেহের কিছু অংশ ওরা ফেরত দেয়নি ··· বলেছিল, হেলেনের ঢাকা যেন না খোলা হয়· "

শববাহীরা এসে পৌঁছল। কফিন বন্ধ করে, এঁটে দেওয়া হল। মনে হল, শোয়ার্থস্ অজ্ঞান হয়ে যাবেন। বললাম, "আমি আপনার সাথে যাব।"

বেশী দূর হাটতে হল না। উজ্জ্বল সকালের রোদে বাতাস মেঘের পিছনে গ্রে হাউন্ডের মত ধাওয়া করছিল। কবরখানায়, উদার আকাশের নিচে শোয়ার্থস্কে অনেক খাটো আর উদাস লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এখন ফ্ল্যাটে ফিরতে চান ?"

"না।"

উনি আগেই একটি স্যুটকেস হাতে নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "পাসপোর্ট মেরামত করতে পারে, এমন কাউকে জানেন ?"

"গ্রেগারিয়াস আছে। ও গত সপ্তাহে লিসবনে এসেছে।"

আমরা গ্রেগারিয়াসের কাছে গেলাম। ও শোয়ার্থসের পাসপোর্টটি এমনভাবে মেরামত করে দিল, যাতে আমার কাজে লাগতে পারে। শোয়ার্থসের কাছে বিদেশী স্বেচ্ছাসেনা-

বাহিনীর নিয়োগ দপ্তরের কার্ড ছিল। ওঁর শুধু স্পেনীয় বর্ডার পার হওয়া প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর দপ্তরে পেঁছনোর পর উনি অনায়াসে আমার পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন। ওরা স্বেচ্ছাসেনার অতীত জানতে উৎসুক নয়। জিজ্ঞেস করলাম, "যে ছেলেটিকে সাথে করে লিসবনে এনেছিলেন তার কী হল?"

"ওর কাকা ওকে দেখতে পারে না। ও কিন্তু মহানন্দে আছে। ও মনে করে, অনাত্মীয়ের থেকে আত্মীয়ের বিদ্বেষ সহ্য করা সহজ।"

ওঁর দিকে তাকালাম। পাসপোর্ট বদলের ফলে উনি এখন আমার নামের উত্তরাধিকারী। আমি বললাম, "আপনার মঙ্গল কামনা করি। এবার সচেষ্ট হলাম, যাতে ওঁকে মিঃ শোয়ার্থস্ না বলে ফেলি। কিন্তু ওঁকে অন্য নামে ডাকার কথা ভাবতেও পারলাম না।

উনি বললেন, "আপনার সাথে আর দেখা হবে না। দ্বিতীয় বার দেখা হলে বলার মত কিছু থাকবে না। আমার সব কথা বললাম। আর দেখা না হওয়াই হয়ত ভাল।"

ওঁর শেষ কথাটি মেনে নিতে পারলাম না। হয়ত আবার দেখা হবে। কারণ, একমাত্র আমি ওঁর বিগত জীবনের অবিকৃত স্মৃতি জাগরূক রাখতে রয়ে গেলাম। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই উনি যদি আমাকে আর সহ্য করতে না পারেন? যদি কখনো ওঁর নিজের স্মৃতি অস্বচ্ছ হয়ে যায়, হয়ত ভাববেন আমি ওঁর স্ত্রীকে অপ্রত্যর্পণীয়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছি, কারণ তাঁদের যুগল সুখস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় তখনো স্বচ্ছ এবং অমলিন।

দেখলাম- শোয়ার্থস স্যুটকেস হাতে ধীরে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন,—চির অসফল প্রেম পাগল। উনি কি প্রেয়সীকে মূঢ় নারীচিত্তবিজেতাদের থেকে অনেক বেশী আপনার করে পাননি? আমরা নিজেরা কতটুকু পাই? পেয়ে, কতটুকু ধরে রাখতে পারি? তবু ত' দুদিনের ধার করা ধনের জন্য কত কাণ্ডই না করি! তবু কেন পাওয়া এবং ধরে রাখার মাত্রার তারতম্য নিয়ে এত কথা? পাওয়া এবং ধরে রাখা, এই দুটি ধোঁয়াটে কথার আসল অর্থই ত' ফাঁকা হাওয়ার সাথে আলিঙ্গন।

স্ত্রীর একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো আমার কাছেই ছিল। তখনকার দিনে পরিচয়-পত্রাদির জন্য সর্ব্বদাই ফটো প্রয়োজন হত। গ্রেগরিয়াস ফটোটি হেলেনের পাসপোর্টে যথাযথভাবে বসিয়ে দিল। পাছে পাসপোর্ট দুটি খোয়া যায়, তাই কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রেগরিয়াসের কাছে রইলাম।

দুপুর নাগাদ দুটি পাসপোর্টই তৈরী হয়ে গেল। ওগুলি নিয়ে আমাদের বাসায় দৌড়লাম। রুথ জানালার ধারে বসে, উঠানে জেলে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিল। আমাকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আজও হেরেছ?"

পাসপোর্ট দুটি তুলে ধরে বললাম, "আমরা কাল রওনা হচ্ছি। পথে আমাদের দুজনের দুটি আলাদা নাম আর পদবী থাকবে। আমেরিকা পেঁছিয়ে, আবার বিয়ে করলে, দুজনের পদবী এক হয়ে যাবে।"

তখন মনে হয়নি, আমি এমন একজনের পাসপোর্ট নিয়েছি যাকে খুনের অপরাধের

জন্য খোঁজা হতে পারে। পরদিন বিকালে জাহাজ ছাড়ল। আমরা নির্বিঘ্নে আমেরিকা পৌঁছলাম। কিন্তু প্রেমিক-যুগলের পাসপোর্ট ব্যবহার করে আমরা উল্টো ফল পেলাম। রুথ আমাকে ছ মাস পরে ডিভোর্স করল। অধিকন্তু আইনের মারপ্যাঁচ থেকে বাঁচবার জন্য প্রথমতঃ আমাদের দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হল। যে ধনী আমেরিকানটি শোয়ার্থস্কে এফিডেভিট দিয়েছিলেন, পরে রুথ তাঁকে বিয়ে করল। ভদ্রলোক আমাদের উপাখ্যান শুনে অত্যন্ত মোহিত হয়েছিলেন। আমার আর রুথের দ্বিতীয় বিয়েতে উনিই নিতবর হয়েছিলেন। এক সপ্তাহ বাদে মেক্সিকোতে রুথ আমাকে ডিভোর্স করল।

যুদ্ধের বাকি দিনগুলি আমেরিকায় কাটালাম। বিস্ময়ের কথা এই যে, কিছুদিন যাবৎ আমারও চিত্রকলায় অনুরাগ জন্মেছিল, অথচ আগে ওতে কোন কৌতূহল ছিল না। হয়ত আদি শোয়ার্থসের উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ গুণটি পেয়েছিলাম। তখনো জীবিত অপর শোয়ার্থসের কথা প্রায়ই মনে পড়ত। দুয়ে মিশে এক অস্বচ্ছ ভৌতিক আকার ধারণ করেছিল, যার উপস্থিতিও মাঝে মাঝে অনুভব করতাম। এক ভৌতিক অনুভূতি আমাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অবশ্য বুদ্ধির বিচারে বুঝতাম, ও এক প্রকার মনোবিকার। অবশেষে এক চিত্র ব্যবসায়ীর দোকানে চাকরি পেলাম। দেগা'র আঁকা ছবির ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। দেগা'র ছবির কয়েকটি নকল ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।

হেলেনের কথা প্রায়ই মনে পড়ত, যদিও ওকে একবার মাত্র মৃত অবস্থায় দেখেছি। আমার একক জীবনে হেলেনের স্বপ্নও কখনো কখনো দেখেছি। শোয়ার্থসের দেওয়া চিঠিগুলি না পড়েই, জাহাজ যাত্রার প্রথম রাতে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। ঐ খামগুলির একটির মধ্যে একটি ছোট্ট শক্ত জিনিষ হাতে ঠেকল। অন্ধকারে খামটি খুলে ফেললাম। আলোয় দেখলাম, ওটি একটি চ্যাপটা, মসৃণ, হলুদ রঙের এ্যাম্বার। হাজার হাজার বছর আগে একটি কীট সেই এ্যাম্বারে ধরা পড়ে ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে কীটটির সাথীরা কালের প্রভাবে জমে পাথর হয়েছে, অথবা অন্য প্রাণীর আহার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। ও একা প্রাণ ধারণের সংগ্রাম করতে করতে সোনালী অশ্রুর খাঁচায় বন্দী হয়ে রইল।

যুদ্ধ শেষে ইউরোপ ফিরে গেলাম। আত্মপরিচয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হলাম, কারণ প্রভু জার্মান জাতির হাজার হাজার লোক তখন আত্মপরিচয় গোপন করতেই ব্যস্ত। এক নতুন ধরণের রিফিউজির বন্যা শুরু হয়েছে তখন। সেই বন্যায় ভেসে রাশিয়ায় ফিরতে চায়, এমন একটি রুশকে শোয়ার্থসের পাসপোর্টটি দিয়ে দিলাম। শোয়ার্থসের আর কোন খবর পাইনি। অস্নাব্রুকে গিয়ে খোঁজ করেছিলাম। ওঁর আসল নাম অবশ্য ততদিনে ভুলে গিয়েছিলাম। অস্নাব্রুক শহর তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। সে শহরে কেউ ওঁকে চিনল না। ওঁর সম্পর্কে কারুর কোন কৌতূহল নেই। ফিরবার পথে, মনে হল রেল স্টেশনে ওঁকে দেখেছি। দৌড়ে গেলাম। কিন্তু না, ইনি একজন ডাক-বিভাগের কেরাণী, নাম জ্যানসেন। তিনটি সন্তানের জনক।